নানাকথা

নানাকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৩১

মূল্য ২ৎ টাকা
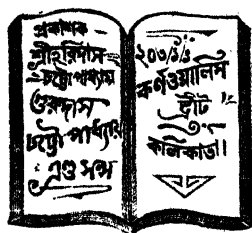
Printed by N. C. Paul

Oriental Press.

107, Mechua Bazar Street, Calcutta.

নিবেদন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রণীত 'নানাকথা' পুস্তক এত দিনে প্রকাশিত হইল। লেখক স্বয়ং এই পুস্তকের প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে উপর্য্যুপরি শোক এবং রোগে তাঁহাকে এত অবসন্ন করিয়াছিল যে, আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও এই পুস্তক প্রকাশের অবসর আর তাঁহার ঘটে নাই। এই সকল প্রবন্ধ আমাকে বহু পুরাতন ও লুপ্ত মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহু অনুসন্ধানে ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য প্রকাশ করিতে এত অযথা বিলম্ব ঘটিয়া গেল। তথাপি এই গ্রন্থের জন্য লেখকের নির্ব্বাচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বোধ হয় পুরাতন ভারতী পত্রে প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ কি খ্রীষ্ট?" নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের আজও পর্য্যন্ত কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। অগত্যা ঐ প্রবন্ধটিকে আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই "নানাকথা" এক্ষণে প্রকাশ করা হইল। ঐ প্রবন্ধটি কোন মাসিকপত্রে কোন্ সময় প্রকাশিত হইয়াছে, লেখকের অনুরক্ত পাঠকদিগের মধ্যে যদি তাহা কাহারও জানা থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা জানাইলে, পরম উপকৃত হইব।

১ হলওয়েল লেন,
কলিকাতা,
আশ্বিন ১৩৩১

শ্রীশীতলচন্দ্র রায়

সূচী

আনি বেসাণ্ট

বৈরাগ্যপ্রবণ ও ধর্ম্মপ্রবণ বলিলে, প্রাচ্য জীবন ও প্রতীচ্য জীবনের মূলগত পার্থক্য কতক বুঝা যায়। প্রতীচ্য জীবনের অপেক্ষা প্রাচ্য জীবন উৎকৃষ্ট, এই ভাবের একটা হাওয়া কিছুদিন হইতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি আনি বেসাণ্ট আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, হাওয়ার গতিটা আর একটু প্রবল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসাময়িক না হইতে পারে।

বৈরাগ্য অর্থে জীবনে অনাসক্তি, এবং এই অর্থে বৈরাগ্য আধুনিক হিন্দুর মজ্জাগত, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে সম্পূর্ণ ভুল না হইতে পারে। কর্ম্ম এদেশে নাই, এমন নহে; কেন না, কর্ম্মই জীবন। কর্ম্মলোপে জীবনের অস্তিত্ব টিঁকে না। তবে বৈরাগ্য ধর্ম্মের এতটা প্রাদুর্ভাব, অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তবে চিরকাল এমন ছিল না। বৈদিক সময়ে আর্য্য মানবের জীবন সংসারে বীতস্পৃহ হয় নাই। তখন কর্ম্মই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যনিবাস ও আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইত না। যখন চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হয়, তখন জীবনে সহসা অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে জীবন-যাত্রা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বৈরাগ্য ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে ছিল, আশা আর উদ্যম, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থময়তা।

আজি কালি যাহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সুরে সুর মিলাইয়া বৈদিক ধর্ম্মের স্তুতিগান ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা 'ধর্ম্ম' শব্দটির কিরূপ অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া ফেলেন,—দেখিয়া একটু একটু ব্যথিত হইতে হয়। ইংরাজী ভাষায় রিলিজন (religion) শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের পুরাতন 'ধর্ম্ম' শব্দটার সে অর্থে ব্যবহার করিতে আমরা বড়ই নারাজ। রিলিজনের প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক পাওয়া যায় না; কেন না, ভারতবর্ষে সুতরাং বঙ্গদেশে, রিলিজন নামক একটা কিছু গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে ছিল না।

* * * * * *

কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহবর্ত্তী ও সহব্যাপী, জীবনের প্রধান লক্ষণ ও বিশেষণ। মনুষ্যের সম্পাদিত ক্রিয়ার সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে এক ডিউটি (duty) ভিন্ন ইহার সমার্থসূচক সমকক্ষ প্রতিশব্দ আর পাওয়া যায় না।

মানুষের কর্ত্তব্য সমষ্টিকে স্থূলত তিন ভাগ করিতে পারা যায়; নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, আপনার লোকের প্রতি কর্ত্তব্য, এবং পরের প্রতি কর্ত্তব্য। এই তিন কর্ত্তব্যের সমষ্টিতে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস মনুষ্যজাতির ইতিহাসের সহিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, নিজের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানটারই উৎপত্তি সকলের আগে। মানুষকে প্রাণী হিসাবে দেখিলে দেখা যায়, আত্মপ্রীতিই তাহার স্বভাবগত ধর্ম্ম। সমাজ বন্ধনের সহকারে পরপ্রীতি আত্মপ্রীতির অনুকূল হয়, তাই ক্রমশঃই প্রীতিটা আপনার সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়া বাহিরের অপরের প্রসার লাভ করে।

পরপ্রীতি কতকটা আত্মপ্রীতির প্রতিকূল, কিন্তু সামাজিক মানুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূল নহে, কতকটা অনুকূল। পরকে ক্রমশঃ আপনার করিয়া না দিলে সমাজবন্ধন চলে না। তাই পরপ্রীতি ক্রমশঃ ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, কোনও কোনও বিচক্ষণ শাস্ত্রকারের মতে পরার্থপরতাই ধর্ম্ম; এবং স্বার্থপরতাই অধর্ম্ম। প্রকৃত পক্ষে উভয়ের সামঞ্জস্যে ধর্ম্মের স্থিতি।

আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ও পরের প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া আর একটা কর্ত্তব্য মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ জগতের খানিকটা বুঝে, খানিকটা বুঝে না। খানিকটা তাহার জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত; খানিকটা সেই পরিধির বাহিরে। এই সীমা বিভাগ চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকিবে। মানুষ যে টুকু বুঝে, তাহার আবার কতকটাকে ভালবাসে; কতকটা ভালবাসে না; অথবা অগত্যা ভালবাসে। আর যে টুকু বুঝে না, সে টুকুকে ভালবাসিতেও পারে না, না বাসিতেও সাহস করে না; সেই টুকুকে ভয় করে। জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশটুকু মানুষের চক্ষে বিভীষিকাময়। অকস্মাৎ, অতর্কিতে, এমন ভাবে মানুষের জীবনের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষের জীবন-শৃঙ্খল সহসা ছিঁড়িয়া যায়। ইহা মানুষের শক্তির অধীন নয়। মানুষের ক্ষমতার আয়ত্ত নহে, তাই মানুষ বড়ই সাবধানে, অসহায়ভাবে, কাতরনেত্রে জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশের প্রতি চাহিয়া থাকে; স্তুতি করে, তোষামোদ করে, এবং সময়ে সময়ে নিতান্ত ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল অসহায়ের মত উৎকোচ দিয়া বশ করিতে চায়। এই স্তুতিবাদ, এই তোষামোদ, দুর্ব্বলের একমাত্র গতি, অসহায়ের একমাত্র বল, আত্মরক্ষার উদ্দেশে এই একমাত্র অবলম্বন। অসহায় মানুষ জগতের সেই জ্ঞানাতীত পরাক্রান্ত শক্তি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছে, ইহাকে

আপনার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়াছে। উপায়টাকে হীন বল, কাপুরুষোচিত বল, আর যাহাই বল, রুদ্ধশ্বাসে ভয়ে ভয়ে বলিও। মুক্তকণ্ঠে বলিলে মনুষ্য সমাজের সমবেত শক্তি বজ্রের ন্যায় তোমার উপর আপতিত হইবে।

সুতরাং স্বার্থ ও পরার্থ ছাড়িয়া মনুষ্যজীবনের আর একটা অর্থ আছে, আর একটা কর্ত্তব্য আছে; সেইটা মানুষের রিলিজন। জগতের অজ্ঞের শক্তিকে 'যেন তেন' সন্তুষ্ট রাখিতে পার, তোমারই মঙ্গল; তবে কিসে সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যাইবে, তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। বোধ করি—যত মানুষ, তত মত। সন্তুষ্ট রাখা বড় সহজ নহে! ইহজীবনে সকল সময়ে ফললাভ হয় না। না হউক, পরলোক আছে। সেখানে ফল পাইবে। দুর্ব্বলের এইরূপ সান্ত্বনা, অথবা আত্ম-প্রবঞ্চনা।

বৈদিক সময়ে মানুষের জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অনুরাগ ছিল; আপনার শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রভূত চেষ্টা ছিল, এবং আত্মরক্ষণের কামনায়, শক্র নিপাতের কামনায়, ইন্দ্রের প্রতি, বরুণের প্রতি, রুদ্রের প্রতি স্তুতি প্রয়োগ ও উৎকোচ প্রয়োগেরও অভাব ছিল না। পরার্থে আত্মোৎসর্গ বৈদিক সময়ে ধর্ম্মের অন্তর্গত হয় নাই। হয় নাই—তাই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইয়াছে, আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। জাতি মাত্রেরই অভ্যুদয়ের এই ইতিহাস। বেদের পর উপনিষদ ও দর্শন। এখন আর শক্র-ভয় নাই, জীবন-সংগ্রামে কঠোরতা নাই, বসুন্ধরা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা; অন্ন কষ্ট নাই। প্রচুর অবকাশ, আর্য্যজাতির ধীশক্তি জীবনের রহস্যের, জগতের রহস্যের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণে নিযুক্ত। বিশ্লেষণে স্থির হইল, জীবন দুঃখময়, এত সুখেরও পরিণাম দুঃখ, দুঃখময়তাই জীবন। নিরপেক্ষ সুখ অসম্ভব; দুঃখ নিবৃত্তিই সুখ; দুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় শুদ্ধ জ্ঞানে। তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ ও সত্যজ্ঞানে মোক্ষ।

জ্ঞান কি? মা জগৎ কল্পনা, আমি মাত্র আছি, জগৎ আমার কল্পনা, আমার সৃষ্টি, আমার অংশ। এই জ্ঞান লাভ হইলে বুঝিতে পারিবে, দুঃখ জীবনের সহচর হইলেও আমারই কল্পিত পদার্থ। সুতরাং দুঃখ আর দুঃখ থাকিবে না। ফল হইল সংসারে বিরক্তি বৈরাগ্য। সকলেই যে বিরাগী হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা নহে; তবে সেই অবধি হিন্দুর অস্থি মজ্জা শোণিতের সহিত একটা সংসারে বিরক্তি, কর্ম্মে অনাসক্তির রস মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

তাহার পর বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব জগতে দুঃখ ভিন্ন সুখ দেখিতে পাইলেন না। কর্ম্মবশে জীব কেবল দুঃখের চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিলেন। বুদ্ধদেব আদেশ দিলেন, এই দুঃখ নিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। ভোগ-বিলাস, সুখ-ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্খা পরিহার করিয়া সর্ব্বজীবে প্রীতি বিতরণ কর। ইহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম, ইহাই মনুষ্যের কর্ম্ম। এমন মহতী বাণী ইতিপূর্ব্বে নরকণ্ঠ হইতে কখনও নির্গত হয় নাই। পরেও হইয়াছে কি না সন্দেহ। বৈরাগ্য হইতে কর্ম্ম প্রসূত হইল; কর্ম্ম 'ধর্ম্ম' আখ্যা প্রাপ্ত হইল; শত্রু মিত্র হইল, পর আপনার হইল। আর্য্য অনার্য্যের সহিত মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বৈষম্য দূরে গেল। বৌদ্ধ প্রচারক এই অপূর্ব্ব উপদেশ লইয়া দেশ বিদেশে বাহির হইল। হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া ভারতসাগর পার হইয়া বুদ্ধ প্রচারিত প্রীতিধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে চলিল। ভারতবাসী ঐশ্বর্য্য পিপাসায় বা শোণিত তৃষ্ণায় কখনও স্বদেশের সীমা পার হয় নাই, ধর্ম্ম প্রচারের নামে জীব রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত করে নাই। ধর্ম্মাচরণ ভান করিয়া পরস্বাপহরণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। ভারতবর্ষের চতুঃসীমার ভিতরেই তাহার অধ্যবসায় চিরকাল আবদ্ধ আছে। একবার মাত্র সেই চতুঃসীমা পার হইয়াছিল, কটিতে তরবারি করপুটে ধর্ম্মপুস্তক তাহার সঙ্গে

যায় নাই। সঙ্গে ছিল কেবল মনুষ্যত্ব—ললাটে জ্ঞানের প্রতিভা ও কণ্ঠে প্রীতির অমৃতময়ী বাণী।

প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ছিল না; তথাপি জীবন দুঃখ দুর্ভর হইয়া পড়িয়াছিল। কেন, ঠিক বলা যায় না। বোধ করি, ইহাই প্রাকৃত নিয়ম। অন্যদেশে এমন নয়। ইউরোপে জীবন-সমরের কঠোরতার মাত্রা পূর্ণ। অথচ জীবনে সেখানে আসক্তি প্রবল। যে কারণেই হউক, আর্য্যাবর্ত্তে জীবন দুঃখ দুর্ভর হইয়া পড়ে। দুঃখ-মুক্তি পরম-পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়। ফলে দাঁড়ায় বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই মূর্ত্তি গ্রহণ করে; দুই পথে চালিত হয়। কেহ বলেন, মুক্তি জ্ঞানে; কেহ বলেন, মুক্তি কর্ম্মে। জ্ঞানের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান, কর্ম্মের অর্থ প্রীতি ও মৈত্রী। বৈরাগ্যের স্রোত দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। এখনও বোধ করি, দুই মুখেই দুই প্রবাহ চলিতেছে। দুই স্রোত মিলিবে কিনা, জানি না। যে দিন মিলিবে, মানবজাতির ইতিহাসে সেইদিন পুণ্য দিন। যে স্থানে মিলিবে, ধরাতলে সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগ সঙ্গম।

তবে ভারতবাসী বুদ্ধের উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। অন্য জাতি যে মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত। চীনে, তিব্বতে, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান, বুদ্ধের জন্মভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাদর নাই, এই বলিয়া একটা হাহাকার আজি কালি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই হাহারবের ভিত্তির ঠাহর পাওয়া যায় না। ভিন্ন দেশে বৌদ্ধ রিলিজন নামে একটা কিছু প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ ভারতবর্ষে যেরূপে যেভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা কুত্রাপি হয় নাই, ইহা অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই নিরীহ, দান্ত, শান্ত, ধীর, ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান প্রকাণ্ড হিন্দুজাতিই ইহার প্রমাণ।

ভালর মন্দ আছে। আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের ফল যে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বুদ্ধদেব পরার্থপরতা শিখাইয়া ছিলেন। বৌদ্ধমাত্রই পরার্থপর হইয়াছিল, বলা যায় না। মনুষ্য-চরিত্র এইরূপ। শুনা যায়, যীশুখ্রীষ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন, এক গণ্ডে চপেটাঘাত পাইলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে চপেট-সহিষ্ণুতা খৃষ্টানের লক্ষণ বলিয়া কোনকালে গণ্য হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ কথা লেখে না।

* * * * *

যাহাই হউক, ভারতবাসীমাত্রই বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করে নাই। তবে মিলিয়া মিশিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। মন্দির গড়িয়া বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধূপ ধূনা আরতি দ্বারা প্রসাদ লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্রের সৃষ্টির দ্বারা নানা কৌশলে অতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বার্থরক্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিল। বড় বড় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। জ্ঞান চর্চ্চার খর স্রোত প্রতিহত হইয়াছিল। শূদ্রও অন্ত্যজ সমাজ-সোপানে উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের অধোগতি হইয়াছিল। আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্য শোণিতের বিশুদ্ধতার সহিত আর্য্যপ্রতিভার খর জ্যোতি মলিনত্ব পাইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের নূতনভাবে পুনরাভ্যুদয়ের সময়ে, ব্রাহ্মণ মহিমার পুনস্থাপনের সময়ে, দুই একবার সেই প্রতিভা, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার মত, বৃষ্টিশেষে তড়িল্লতার মত দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা রীতিমত স্থায়ী হয় নাই, লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসে নাই; মলিন প্রতিভা পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হয় নাই।

বৈদিক কালের অতি প্রাকৃতের নিকট অসহায় স্তুতিবাদের সহিত দর্শনোপনিষৎ-প্রচারিত জ্ঞান ও বুদ্ধ-প্রচারিত প্রীতি, ও বৌদ্ধগণ প্রচারিত

যন্ত্র মন্ত্র উপাসনা সম্মিলিত করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি। আধুনিক হিন্দু সংসার মিথ্যা ও স্বপ্ন বলিয়া জানে, আপনাকে কর্ম্মবশে দুঃখবর্ত্মে ভ্রাম্যমাণ বলিয়া স্বীকার করে, এবং জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, সর্ব্বদা মুখে কহিয়া থাকে। হিন্দু পরোপকারে কুণ্ঠিত নহে, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীকে পরাভব করে, সংযম ব্রতোপবাস একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। হিন্দু রাজার নিকট দণ্ড সহিষ্ণু প্রজা, গুরুর নিকট বিনীত শিষ্য, পরিবারের নিকট কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভৃত্য। অত্যাচারী রাজ পুরুষের নিকটে হিন্দুর বাক্যস্ফুর্ত্তির ক্ষমতা নাই, উপদেষ্টা গুরুর নিকট হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার অবসর নাই। জীবন ধারণের উপযোগী অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইলেই সে পরিতুষ্ট, কঠোর জীবন-সমরে লিপ্ত হইতে পরাঙ্মুখ, শ্রমসাধ্য জ্ঞানার্জ্জনে কাতর। সংসার মায়াময়, জীবন মোহময়, সুত-পরিবার ভববন্ধনের শিকল; এমন কি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা এই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। বাহির হইতে কি একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করেন। মানুষও যেমন পরাধীন, মানুষের দেবতাও তেমনি পরাধীন। তথাপি হিন্দু বিরাগী হইয়াও গৃহী; এবং সংসার মিথ্যা জানিয়া, কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, হিন্দু পুত্র কামনায় দেবতার নিকট বলি মানস করে, পরকালে সুখের কামনায় গঙ্গা স্নান করে, ইহকালে স্বাস্থ্যকামনায় সাধুতলে মাথা ঠুকে, এবং সময়ে সময়ে শত্রু নিপাত কামনায় গুপ্তভাবে আগুনে ঘি ঢালে।

মোটের উপর ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। অন্য জাতির তুলনায় ভারতবাসী দুঃখী বলা যায় না। অন্যের তুলনায় ভারতবাসী দরিদ্র; কিন্তু সন্তুষ্টেস্তু সদা সুখম্। ভারতবাসী পরপীড়িত, কিন্তু পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে তাহার প্রতিবাদ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা ভারতবাসী ঠিক বুঝে না। তাহাতে ভারতবাসী নিতান্ত অসন্তুষ্ট নহে; কেন না, সে'ত বিধিলিপি, তাহা নিবারণের বোধ করি কোন উপায় নাই।

ভারত ভূমির শস্য সম্পত্তি কথনই অপ্রচুর নহে ; সুতরাং জঠরজ্বালা কখন বেশী তীব্র হয় নাই। অথবা কোনও বৎসর ফসল না জন্মিলে ভারতবাসী দল বাঁধিয়া মরিয়া যাইতে কোনও মতে পশ্চাৎপদ নহে। ভারতবাসীকে এ বিষয়ে কথনও কাপুরুষ বলিও না। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, তাহা ভারতবাসী ঋষিমুখে শুনিয়াছে ; কিন্তু পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান আহরণের দরকার নাই ; তাহা তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ভাণ্ডার খুলিলেই যথেষ্ট পরিমাণে মিলিবে। কর্ম্মে মোক্ষলাভ হয়, তাহাও সে জানে, তাই সন্ধ্যা বন্দনা তাহার নিকট ফাঁক যায় না, এবং মাসের মধ্যে উনত্রিশটা একাদশীর ব্যবস্থা হইলেও তাহার লোমহর্ষণের সম্ভাবনা নাই। এর চেয়ে মহত্তর কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? আর সংসারে অনাসক্তি তাহার শাস্ত্রের উপদেশ। যদিও গৃহিরূপে অবস্থান কালে এই উপদেশটার সম্যক্ প্রতিপালন সহজ হয় না; তবে একটু গোলোযোগ উপস্থিত হইলেই দারা সুত পরিবার বিধাতার মর্জ্জিতে সমর্পণ করিয়া গৃহাশ্রম হইতে দূরে পলায়ন করিয়া কুম্ভক রেচক অভ্যাস করিয়া হাঁপ ছাড়িবার পথ পায়।

ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির ইতিহাস এইরূপ ; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমেই হউক, আর দুর্ভাগ্য ক্রমেই হউক, যে প্রতীচ্য জাতির সহিত ভারতবর্ষের সম্প্রতি পরিচয় ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস মূলত বিভিন্ন। হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্তে মূলকথা—তৃপ্তি আর তৃপ্তি। পাশ্চাত্য দেশের ইতিবৃত্তে মূল কথা—অন্ন আর অন্ন। ইউরোপে যতদিন লোক সংখ্যা অন্ন সংস্থানের সীমা ছাড়াইয়া উঠে নাই, ততদিন ইউরোপের লোক পরস্পর রক্তারক্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু চিরদিন এমন চলে নাই। স্থান অল্প, ভূমি অনুর্ব্বর, লোক সংখ্যা বর্দ্ধমান, সকলের অন্ন জোটে না ; জঠর-জ্বালার তীব্র উত্তেজনায় ইউরোপে লোক স্বদেশ ছাড়িয়া বাহির হইল। প্রথমে বাহির হয় স্পানিয়ার্ড। দেখাদেখি পর্টুগিজ,

ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইউরোপ হইতে লোক দলে দলে বাহির হইল;

* * * * *

আর এই দল যেখানে একবার প্রবেশ করিল, সেখান হইতে আর বাহির হইল না। ইহাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রাজ্য ছারখারে গেল, প্রাচীন সভ্যতা লুপ্ত হইল; প্রাচীন মানব বংশ ভবিষ্যকালের ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে অস্থি-কঙ্কাল রাখিয়া ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। একমাত্র ভারতবর্ষে এই ধ্বংস দাবানল সম্যক্‌ভাবে জ্বলিতে পায় নাই; অন্ততঃ ভারতবাসী ধরাতল হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। সে ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত পুণ্য ফলে বলিতে হইবে। * * * * ইংরাজের, রুষের, ফরাসীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জার্ম্মাণী ইটালি প্রভৃতিও বহিঃ-সাম্রাজ্য-স্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। অন্ন চেষ্টার অধ্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি, ধন-বৃদ্ধি, জ্ঞান-বৃদ্ধি বিপুল বেগে ঘটিয়াছে। যশো-গৌরবে, জ্ঞান-গৌরবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মহিমাময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

কিন্তু হইলে কি হয়। ধরাপৃষ্ঠ অসীম নহে; খাদ্য সামগ্রী পরিমাণেরও সীমা আছে। লোক সংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর এখানে ওখানে, সেখানে যে একটু আধটু খালি জায়গা আছে, তাহা কিছুদিনেই জন পূর্ণ হইবে। তখন আর ইউরোপ সেখান হইতে অন্ন পাইবে না। তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম কি হইবে? এই এখন প্রধান সমস্যা।

ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। বর্ত্তমানের চাকচিক্য শোভার অন্তরেও গোলযোগ দেখা যায়। ইউরোপে যেন একটা মহা কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের

আয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় জাতিই তাহার উদ্যোগ পর্ব্বে ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন। হয়ত সেই মহা কুরুক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার বিপুল সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলি-স্তূপে পরিণত হইবে। সমাজের অভ্যন্তর হইতেও একটা অতৃপ্তির ও অশান্তির ও যাতনার তীব্র নিনাদ উঠিতেছে। সমাজ প্রতিক্ষণেই বিপ্লবোন্মুখ। দরিদ্রের প্রতি ধনীর দৃষ্টি নাই। দরিদ্র ধনীর কণ্ঠ শোণিত পানে ক্ষুৎ-যন্ত্রণা মিটাইতে প্রস্তুত। উপরে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শোভা, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লোক-নয়ন ঝলসিতেছে। অভ্যন্তরে মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা ক্ষীণচর্ম্মে কঙ্কাল আচ্ছাদিত করিয়া ত্রাহিস্বরে ডাকিতে ডাকিতে পৈশাচিক বদন ব্যাদন করিয়া সমাজ-শরীর গ্রাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। রাজ-পুরুষগণ রাক্ষসীকে শাসনে রাখিবার চেষ্টায় আছেন ; কিন্তু শাসন আর মানে না।

ইউরোপের রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, এই জীবন মরণ সমস্যা লইয়া বিব্রত। কিন্তু মীমাংসা খুঁজিয়া মিলিতেছে না। আনি বেসাণ্টের বিচিত্র জীবনের বিবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলা সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যা পূরণের জন্যই এই অসামান্যা নারীর জীবনের প্রধান ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। লণ্ডনের দরিদ্রতার সহিত বহুদিন ধরিয়া তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্তা ছিলেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া ক্লান্ত শরীরে তিনি এই শান্তরসাস্পদ পুরাতন পুণ্য তপোবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ স্থির ক্ষমাশীল সহিষ্ণু সংযত জাতির প্রতি চাহিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, এমন আর হয় না ; ইহার আর তুলনা নাই।

ইউরোপ কর্ম্ম-প্রবণ, আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্য-প্রবণ। কর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব ইউরোপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আর বৈরাগ্য হইতে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শান্তি, অনাসক্তি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, গৌরব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। তাই হিন্দু-জাতির তৃপ্তি ও

শান্তি স্থিতিশীলতায় হিমাচলের স্পর্দ্ধা করে। অক্ষুব্ধতায় প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনীয় হয়। আর ইউরোপের জ্ঞান গৌরব পরাক্রম হয়ত আকাশবাহী উল্কার মত, অগ্নি-গিরির উদ্গীরিত বহ্নির মত, ক্ষণস্থায়ী শোভা বিস্তার করিয়া নির্ব্বাণ হইতে পারে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্নমুখবর্ত্তী দুই পথ বর্ত্তমান। কোন পথ অবলম্বনীয়, ইহাই হিন্দু-সন্তানের প্রধান বিচার্য্য।

১৩০১ আষাঢ়।

ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম

পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, সে কালের তেজীয়ান্ মুনি-ঋষিগণের সন্তান-সন্ততি সকল সময়ে জন্ম-গ্রহণের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে দশ মাস কাল গর্ভাবস্থানরূপ যাতনা ভোগের অপেক্ষা রাখিতেন না। দেশকাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই যত্র তত্র অকস্মাৎ এক এক ঋষি-বংশধরের আবির্ভাব হইত, এবং তিনিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ শাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একটা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করিয়া ফেলিতেন।

ষাটি বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবামাত্র বিলাতী সরস্বতী দশ মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব করিলেন; এবং অকস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন; কেহ আশঙ্কা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়ীকে ভারত সাগরে ডুবাইয়া মারিল।

তারপর ষাটি বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতের বিশেষ উন্নতির বা অধোগতির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে আর এক তান উঠিয়াছে, ইংরাজী বিদ্যা এদেশের ক্ষেত্রে ফলিল না; বাঙ্গালার মাটিতে কি বিলাতি ওক্ গাছের বৃদ্ধি হয়? এদেশের মাটিতে বরং দেশী প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার চাষ আবাদ করিলে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

বিজ্ঞের দল স্মিতমুখে বলিতেছেন আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম, বিলাতি

মালমাত্রই ভূয়া; কেবল বাহিরের চাক্‌চিক্য দেখিয়া তোমরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিলে; এখন ঠেকিয়া শেখ ও পথে এসো।

সুতরাং নব্য-প্রাচীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বদেশী-বিদেশী, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন দেখা যাইতেছে; একটা নূতন পন্থার আবিষ্কার ও অনুসরণ না করিলে ভারতবাসীর মানসিক উন্নতির আর উপায় নাই; সর্ব্বত্র এইরূপ একটা ভাব অন্তরে অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। ত্রিশ বৎসরের বেশী হইল, ইংরাজী বিদ্যার বহুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বড় বড় অধ্যাপক বড় বড় জটীল শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া বৎসর ধরিয়া ভারতবাসার মরিচা ধরা মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দিতেছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত ভারত-বর্ষে একটা নিউটন জন্মিল না, একটা ফ্যারাডে জন্মিল না। কি পরি-তাপ! ভারতবাসীর মস্তিষ্কটারই বোধ হয় দোষ আছে ডারউইনের মতানুসারে বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়ভুক্ত জীবের কিছুদিন হইতে অনুসন্ধান হইতেছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোক সেই জীব।

যাহাই হউক, সরস্বতী এ দেশে পদার্পণ করিয়া বন্ধ্যা হইলেন, অথবা কেবল অকাল প্রসূত দুর্ব্বল জীবের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন, এদেশের পক্ষে এ বড় দুর্নাম ও কলঙ্কের বিষয়। সুতরাং, এই কলঙ্ক রটনার ভিত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

ফলে, কথাটা কতদূর সত্য, দেখা যাউক। বিলাতের মাটিতে নিউটন, ফ্যারাডের মত লোক দুই দশটা করিয়া প্রতি বৎসর জন্মায়, এমন নহে, সুতরাং সে কথা বলিয়া হা-হুতাশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনের পক্ষে ত্রিশ বৎসর কি যাটি বৎসর এত অধিক সময় নহে

যে, তাহার মধ্যে একটা প্রচণ্ড উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিতে হইবে।

যাঁহারা এরূপ আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্য নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধি নামক গুণের জন্য তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে পারি না।

যাঁহারা পঞ্চাশ ষাটি বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম আমদানির সময়ে একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটাইয়া আঠার দিনের মধ্যে ধর্ম্মের রাজ্য সংস্থাপন করিয়া দিব স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আস্ফালনেও কোনরূপ অধীর বা বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রভূত উন্নতি হয় নাই বলিয়া শোক তাপের কোনও কারণ নাই।

কেহ কেহ হয়ত এই সময়ে চোক রাঙাইয়া বলিবেন, বাতুলের মত একি কথা বলিতেছ, ইংরাজী শিক্ষায় কোন্ বিষয়ে আমাদের উন্নতি হয় নাই? যখন আমরা ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে স্পষ্টতঃ অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হইয়াছি, তখন এখনও আঁধার গেল না বলিয়া চীৎকার করা, এবং কেন আঁধার গেল না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলা, কেবল অন্ধত্বেরই লক্ষণ। দেখ না, আমরা রেলওয়ে খুলিতেছি, সাহেবে কাণ মলিয়া দিবামাত্র বিলাতে টেলিগ্রাফ্ পাঠাইতেছি, এমন কি, মদ্যপানের বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ অন্যায়, ইহাও বলিতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীন-চিন্তার পরিচয় দিতেছি। পুনশ্চ, দেখ, সেকালের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, আমরা এখন পৃথিবীর গোলত্বের প্রতিপাদনার্থ জাহাজের মাস্তুল ঘটিত প্রমাণ এক নিঃশ্বাসে আওড়াইতে পারি; দধি, ক্ষীর অথবা এলকোহলের সমুদ্রের কথা জানি না; কুশ, শাক, প্লক্ষ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌নামীয় দ্বীপের অস্তিত্ব শুনিলে হাস্য করি; বিকটাকার তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থলে এক ঈশ্বরের অনুভব করি; এবং ইংর

শিক্ষার সহকারে ইংরাজের রাজনৈতিক ধাত লাভ করিয়া, বড় চাকরির সহিত নির্ব্বাচন প্রথাদিও চাহিয়া থাকি।

আমরাও বলি, ঠিক্ কথা। ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা যে কিছুই লাভ করি নাই, এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা কথা।

যে ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষায় একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে চাহেন, আমরা তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহি। এবং আশা করি, ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে এইরূপ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে কখনও পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তথাপি —অর্থাৎ কিনা, আমরা শিখিয়াছি অনেক, ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই। আমাদের মজ্জা বা শোণিত শোধিত হয় নাই; আমাদের শরীরে বল জন্মায় নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থিচর্ম্মসার চিররোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অথবা গলিতনখদন্ত বৃদ্ধকে পরচুলা, রঙ ও কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে যুবা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে নামান হইয়াছে। জীর্ণ, কণ্ঠাগত প্রাণ রোগীকে ফোঁটাকতক ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া কিয়ৎকাল তাহার শরীরে অস্বাভাবিক বল সঞ্চয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বা তাহার হৃৎস্পন্দন পুনরানয়ন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হিম অঙ্গে উষ্ণতার সঞ্চার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী লাভ কিছুই হয় না। আমাদের পক্ষে এ কতকটা সেইরূপ। আজ যদি ইংরাজেরা চলিয়া যায়, আমরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইব, ছুঁচের অভাবে নরুণ বা কাঁটা ব্যবহার করিব, এবং পুনরায় শাকদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ আওড়াইতে থাকিব। এ সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য কথা; সত্য কথা ও পুরাণ কথা সবিস্তার উল্লেখের প্রয়োজনাভাব।

আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে হয় ও কিরূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই।

মনুষ্যজাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই।

রাজ্য বিস্তার দূরের কথা; কিরূপে নিজের পরিচিত সীমানা পার হইয়া পা ফেলিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, আমাদের সাহসেও কুলায় না। রাজ্য অধিকারার্থ কি কি অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় তাহার কতকগুলার নাম কণ্ঠস্থ করিয়াছি বটে; কিন্তু কখনও তাহা চক্ষে দেখি নাই। আমাদিগকে না চালাইলে আমরা চলিতে পারি না, আমাদিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না; আমাদের নিজের হাত পা'র উপর নিজের কর্তৃত্ব নাই; আমাদের জীবনী-শক্তির মাত্রা শূন্য। আমরা সোলার সিপাই; তার টানিলে আমাদের হাতের ঢাল তলোয়ার নড়িতে থাকে; আমরা ছেলেদের খেলানার ব্যাঙ্; পেট টিপিলে আমরা বক্‌বক্ করি।

অবশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা এক হিসাবে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে সেই বা কতটুকু? কতকটা আমরা একত্ব লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই; কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী, মার্হাট্টা ও শিখ, এক কার্য্যের জন্য একাসনে বসিবে, ইহা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এখন সম্ভব হইয়াছে ইহা কতকটা ইংরাজী শিক্ষার গুণে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকটা আবার ইংরাজী শাসনের গুণে ও অন্য পাঁচটা কারণে। এবং এই একত্ব সাধনেও আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা, লঘুতা, ও তত্ত্বহীনতা অনেকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমরা এই জাতীয় চরিত্রের এই হীনতাটা দেখিতে শিখিয়াছি, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি; কিরূপে হীনতা শোধন করিতে হইবে, তাহা শিখি নাই। তবে ভবিষ্যতে ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজের পায়ের বুট ও আমাদের রুগ্ন প্লীহা, এতদুভয়ের সাহায্য লাভ করিয়া কতকটা চরিত্র শোধনের পথ দেখাইয়া দিতেও পারে।

আর জ্ঞানার্জ্জনের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা শিখিয়াছি অনেক। টিটিকাকা টির্ব্বকৃটুর ভৌগলিক বৃত্তান্ত হইতে অক্সিজেন, ক্লোরীণ, আর ইলেক্ট্রিসিটি ও ইথর, অনেক কথা শিখিয়াছি, যাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমরা বড় বড় আঁক কষিতে পারি, যাহা ভাস্করাচার্য্যের মাথায় কখনও আসে নাই; বায়ু মধ্যে শব্দের বেগ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া নিউটন কিরূপে ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা অক্লেশে বলিয়া দিতে পারি। এমন কি, বোতলের ভিতর হাইড্রোজেন পুরিয়া নির্ভয়ে আওয়াজ করিতেও সমর্থ হইয়াছি।

সুতরাং আমরা ইংরাজের প্রসাদে, শিখিয়াছি যথেষ্ট; এমন কি, আমাদের শিখিবার শক্তি কত গভীর এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ মানরজ্জু ফেলিয়া নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার শক্তি কই, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নূতন কথা কি বলিলাম। উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ত কিছুই দেখি না, এবং আর কিছুদিনের মধ্যে যে পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহার কোন শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। ইংরাজী শিক্ষার কি এই পরিণাম?

আমরা গুরু উপদেশ গ্রহণে অতিশয় মজবুত; সে বিষয়ে আমাদের তুলনীয় কে আছে, জানি না। আমরা বালকের হাতে কর্দ্দম; কাঠিন্য মাত্র বর্জ্জিত! আমাদিগকে লইয়া যাহা গড়িবে, আমরা তাহাতেই পরিণত হইব। আমরা এক দিনের মধ্যে তেত্রিশকোটি দেবতা ভাঙ্গিয়া একেশ্বরবাদী বা নাস্তিকবাদী হইয়া দাঁড়াই, আবার এক বক্তৃতায় আমাদিগকে থিয়সফিষ্ট করিয়া তুলে। আমরা হাতচালা ও ভূত নামানো গল্প শুনিয়া উৎকট-হাস্যে গৃহপ্রাকার ধ্বনিত করি, আবার পরমুহূর্ত্তে টেলিপ্যাথি বা সাইকিক ফোর্স শুনিলেই আত্মহারা হইয়া গলিয়া যাই।

আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি সত্য; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোণিতে এখনও আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হই; কিন্তু আমরা যাহা শিখি তাহা মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মানুষের চুল তাড়িতের পরিচালক নহে শুনিবামাত্র আমরা লম্বা লম্বা টিকি রাখিতে আরম্ভ করি; এবং চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার ভাটা হয়, পাঠ করিবামাত্র কোষ্ঠী গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় অবস্থা কি হয়?

বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না। মস্তিষ্কে কতকগুলা মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া যথা বিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একেবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিয়া থাকি, ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয়, ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতু বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহির হইবামাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরী সহে না। উদ্যমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই; ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না; কেবল একবার চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব ডার্উইনের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি, আবার গ্রিসলি সাহেব নাক মাপিয়া ডার্উইনের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হউক আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমরা দ্বিধাচিত্তে গ্রহণ করিব, ততদিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তি সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞান ছাড়িয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বা অন্যত্রই আমরা কি করিয়াছি? কিছু দিন ইংরাজী ভাষায় টেকদার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরী লইবার তৃষ্ণা আমাদের শিক্ষিতদিগকে অভিভূত রাখিয়াছিল। সম্প্রতি সে ভ্রান্তি কতকটা গিয়াছে বলিতে হইবে। তবে আজিও অকারণে ইংরাজী-ভাষায় ব্যুৎপত্তি জাহির করিতে গেলে হাস্যাস্পদ ও অবজ্ঞাপদ হইতে হয় না। বাঙ্গলা সাহিত্য আমাদের সমাজ কতকটা সরগরম করিয়া রাখিতেছে সত্য। সুখের বিষয় ও আশার বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গলা সাহিত্যে আছে কি? উপন্যাস ও কাব্য? তাই বা কয়খানা? কাব্য-রস আস্বাদনের শক্তি আমাদের কতকটা আছে স্বীকার করি। সৌন্দর্য্য বোধ আমাদের পুরাতন জাতীয় সম্পত্তি। প্রকৃতিতে ও মানব চরিত্রে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতায় আমরা কোনকালে বঞ্চিত নাই। পূর্ব্বেও ছিলাম না, এখনও নহি। ইংরাজী-শিক্ষা যে এই অনুভূতির মাত্রা বা সূক্ষ্মতা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।

তবে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজের চরিত্র এবং পাশ্চাত্যগণের জাতীয় জীবনের ঘটনাবহুল বিচিত্র অদ্ভূত ইতিহাস অনেক অপরিচিত সুন্দর প্রদেশ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিয়াছে; আমরা এখন সেই নূতন ফুলের মধু আহরণে অধিকারী হইয়া কতকটা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি, এই পর্য্যন্ত।

যাটি বৎসর ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই; আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের

শক্তি বাড়ে নাই ; আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি, কিন্তু স্বয়ং বাক্য রচনা করিতে জানি না। আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ। জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই ; আমরা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা জানি না।

চির দিনই কি এমনই ছিল? প্রকৃতই কি আমরা পিতৃপরম্পরাক্রমে পিতৃ-পিতামহ হইতে এই অস্থিহীন মাংসপিণ্ডবৎ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছি? বস্তুতই কি আমাদের হীনতা ধাতুগত ও মস্তিষ্কগত? বস্তুতই কি আমরা মানুষ ও বানরের মধ্যগত পর্য্যায়ভুক্ত জীব?

অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন যাহার অভ্যাস আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—না। চিরদিন ত এমন ছিল না। গুরু-বাক্যে ভারতবাসীর অমেয় শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে সত্য ; এবং সেই আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা কখন কখন জ্ঞানবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ভারতে জ্ঞানান্বেষণ ছিল না, এমন কথা বলিও না ; তাহারা জ্ঞানের রাজ্য প্রসারিত করিতে জানিত না, অথবা পুরাতন পরিচিত পরিধির বাহিরে পদক্ষেপ করিতে সে কালের ভারতবাসী সাহস করিত না, এ কথা বলিও না। কিরূপে প্রাচীনকে ধ্বংস করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কিরূপে জীর্ণ কুটীর ভূমিসাৎ করিয়া অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, কিরূপে সাহসের সহিত বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া জ্ঞানবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া অজ্ঞানের তিমিররাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, সে কালের লোকে জানিত। সাক্ষী—উপনিষদ্, সাংখ্য, বেদান্ত, দশমিকলিপি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ, লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায় ; সাক্ষী—বুদ্ধ ও শঙ্কর, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর, গদাধর ও রঘুনাথ। কত নাম করিব? চক্ষে কি জল আইসে না? লেখনী কি সরে?

দধি সমুদ্র ও ইক্ষু সমুদ্রের কথা তুলিয়া হাসিও না ; 'তৈলে পাত্র কি

পাত্রে তৈল' বিতর্কের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিও না; উনবিংশ শতাব্দীর উপার্জ্জিত জ্ঞানের সহিত, সে কালের জ্ঞানের তুলনা করিয়া তাচ্ছিল্য দেখাইও না। মনে রাখিও, সে কোন্ কালের কথা; মনে রাখিও, তখন পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল, তখন এ দেশেরই অবস্থা কিরূপ ছিল। নিউটন্ যাহা জানিতেন না, এখন তুমি জান; তথাপি তুমি নিউটনের চরণরেণুর যোগ্য নও, এ কথাও স্মরণ রাখিও। তবে সে কালের মাহাত্ম্য বুঝিবে। অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিমাণ লইয়া কথা নহে; জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা ও জ্ঞানার্জ্জন-ক্ষমতা লইয়া কথা। আমরা ইংরাজের নিকট শিখিতেছি; সে কালেও তাহারা পরের কাছে না শিখিত, এমন নহে। গ্রীকের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা প্রমাণ। তবে বিদেশ হইতে বীজ আমদানি করিয়া তাহার চাষ করিতে জানিত, তাহা ফলাইতে পারিত; আমরা তাহা পারি না। আর যে জ্ঞান স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ও মাত্রাই কি সামান্য? সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। সে কালের সহিত এ কালের তুলনা করিও না।

পুরাকালের কাহিনী দূরের কথা, সে মুসলমানী আমলে আমাদের যা ছিল, এখনও তাই আছে কি? মুসলমান রাজার সময়ে আমাদের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট ছিল, এখন বড় উন্নত হইয়াছে, এইরূপ একটা কথা গম্ভীর-ভাবে অনেকে যখন তখন বলিয়া থাকেন। ছি ছি! লোকে যখন কুর্ণিশ করিয়া সাত পা পিছাইয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে যাইত, যখন ভট্টাচার্য্য লম্বিত শিখাসহ টোলে ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি লইয়া কাল কাটাইতেন ও গৃহস্থ ভদ্র পার্শির বয়েদ আবৃত্তি করিয়া মুন্সিয়ানা জানাইত, এবং পাঠশালার গুরু মহাশয় পোড়োদের দ্বারা তামাক সাজাইয়া লইতেন ও উকুন তোলাইতেন, সে কালের অবস্থা মনে করিতেও আমাদের ঘৃণা আইসে। ছি ছি, সে কালের কথা মুখে আনিও না।

আমরা লজ্জার মাথা খাইয়া তখনকার প্রসঙ্গও উত্থাপিত করিতে চাই, এবং তখনকার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে চোখে হাত দিয়া থাকি। ভট্টাচার্য্যের টোলঘরের পার্শ্বস্থ গোশালা ও ইজার-পরিহিত কাজি সাহেবের মুখে পলাণ্ডুর গন্ধ ভুলিয়া যাই। প্রতাপ ও শিবজী, নানক ও কবির, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। চতুষ্পাঠি মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ, বেদান্ত ও ন্যায়, কাব্য ও অলঙ্কারের স্বাধীন আলোচনা মনে পড়ে। এ সকল সত্য কথা; ইতিহাসের অপলাপ করিও না। সে কালে যত দুর্দ্দশাই থাক, সজীবতার লক্ষণ ছিল; শত্রুতেও আমাদের মর্য্যাদা করিত, ভয় করিত। এখন কি?

সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনে স্পৃহা ও ক্ষমতা আমাদের কোনকালেও ছিল না এ কথা বলিলে সাজিবে না। ইংরাজী বিদ্যার কেহ দোষ দিবে না; সে কথা যে বলিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেল। তবে সম্প্রতি এ দুরবস্থার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধেয়।

অদৃষ্ট দোষেই হউক আর শিক্ষা প্রণালীর দোষেই হউক, ইংরাজী শিক্ষা ষাটি বৎসরে আমাদের দেশে ফলে নাই। বৎসর বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানকালে প্রতিনিধি চ্যান্সেলারের মুখে এই আক্ষেপই শুনা যায়। আমাদের জ্ঞানার্জ্জনে মতিগতি হইল না, জ্ঞান-রসের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা জন্মিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৎসর বৎসর হাজার দরুণে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু এক-জনও একখান লাঙ্গল আনিয়া জ্ঞানরাজ্যের এক ছটাক জমিতে চাষ দিল না।

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় আর একটা আছে। সরস্বতী যত্নের সহিত কোলে লইয়া তাঁহার বীণা পুস্তক তাঁহার সন্তানগণের হাতে দেন; কিন্তু কৃতী সন্তানেরা মায়ের কোল হইতে

নামিবামাত্র বীণাটি ভাঙ্গিয়া ও পুস্তকখানি বেচিয়া মায়ের সপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন।

জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি নাই, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু অর্থোপার্জ্জন জ্ঞান-চর্য্যার একমাত্র উদ্দেশ্য, এ বড় ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ বাক্য। এবং সত্য বল দেখি ইংরাজী-শিক্ষা কি আমাদের সমাজে অর্থোপার্জ্জনের ও জীবিকা অর্জ্জনের সুগম উপায়মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে?

ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম আবির্ভাবকালে যে সকল মহারত্ন সহসা আবির্ভূত হইয়া সমাজকে উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের উৎসাহ-বহ্নি শেষ পর্য্যন্ত হাকিমী, উকীলী, কেরাণীগিরী প্রভৃতিতে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার বলে হাকিম ও উকীল ও কেরাণীতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল। ফলতঃ মূষিক অতি-বৃষ্টি প্রভৃতির ন্যায় গ্রাজুয়েটের অতি-সৃষ্টি রাষ্ট্রের পক্ষে একটা ঈতিস্বরূপ, বলিয়া গণ্য হইতেছে। রাজা ব্যস্ত; ইহাদিগকে লইয়া কি করিবেন? সমাজ ব্যস্ত, কিরূপে ইহাদের খোরাক যোগাইবে; বিশ্ব-বিদ্যালয়-জননীও প্রসূত অপগণ্ডগুলির সংখ্যাধিক্যে, লজ্জিতা ও কাতরা। আমাদের মত যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় মাতার অকৃতী সন্তান তাহারাও ভ্রাতৃ-সংখ্যাধিক্যে ভীত হইয়া, সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছে, 'সম্বর সুভগে, দিনকতক ক্ষান্তি দাও; এ যদুকুল আর বাড়াইয়া ফল কি! আমাদের খোরাকের কিছু আধার হউন! শেষে ভূভার-হরণের জন্য অবতারের প্রয়োজন যেন না হয়! জননী, উকীল প্রসবিনী, উকিলের আর স্থান নাই মা।'

অন্য দেশে কি অবস্থা, জানি না; কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষে লোকে জীবিকার্জ্জনের পন্থা শিখিবার জন্য বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করে। এবং ইহাও একটা লোমহর্ষণ সত্য কথা, যে ব্যক্তি বিদ্যামন্দির হইতে বাহির

হইয়া অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ না হইল, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমাজ তাহাকে অবজ্ঞা করে, তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে টিট্‌কারী দেয়; সে দুষ্কৃতকারীর মত মুখ ঢাকিয়া লোক সমাজে বেড়ায়; তাহার জীবনে ভারবোধ হয়। সে অক্ষম ও ভাগ্যহীন, সংসার মধ্যে সে দয়ার পাত্র।

বিদ্যার এইরূপ লাঞ্ছন দেখিয়া গাত্রে লোমাঞ্চ জন্মে; ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা থাকে না, সমাজের অধঃপতন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজ অনেক আশায় ভারতবাসীর মূর্খত্ব অপনোদনের জন্য বিদ্যা বিতরণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অমূল্য রত্নের কি এই মূল্য? বানরের গলায় মুক্তার হার শোভা পায় না; ভারতবর্ষের বিদ্যা-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল।

ভারতবর্ষের, অর্থাৎ যে দেশের মধ্যে এক সুবৃহৎ মানব সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল হইতে কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ধনলালসা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন পর্ণকুটীর ও শাকান্ন লইয়া তৃপ্ত থাকিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভারতের ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। তাহার কোষে অর্থ ছিল না; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন মাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছিল; এবং এই গরীয়ান্ স্বার্থ-সংহারের জন্য সমাজ তাহাকে শীর্ষস্থানে বসাইয়া পূজা করিত। অদ্যাপি চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দু-সমাজে শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান আছেন; কোটিপতির মুকুট-মণ্ডিত মস্তক তাঁহার চরণরেণুর স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়।

এখনও সেই প্রাচীনকালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারার ক্ষীণস্রোত এদেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনও নাকি সিন্ধুতীর ও কৃষ্ণাতীর শিক্ষার্থী নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তিমাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া শিক্ষক-সমীপে উপস্থিত হয়।

তাহারা কি শেখে, কি না শেখে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি তাহাদের উদ্দেশ্য, কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, কিসে তাহাদের তৃপ্তি, কেবল তাহাই দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

ভারতবর্ষের অন্য জাতির কথা জানি না; কিন্তু হিন্দুজাতি জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝে না, ইহা তাহাদের জাতীয় অপকর্ষের পরিচয়, এ কথা কহিতে পারি না। তবে কেন এমন হয়?

কুক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিতগণকে বড় চাকরিতে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং কুক্ষণে অর্থাগমের জন্য ইংরাজী জ্ঞানের দরকার হইয়াছিল। দরিদ্র অন্নার্থী ভারতবাসী অন্নাহরণের এমন সুগম পথ পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সেই পথে ছুটিবে, বিচিত্র কি? তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্নচিন্তা মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ; সে জন্য যে দোষ তাহা দরিদ্র হিন্দু-যুবকের নহে; বিশেষতঃ, মাসীপিসী ও পিসিত ভগিনীর বিধবা পুত্রবধুর অপোগণ্ড সন্তানগুলির সমবায়ভূত সুবৃহৎ ক্ষুধার্ত্ত হিন্দু-পরিবার যখন সতৃষ্ণ ও সোৎকণ্ঠভাবে কলেজ-যাতায়াতশীল যুবকের আগামী পীরক্ষার পাশের জন্য ঊর্দ্ধমুখে তাকাইয়া থাকে। দেশশুদ্ধ সমুদয় লোককে যে অন্ন-চিন্তা ও বস্ত্র-চিন্তা ত্যাগ করিয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনায় নিরত হইতে হইবে, এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করিতে পারি না, এবং কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হিন্দু-যুবকের চক্ষের সম্মুখে অকস্মাৎ বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতার শুষ্ক অক্ষম ও কঙ্কালাবশেষ শরীর শুশ্রূষার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, ও বাল্যে বিবাহিত পত্নী তিন চারিটি শিশু-সন্তানসহ অন্নার্থিনী হইয়া আহার মুখের পানে চাহিতে থাকে, এই ব্যাপারের জন্য মনুষ্য চরিত্র ও সমাজ চরিত্রকে দায়ী করিতে পার; হিন্দু-যুবককে দায়ী করিতে গেলে বড় নিষ্ঠুরতা হইবে।

বিলাতী শিক্ষার সহকারে বিলাতী সভ্যতার নিয়ম এদেশে উপস্থিত

হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংসার খরচের মাত্রাটা অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে; সেটিও বিবেচনা করা উচিত। চটিজুতা ও তালপাতের ছাতা মাত্র লইয়া এমন কি সেনেট হাউসে পদার্পণ করাও বড় সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে; এবং উত্তরীয় মাত্র স্কন্ধে করিয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে বেত্রাঘাতের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। জলের গেলাস মুখে তুলিবার সময় ফিল্‌টার করা না থাকিলে ব্যাসিলাসের অবস্থিতির শঙ্কা জন্মে, এবং দেহে ব্যাধি ঘটিলে কবিরাজ মহাশয়ের প্রাচীন কফপিত্তঘটিত প্যাথলজির আশ্রয় লইতে সাহস হয় না। সুতরাং জ্ঞান-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকিলেও কিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় না দেখিলে চলে না; এবং ভিক্ষা ও চাকরি ভিন্ন অর্থাগমের তৃতীয় পন্থা এদেশে বর্ত্তমান নাই।

একটা কথা উঠিয়াছে, ভাল ছেলেদের জন্য যদি বড়লোকে বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল ভাল মাথা হাইকোর্টের গ্রানিট দেওয়ালের আশ্রয় লইতে না যাইতে পারে। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পর্য্যন্ত লাটবাহাদুরগণের শুভ-বিদায় উপলক্ষে প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকিবে, ততদিন এ প্রস্তাব অরণ্যে রোদন মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগে দেশীয়দিগকে মোটা বেতনে চাকরি দেন না, এই একটা আক্ষেপ আছে। কথাটা ঠিক আমাদের মত ভিক্ষোপজীবীর উপযুক্ত, সুতরাং প্রথমে উপস্থিত করিতে লজ্জা হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশে যখন ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের উপজীব্য এবং ইংরাজী বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছে ভিক্ষা স্বরূপ গ্রহণ করিতেছি, তখন আর লজ্জা করিয়া কোন লাভ নাই। গবর্ণমেণ্টের উপর কতকটা দাবীও আছে।

*   *   *   *   *

আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর মূলে দোষ

বর্ত্তমান আছে। এই মূলস্থ দোষের সংস্কার সাধন না হইলে কোনরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষার আশানুরূপ ফল-লাভ না দেখিয়া প্রাচীনের দল পুনরায় টোলে প্রবেশ করিয়া অমরকোষ মুখস্থ করিতে উপদেশ দিতেছেন; এবং আমাদের ইংরাজ-মনিবেরা আমাদের জাতিগত হীনতাকেই কারণ স্থির করিয়া আমাদের মনুষ্য জাতীয়ত্বে কিছু সন্দিহান হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় আমাদের জাতির মনুষ্য ধর্ম্মে সংশয় স্থাপনের সম্যক্ কারণ এখনও উপস্থিত হয় নাই; এবং দেশী পুঁথিগুলির বহুল প্রচারের জন্য ইংরাজী গ্রন্থগুলির উপর আমদানি মাশুল বসাইবার প্রস্তাবনা করিলেও ভবিষ্যতের আশা আছে। দোষ ইংরাজী বিদ্যার ত কখনই নহে; এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রেরও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে; বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাতে বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেই প্রণালীর সংস্কারের একবার চেষ্টা করা উচিত। কোন্‌দিকে সংস্কার চলিতে পারে, এ প্রবন্ধে উত্থাপন করিতে সাহসী হইলাম না। যদি কোন পাঠক নিতান্ত করুণা-পরবশ হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের এতদূর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের এই স্থলে উপসংহার করিলাম।

১৩০২, শ্রাবণ।

সাহিত্য-কথা

কৃষ্ণকান্তের উইল যখন প্রথমে পড়িয়াছিলাম, তখন ঐ কাব্যের সহিত ম্যাক্‌বেথের একটা সাদৃশ্যবোধ মনের মধ্যে আসিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই সাদৃশ্যের অনুভবটা মনের মধ্য হইতে লুপ্ত হয় নাই, বরং আস্তে আস্তে কাটিয়া বসিয়াছে। আমার সেই অনুভূতির পক্ষে বিশেষ কিছু যুক্তি আছে কিনা জানি না; এবং কাব্য সমালোচকের ও সাহিত্য-সমালোচকের বিশ্লেষণী দৃষ্টির নিকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহা উপহাস্য হইবে না, এরূপ সাহসও আমার নাই। অধিকন্তু ব্যক্তি-বিশেষের মনের একটা ভাব সাধারণ পাঠকের উপর নিক্ষেপ চেষ্টা কতকটা আবদার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তথাপি পাঠক ও সমালোচক, উভয়ের নিকট সভয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কথাটা ফুটিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কিন্তু বলিতে প্রবৃত্ত হইলেই একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বকথা আসিয়া প্রথমে উপস্থিত হয়। সাহিত্য-সমালোচনায় তত্ত্বকথা অনেকে ভালবাসেন না, ও কিঞ্চিৎ শঙ্কা ও বিরাগ সন্দেহের সহিত তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করেন। কাব্যমধ্যে তত্ত্বকথার আবিষ্কার সাধারণ পাঠকের প্রতি অত্যাচার ও কাব্য প্রণেতার প্রতি ঘোরতর নিগ্রহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কাব্য মাত্রেরই একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে এরূপ কোন আইন থাকা উচিত নহে; এবং কাব্য মাত্রেরই অভ্যন্তরে একটা নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিতে হইবে, কবিগণও এরূপ কঠিন নিয়মে বাধ্য নহেন।

একটা উদাহরণ দিয়া এই ভূমিকাটা বিশদ করা যাইতে পারে। একটা বড় গোছেরই উদাহরণ লওয়া যাক্। মনে কর মহাকবি কালিদাস। কালি-

দাস-প্রণীত কাব্য মধ্যে কোন গূঢ় দুর্ভেদ্য দার্শনিক তত্ত্ব গুপ্ত আছে কি না জানি না। কেহ কেহ এইরূপ তত্ত্ব আবিষ্কারে যত্ন করিয়াছেন শুনিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। আমার স্থূল বিবেচনায় কালিদাসের কালিদাসত্ব এরূপ দার্শনিক তত্ত্বের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। সম্পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টির অভাব সত্ত্বেও কেবল খানিকটা অনুভূতিমাত্র লইয়া কালিদাসের নিকট উপস্থিত হইলে তৎপ্রদত্ত কাব্যরসের আস্বাদন পূর্ণ-মাত্রায় পাওয়া যাইতে পারে। রসপিপাসুর পক্ষে আশাতে বঞ্চিত হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় না; সেখানে তিনি যে রস আস্বাদন করিতে পান, অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। মহাকবির মহিমা দূর হইতে যেমন শুনা যাইত, নিকটে আসিয়া দৃষ্টি করিলেও ঠিক তেমনি অক্ষুন্ন থাকে, অথবা আরও বাড়িয়া যায়। অন্য কবি হইতে কালিদাসের বিভেদ, তাঁহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে; তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় ও তীব্রতায়, তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সামর্থ্যে। এই বিষয়ে কালিদাস বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। পৃথিবীতে যেখানে যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তিনি একত্র আনিয়াছেন এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিধাতা তৎসৃষ্ট জগতের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, তৎসমুদয়ের অংশ একত্র করিয়া দেখিলে কেমন দেখায়, তাহা দেখিবার লালসায় কালিদাসের উমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কালিদাসও সেইরূপ জগতের অসীম সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের মধ্যে যা'কিছু সুন্দর সমস্ত একত্র করিয়া তাহার সমাবেশে কিরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহারই নমুনা আমাদিগের চোখের উপর রাখিয়াছেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে কালিদাসের ক্ষমতার পরিমাণ হইল না। আর একটা কথা এখানে বলিতে হইবে।

পৃথিবীতে যে স্বভাবতঃই কতকগুলা সুন্দর জিনিষ আছে, আর কতকগুলা কুৎসিত জিনিষ আছে; এইরূপ নির্দ্দেশ সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নহে।

সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য ভোগীর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। অনেক সময়ে কেন, বোধ হয় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সৌন্দর্য্যভোগী নিজের ব্যবহারের জন্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া লয়। মনুষ্যবিশেষে এইরূপ একটা ধর্ম্ম বা ক্ষমতা বিদ্যমান আছে; সেই ধর্ম্মের বা ক্ষমতার এক কথায় অনুরাগ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই অনুরাগের পরিমাণ সকল ব্যক্তিতে সমান পরিমাণে বর্ত্তমান নাই। যাহাতে যে পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, সে বাহ্যজগতকে সেই পরিমাণে সুন্দর দেখে; বাহ্যজগতে সেই পরিমাণে অনুরক্ত হয়। প্রাচীন দার্শনিক-গণের ব্যবহৃত একটি উপমা প্রয়োগ করিলে বলা যাইতে পারে যে, কাচ যেমন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, কিন্তু জবাফুল তাহার সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে আপন আভায় আভাযুক্ত করে; সেইরূপ বাহ্যজগৎ সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে স্বভাবতঃ বর্ণহীন ও রূপবর্জ্জিত; অনুরাগীর চোখে তাহা বিবিধ বর্ণ ও বিচিত্র রূপ প্রকাশ করে। সংসারে সম্পূর্ণ বিরাগী কেহ আছে কি না, জানি না; তবে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ও দর্শন শাস্ত্রে সেরূপ বিরাগীর উল্লেখ দেখা যায়। যদি সেরূপ বিরাগী কেহ থাকেন, তবে তাঁহার চক্ষে সুন্দরও কিছু নাই, ও কুৎসিতও কিছু নাই। আমাদের মত সাধারণ মনুষ্য সে পর্য্যায়ভুক্ত নহে; আমরা সদাসর্ব্বদা কোন না কোন রঙের চশমা পরিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ বিশাল জগতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি; এবং যখন চশমাখানি যে রঙের থাকে, বাহ্য জগৎটাকেও যেন সেই রঙ্গে রঞ্জিত হইতে দেখি। আমাদের অবস্থা সুখের হইতে পারে, অথবা দুঃখের হইতে পারে, সে কথা স্বতন্ত্র; যেটা প্রকৃত ঘটনা ও প্রকৃত অবস্থা তাহারই নির্দ্দেশ করিলাম মাত্র। সেই জন্য আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অনুরাগের প্রভাবে জগতের কতকটা সুন্দর দেখিয়া থাকি ও কতকটা কুৎসিত দেখিতে পাই। বাহ্য-জগতটা সম্পূর্ণ আমারই

আত্মগত বটে কি না, সে বিষয়ে বিচার উপস্থিত করা এ প্রবন্ধে বাঞ্ছনীয় নহে; তবে এই অনুরাগটা সম্পূর্ণভাবে আমারই নিজস্ব, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। এবং এই অনুরাগের বশে আমি যে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করি বা যে বিরূপতা দেখি, সেই সৌন্দর্য্য ও বিরূপতা যে, এই হিসাবে আমারই নিজের সৃষ্টি, তাহাও বলা যাইতে পারে।

সুতরাং এই ব্যক্তিগত অনুরাগের মাত্রা অনুসারে জগতে সৌন্দর্য্যের তারতম্য হয়—উহার মাত্রা বাড়ে ও কমে। যাহাদের অভ্যন্তরে অনুরাগের মাত্রা কম, সে সর্ব্বত্র সুন্দর পদার্থ দেখিতে পায় না; হয়ত কুৎসিত পদার্থই দেখে অথবা সকল দ্রব্যই বর্ণহীন অরঞ্জিত অবস্থায় দেখে। আর যাহার ভিতরে অনুরাগের মাত্রা অধিক, সে অন্যের নিকট রূপহীন বা কুৎসিত হলেও সৌন্দর্য্যের ও রূপের বিকাশ দেখিতে পায়। অর্থাৎ কি না, সে ব্যক্তি নিজের ব্যবহারের জন্য, নিজের তৃপ্তির জন্য জগতে সৌন্দর্য্যের ও রূপের সৃষ্টি করে। এই হেতু অনুরাগী ব্যক্তি কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের সংগ্রহকারী নহেন; তিনি সৌন্দর্য্যের বিধাতা ও নির্ম্মাতা। আমরা দেখি মধুকর জাতি মধুর অন্বেষণ ও সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন, মধুকর জাতীয় পতঙ্গ কর্ত্তৃকই ফুলে মধুর সৃষ্টি হইয়াছে। কতকটা সেইরূপে মধুকরোপম অনুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায় জগতে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

কালিদাস এই শ্রেণীর অনুরক্ত পুরুষ ছিলেন, এবং বোধ করি মনুষ্য জাতি মধ্যে এত বড় অনুরক্ত পুরুষ আর জন্মায় নাই। অপর সাধারণে যেখানে সৌন্দর্য্য দেখে না কালিদাস সেখানে সৌন্দর্য্য দেখিতেন; অপরের নিকট যাহা সাদা, কালো অথবা বর্ণহীন, তাঁহার নিকট তাহা রূপবান্ ও রঞ্জিত। এমন করিয়া যেথায়-সেথায় সৌন্দর্য্য উৎপাদন করিতে, জগৎ যুড়িয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। কালিদাস

আপন জগৎ সৌন্দর্য্য দেখিতেন, ও অপরকে তাহা দেখাইতেন। তিনি মনুষ্যের অপরূপ চশমা খানি তৈয়ার করিয়া অন্যের চোখে তাহা দিতেন; আর যেন কোন অপূর্ব্ব কুহক অথবা যাদুবিদ্যার ভাবে সংসারের চিত্রপট খানা অভিনব আকার ধারণ করিত। তিনি যেখানে চাহিতেন, তখনই তাহা আপনা হইতে সুন্দর হইয়া যাইত। তিনি চাহিবার পূর্ব্বে সেখানে অন্যে রূপের আবির্ভাব দেখিতে পাইত না। অশোক তরু না কি পুষ্পোদ্গমের জন্য সুন্দরীর নূপুরধ্বনিত চরণাঘাতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে; সেইরূপ নীরস কর্কশ রূপহীন জগৎ সৌন্দর্য্য-পুষ্পের উদ্গমের জন্য কালিদাসের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। এমন করিয়া যেখানে-সেখানে রূপের উৎপত্তি করিতে আর কেহ পারে নাই। মদ-স্রাবী হাতীর মন্থরগতিতে, অথবা বৃষভের খুরাস্ফালনে, অথবা হিমগিরি গহ্বর প্রান্তস্থ কীচকের দূরাগত ধ্বনিতে অন্যে যে পুলক পায় না, কালিদাস তাহা পাইতেন। সায়ংকালে বল্কলপরিহিতা বনসুন্দরীগণ আলবালে জলসেচন আরম্ভ করিলে কেমন সুন্দর দেখায়, সুন্দরীর বদনকমলে কমল-ভ্রমে মধুকর আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে তাহাকে নীলাকমলাক্ষকে তাড়নার জন্য মৃণালবাহু সঞ্চালিত করিলে কেমন দেখায়, এবং চন্দ্রকর-ধৌত শুভ্র স্ফটিক প্রান্তরে দিব্যকুমারীগণ মুক্ত ছড়াইয়া ক্রীড়মানা হইলে কিরূপ সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা আমরা তাঁহার প্রসাদে কতকটা অনুভব করিতে পারি; তবে তাঁহারই মত সেই রসের আকণ্ঠ সম্ভোগের ক্ষমতা আমাদের জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। জননী বসুমতি কর্তৃক নীয়মানা সীতা, অথবা হেম যজ্ঞোপবীতধারী মুক্তাক্ষমালালঙ্কৃত তেজঃসমষ্টিরূপ সপ্তর্ষির সহচারিণী অরুন্ধতী, যখন ভর্তৃচরণে নয়নদ্বয় নিহত করিয়া অবস্থিতা ছিলেন তখন কিরূপ মহিমার প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ইতর মানবে কখন পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই সকল কারণে বলা যাইতে পারে, যদি সৌন্দর্য প্রবন্ধে বাঞ্ছনীয় ...য়ে সন্দেহের প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কালিদাস মানুষের ম... নিরীক্ষণ জগৎকে যদি সুন্দর দেখিতে চাও, তাঁহার নিকট যাও। আকাঙ্ক্ষ...বে হইবে। তত্ত্ব কথার অন্বেষণে যাইবার প্রয়োজন নাই।

কবি শব্দের বিবিধ সংজ্ঞা এ পর্যান্ত প্রদত্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে কোন্‌টি যে গ্রহণীয় তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না। কেহ বলেন স্বভাবকে যিনি সুন্দর করিয়া তুলেন, সুন্দর করিয়া দেখেন ও সুন্দর করিয়া দেখান তিনি কবি। কালিদাস এই সংজ্ঞানুসারে মহাকবি। কিন্তু অপরবিধ সংজ্ঞাও বর্ত্তমান আছে। কাহারও মতে যিনি জগতের একখানা যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট আঁকিয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। অর্থাৎ জগতে সুন্দর ও কুৎসিত, কোমল ও কঠোর দুইটা ভাল স্বভাবতঃই বর্ত্তমান আছে; তখন সেই দুইটাকে পাশাপাশি আনিয়া কোনটারই উপর নিজে হইতে না ফলাইয়া, তাহাদের যথার্থ আপেক্ষিক পরিমাণের ইতরবিশেষ না করিয়া, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দেওয়াই প্রকৃত কবির কাজ। আজকাল কাব্য সমালোচনায় এই স্বাভাবিকতার, ইংরাজিতে যাহাকে realism বলে ইহারই কতকটা প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা realistic কাব্যের প্রিয় তাঁহারা অতিরঞ্জিত ভালবাসেন না; কবির কল্পনা ও সৃষ্টি দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে চাহেন না। সংসারটা যেমন ভালয় মন্দয় চলিতেছে, সেইরূপ উহাকে ভালয় মন্দয় চিত্রিত দেখিতে তাঁহারা প্রয়াসী। উপরে জগতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহাতে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে এই শেষোক্ত মতটার কোনরূপ ভিত্তি পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। যখন জগৎকে সকলে আপন মনের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দেখে; বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট জগতের রূপ বিভিন্ন; তখন জগতের স্বাভাবিক মূর্ত্তি কিরূপ, তাহা ঠাহর পাই না। যখন মনুষ্যমাত্রেই আপন

আপন জগৎকে আপনি কল্পিত সৃষ্ট করিয়া লইয়াছে, তখন এমন একটা মনুষ্যের কল্পনা নিরপেক্ষ জগৎ কোথায় আছে, যে তাহার মূর্ত্তিটা আসল রঙে চিত্রিত করিয়া সাধারণের দর্শনার্থে উপস্থিত করিতে হইবে?

সুতরাং কবিকে আপনার কল্পনার আশ্রয় লইতেই হইবে। অর্থাৎ তিনি তাঁহার জগৎকে যেমন নিজে দেখেন, তেমনি ভাবে আঁকিয়া অপরের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে। আমাদের তাহাতে লাভ এই যে, আমরা আমাদের জগতে যেটুকু আপন চেষ্টায় দেখিতে পাইতেছিলাম না, তিনি তাহা দেখাইয়া দেন; আমরা যাহা যে ভাবে দেখিতেছিলাম, তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্য ভাবে ও নিজের মত করিয়া দেখান। অর্থাৎ কবি অনেক স্থলে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেন; কুত্রাপি আমাদের চোখের উপর যদি কোন ময়লার আবরণ জমিয়া থাকে তাহা মুছাইয়া দেন, কুত্রাপি বা চোখের উপর একখানা চশমা বা দূরবীণ এইরূপ একটা কিছু যন্ত্র ধরিয়া দেন। এই হিসাবে কবি এক রকম ডাক্তার। মানুষের মধ্যে অনেকে রঙ কানা আছে, শুনা যায়; কিন্তু এই ব্যাধির চিকিৎসা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু কবি এই ব্যাধির প্রকৃত চিকিৎসক। যাহার রঙ দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তিনি তাহাকে রঙ দেখিবার সামর্থ্য দিয়া অনুগৃহীত করেন।

তবে কবিমাত্রেরই কল্পনা যে জগৎকে একই বর্ণে রঞ্জিত করিবে এমন কি কথা। জগৎকে যে সুন্দরই দেখিতে হইবে, এমন কোন আইন বিধাতা প্রণয়ন করেন নাই এবং কোন ব্যক্তি জগতের কোন অংশকে সুন্দর না দেখিয়া অন্য কোন মূর্ত্তিতে নিরীক্ষণ করে বলিয়া যে তাহাকে মনুষ্যত্বের পদবীতে নিম্নতর সোপানে বসাইতে হইবে এইরূপও বলা যায় না।

বাহ্য জড়জগতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বটে, যেহেতু

উহার সহিত আমাদের নিত্য আদান প্রদান চলিতেছে; আমাদের আত্মা প্রতিনিয়ত উহার সহিত কখন বিরোধ, কখন বা মৈত্রী স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ রাজনীতি শাস্ত্রের বিধানমতে সামদানাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ই অবলম্বন করিয়া, আপনার স্থিতি পুষ্টি ও অভিব্যক্তি সাধন করিয়া লইতেছে। কিন্তু জড়ভাগ ভিন্ন সমগ্র জগতের আর একটা অংশ আছে, যাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। আমি যে আত্মা নামধেয় পদার্থ টুকু লইয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কোন কারণে আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশীতেও তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমারই আত্মার সমান ধর্ম্ম-বিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকেও ঠিক্ আমারই সমান মনুষ্যপদবীতে স্থান দিই। এবং আমার এই আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী লইয়া অংশতঃ জড়ধর্ম্মী, অংশতঃ জীবধর্ম্মী ও অংশতঃ মনুষ্যধর্ম্মী—যে একটা সমষ্টির সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিমাণে নিকট করিয়া তুলিয়াছি। বরং অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া দুই দশ দিন কাটাইতে পারি, কিন্তু আমার প্রতিবেশীকে ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্ত যাপন করা আমার পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য।

কিন্তু এই সম্বন্ধটা কিরূপ? প্রকৃত কথা যে, এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে আমার নিজের অস্তিত্বও বুঝি থাকে না। যেখানে অন্নজল, ফলফুল, গিরি ও নির্ঝর যথেষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান আছে; যেখানে মলয় বহে ও পাখী গায়, এমন কি এলা লতাও চন্দনতরুকে আলিঙ্গন করিয়া রহে ও পুষ্পস্তবকাব নম্রা লতা পবনহিল্লোলে সঞ্চারিণী হয়; সেই স্থানেও আমার সঙ্গিহীন ও প্রতিবেশীহীন জীবন কল্পনায় আনিতে গেলে শরীর বিভীষিকায় রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমার সঙ্গীর সহিত ও প্রতিবেশীর সহিত সম্বন্ধ বড় নিকট। স্নেহ, প্রেম, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি যাহা কিছু আমাতে মধুর ও যাহা কিছু আমার আত্মার উপজীব্য সমস্তই

সেই সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত; কিন্তু ইহাও কি প্রকৃত নহে যে, হিংসা ও দ্বেষ ও দম্ভ প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু আমার আত্মাকে ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ, পীড়িত ও জর্জ্জরিত করে, তাহারও উৎপত্তি সেইখানে? ইহাও কি সত্য নহে, যে, সেই সম্বন্ধবশেই আমার শ্রবণ পূর্ণ করিয়া সেই অন্তর্ভেদী তীব্র দুঃখের কোলাহল উঠিতেছে, আমার জ্ঞানজীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই যাহার আরম্ভ ও শেষ মুহূর্ত্তেই যাহার সমাপ্তি।

হায়, মনুষ্যজাতির মধ্যে এমন সৌভাগ্যশালী কয়জন আছেন, যাঁহাকে সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এই দুঃখের আবর্ত্তে পড়িতে হয় নাই! তাঁহার সৌভাগ্যশালী প্রতিবেশী যে সুন্দর জগতের ও সুন্দরী প্রকৃতির রূপরাশি দেখিয়া বিমুগ্ধ রহিয়াছেন, সেই প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর ও নির্মম ও ভীষণ দেখিয়া তিনি আতঙ্কে বিমূঢ় হয়েন নাই।

বস্তুত জগতের এই অংশে উপস্থিত হইয়া উহাকে সুন্দর বলিব কি ভীষণ বলিব সহসা স্থির করা দায় হয়। এবং কবিও তাহার যখন যে মূর্ত্তির অনুভব করেন, তখন সেই মূর্ত্তি দেখাইতে বাধ্য হন।

সচরাচর এইটা দেখা যায় যে, কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী, তাই তাহারা এক রকম স্বচ্ছন্দে আপনার অস্তিত্বটাকে বজায় রাখিয়া ও আপনার আত্মার পুষ্টিসাধন করিয়া চলিয়া গেল। অপর কতকগুলি লোক সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত; তাহারা সংসারের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া পাক খাইতে খাইতে ম্রিয়মাণ হইয়া মর্দ্দিত হইতে থাকিল। মোটের উপর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লইয়া কথা; কেন যে ইহার অবস্থা উহার অবস্থা হইতে ভিন্ন হইল, তাহার যুক্তি দেখান এক রকম অসাধ্য। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লইয়া কথা; কেন না সর্ব্বদাই দেখা যায় যেখানে নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি অবহেলে হাসিয়া খেলিয়া পার হইল, সেখানে যাহার বাহুতে বল আছে ও অন্তরে সাহস আছে সেও অকস্মাৎ স্খলিতপদ

হইয়া দলিত ও পিষ্ট হইতে থাকিল। অবশ্য মনুষ্যের সহজ যুক্তিপ্রিয়তা ও কারণানুসন্ধানপরতা উভয় স্থলেই একটা থিওরি আবিষ্কার করিয়া বসিবে সন্দেহ নাই। যেখানেই "ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়" এই সংক্ষিপ্ত অথচ রুচিকর নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়, সেইখানেই মানুষে আপনার মনের ভিতর হইতে মনের তৃপ্তিকর একটা থিওরির আবিষ্কার করিতে বসে। কেহ বলে কর্ম্মফল, কেহ বলে অদৃষ্ট, কেহ বলে জন্মান্তর সেই সনাতন নিয়মের ব্যভিচারের কারণ। বলা বাহুল্য মনুষ্যের আবিষ্কৃত অনেক থিওরি কেবল অজ্ঞানেরই নামান্তর। অথবা অজ্ঞতা প্রচ্ছাদনেরই কৌশল।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু গোপন করিবার উপায় নাই। অধার্ম্মিকে জয়ের ঢক্কা নিনাদিত করিয়া অকুতোভয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে, আর ধার্ম্মিকে মুমূর্ষু হইয়া গুহার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, ইহাও যেমন অনেক সময়ে সত্য কথা; দুর্ব্বলে যেখানে উত্তীর্ণ হয়, সমর্থ সেখানে পতিত হয়, ইহাও সংসারের সেইরূপ একটা লোমহর্ষণ সত্য। এই সত্য তোমাদের প্রিয় ও রুচিকর না হইতে পারে, তোমাদের রুচির সহিত মিলাইবার জন্য ইহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার হয়ত চেষ্টা করিতে পার, অথবা কোন রুচিকর থিওরির দ্বারা ইহার সমর্থনের প্রয়াস পাইতে পার, কিন্তু ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিও না!

কথাটা সম্পূর্ণ প্রকৃত, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের যুক্তির ও থিওরির অভ্রান্ততা বিষয়ে এমনি সংশয়হীন যে প্রত্যেকেই এক একটা নৈতিক তুলাদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক বলশালিতার পরিমাণ করিতে বসি। এবং নিক্তিটা অমুক দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে দেখিবামাত্র অমুক লোকটা এই মাত্রায় পাপিষ্ঠ ও অমুক লোকটা এই পরিমাণে পুণ্যবান্ দ্বিধাহীনচিত্তে ও নিঃসঙ্কোচে রায় প্রকাশ করিয়া থাকি।

আমরা মনেও ভাবি না যে, আমরা যে তুলাদণ্ড হাতে লইয়া ওজন করিতে বসিয়াছি, সে তুলাদণ্ডের গঠনে এখনই একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি রহিয়াছে, যাহা স্থিতিবিজ্ঞানের একান্ত বিরোধী। অথবা যে দুইটা দ্রব্যের ওজনের তুলনা করিতেছি, ভ্রান্তিবশে তাহার একটাকে জলের ভিতর মগ্ন করিয়া রাখিয়াছি, ও আর একটা হাওয়ায় রাখিয়া দিয়াছি। অথবা হয়ত কোন্ দিক্ হইতে আমার অজ্ঞাতসারে বায়ু প্রবাহ আসিয়া নিক্তির একটা পাল্লাকে উত্তোলিত করিয়া দিতেছে। এইরূপ বিচার প্রণালী দ্বারা মনুষ্যের পুরস্কার বিধান ও দণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া দেখিয়া দুঃখও হয়, হাসিও পায়।

ফলে অমুক ব্যক্তি মেরুদণ্ড নমিত করিয়া যাইতেছে দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিও না যে, উহার আভ্যন্তরিক আত্মগত পাপের বোঝা উহার ভারকেন্দ্রকে নামাইয়া দিয়াছে, এবং অমুক ব্যক্তি লঘুপদক্ষেপে উড়িয়া উড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া স্থির করিও না যে, পুণ্যাত্মতার হাইড্রোজেন বাষ্প উহার দেহরূপ বেলুনখানি স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। মনে রাখিও মনুষ্যের ভাগ্য নামক একটা অনির্দ্দেশ্য অনিরূপ্য কিছু আছে, প্রাক্তন বা অদৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে যাহার সম্বন্ধে জ্ঞানের মাত্রা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, সেই পদার্থটা হয়ত অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ তুল্য বিভ্রাটের জন্য দায়ী।

এই প্রবন্ধের আরম্ভে যে তত্ত্ব কথাটার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে একটু পরিস্ফুট হইয়া থাকিবে। সাহিত্যের মহাকবিগণ মধ্যে যাঁহারা নৈতিক জগতের এই অংশটা লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা এই তত্ত্ব কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলেন। নীতি-প্রচারক ও শাস্ত্রকার ও সমাজ-বিধাতার দলে যে কথাটা গোপন করিয়া মনুষ্য-সমাজের চোখে ধূলিবৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন, মহাকবিগণ সেই কথাটাই খুলিয়া বলেন

এবং সত্যবাদিতা যদি প্রশংসনীয় হয় তবে সেই প্রশংসা এই শ্রেণীর সমালোচকবিগণের প্রাপ্য।

কথাটা এই, যে ব্যক্তি আপনার ভাগ্যদোষে নিগৃহীত ও লজ্জিত ও মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবী হইতে অবনমিত হইয়াছে, তাহার উপর আবার সমালোচনার তীব্রবাণ নিক্ষেপ কতকটা হৃদয়-হীনতার কাজ। তাহার নিজের দুর্ব্বলতা বা নিজের হীনতা তাহার এই অবনতির জন্য একেবারে দায়ী নহে তাহা বলিতেছি না, তবে কিনা উপরে ভাগ্য বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ করা গিয়াছে; সেই ভাগ্যের উপর তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। সে আপন ভাগ্যের বিধাতা আপনি নহে, অথবা কতক পরিমাণে হইলেও সম্পূর্ণ পরিমাণে নহে। জগতের কোন বিধানকর্ত্তা স্বাভাবিক ক্রূরতার বশে নিরীহ জীবকে লইয়া খেলা করিতেছেন ও আমোদ দেখিতেছেন, ঐরূপ মীমাংসারও এস্থলে অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। তাহার সেই ভাগ্যের বিধাতা কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে; হয়ত তাহার পিতামাতা, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ, তাহার প্রতিবেশীবর্গ অথবা তাহার পরিবেষ্টনকারী সমগ্র জগৎ তাহার ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাহার প্রধান দোষ এই যে, তাহার শরীরে এমন বল নাই যে, সে এই বাহির হইতে আপতিত প্রচণ্ড শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। অথবা পিচ্ছিল পথে চলিতে যেরূপ সাবধানতা আবশ্যক সে হয়ত ততদূর সাবধান হয় নাই। সে হয়ত জানিত না যে, পিছন হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে একটা অপরিচিত ধাক্কা আসিয়া তাহাকে ভূমিশায়ী করিবে। এরূপ স্থলে তাহার অধঃপতনের ফলভাগী অবশ্য সে নিজে; প্রকৃতির নিয়মই এই এবং প্রকৃতির বিচারই এই। তাহাতে হা হুতাশ করিয়া কোন ফল নাই। তোমরা কিন্তু তাহার অধঃপতনে কৌতুক করিও না। কেন না, তোমরাও মনুষ্য, এবং কে বলিতে

পারে যে, তোমার অবস্থাও এক দিন উহারই মত শোচনীয় হইতে পারিবে না।

দুঃখাতপদগ্ধ সংসারক্ষেত্রে সমালোচনা অপেক্ষা সহানুভূতি ও সহৃদয়তার অভাব অধিকতর অনুভূত হয়। দৈবযোগে কোন বৎসর বৃষ্টি না হইলে কৃষকে জলাশয় সেচিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা রক্ষার চেষ্টা করে। প্রকৃতি যেখানে নিষ্করুণা ও সংসার যেখানে উষর মরুভূমি, সেখানে মানুষে কি আপনার হৃদয় হইতে স্নেহের বারি ও শান্তির বারি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বর্ষণ করিতে পারে না?

আমরা যাহাদিগকে মহাপাপী নামে নির্দ্দেশ করিয়া ঘৃণার সহিত তাহাদের সঙ্গ পরিহার করিয়া যাই, তাহারা যে প্রকৃতপক্ষেই তোমা আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। হয়ত তাহাদের ভিতরে যে পরিমাণে মনুষ্যত্ব বর্ত্তমান আছে, তাহা তোমাকে আমাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেও মিলিবে না। তাহারা অদৃষ্ট দোষে ঘটনার চক্রাবর্ত্তে পড়িয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নে ও নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে ক্রমেই পতিত হইয়াছে; আর আমরা সৌভাগ্যক্রমে সোজা দাঁড়াইয়া ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া চলিতেছি। উভয়ের অবস্থাগত বিভেদের স্থলে মোটামুটি সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এই দুটি বিদ্যমান আছে। ঠিক তাহাদেরই মত ঘটনাচক্রে পড়িলে আমাদেরই অবস্থা কি হইত তাহা সহসা বলা চলে না। নিজের সৌভাগ্যের জন্য অহঙ্কার করিও না, অথবা অপরের দুর্ভাগ্য দেখিয়া পরিহাস করিও না। এবং তাহার জন্য কুম্ভীপাকের ব্যবস্থা হইয়াছে ও নিজের জন্য নন্দন কানন প্রবেশের টিকিট খরিদ করা আছে, ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। বরং তাহার অবস্থাদৃষ্টে সাবধানতা শিক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী হও।

মাতৃগর্ভ হইতে ম্যাক্‌বেথ অসময়েও কতকটা অস্বাভাবিকরূপে ভূমিষ্ট

হইয়াছিলেন কথিত আছে। কিন্তু ঠিক্ যে একটা সয়তান বা পিশাচের অবতাররূপেই ভূমিষ্ঠ হয়েন, তাহার সম্যক্ প্রমাণ নাই। পিশাচের অবতার ধরাতলে অবতীর্ণ না হয় এমন নহে, এবং শিবারাব ও উল্কাবৃষ্টি সকল সময়ে সকল পিশাচাবতারের অবতরণ ব্যাপার সূচনা করে না। ম্যাক্‌বেথের সহিত যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে সে নিতান্ত মন্দলোক ছিল এমন নহে। অন্ততঃ তোমার আমার অপেক্ষা যে মন্দলোক ছিল তাহার প্রমাণাভাব। অন্তরের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে, নিজের ও অপরের চক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে, কোন না কোন স্থানে একটু দুর্ব্বলতা অবস্থিত ছিল বটে, এবং সেই দুর্ব্বলতাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল স্বীকার করি, কিন্তু সমগ্র মজ্জা ও সমগ্র ধাতু ব্যাপিয়া এমন কিছু ছিল না, যাহাতে তাহাকে মনুষ্যশ্রেণীতে না ফেলিয়া উপদেবতা শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। আকিলীসেরও নাকি গুল্‌ফের কাছে কোথায় একটু দুর্ব্বল স্থান ছিল, যেখানে পারিস নিক্ষিপ্ত শর প্রবেশলাভ করিয়া প্রাণত্যাগের কারণ হয়। এইরূপ ছিদ্র বা রন্ধ্র সুদৃঢ়তম দুর্গপ্রাকার অনুসন্ধান করিলেও মিলিয়া থাকে। সুতরাং ম্যাক্‌বেথ সাধারণ মনুষ্যশ্রেণীর বাহিরে ছিলেন না। অথচ এই সামান্য রন্ধ্রপথে পাপ প্রবেশ করিয়া বেচারার কি পরিণাম ঘটাইল। নিষধরাজ নলের শরীরে প্রবেশের জন্য কোন দেবতা নাকি বহুকাল ধরিয়া রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন; তারপর একদিন ঘটনাক্রমে লব্ধমার্গ হইয়া মহান অনর্থপাত উপস্থিত করেন ও নিরীহ রাজা মহাশয়ের দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলেন। ম্যাক্‌বেথেরও অবস্থা সেইরূপ। ম্যাক্‌বেথের মনে কোথায় একটু ছিদ্র ছিল, কেহ এতদিন দেখিতে পায় নাই, তিনি স্বয়ং তাহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। কিন্তু দুরন্ত দেবতা তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে যেন পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া বহু আয়াসে সেই ছিদ্রটি খুঁজিয়া লইল।

গুরুগম্ভীরভাবে ম্যাক্‌বেথের সমালোচনায় অথবা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইবার আমার অভিরুচি নাই। সমালোচনা ও বিশ্লেষণের অসদ্ভাবের জন্য ম্যাক্‌বেথ স্রষ্টা মহাকবির প্রেতাত্মাকে কখন নিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে না। আমার এই প্রস্তাব অবতারণার উদ্দেশ্য এই পর্য্যন্ত যে, মহাকবি এই স্থলে একটা সংসারের সত্য কথা নির্ভীকচিত্তে বলিয়া ফেলিয়াছেন। নীতিকার ও শাস্ত্রকার যে কথাটা স্পষ্ট বলিতে সাহস করেন না, বা অন্যে বলিলে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখান, মহাকবি সেই কথা অকুতোভয়ে বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই অর্থে মহাকবির স্থান নীতিকার ও শাস্ত্রকারের উপরে। সাধারণ মনুষ্যেও তাহা স্বীকার করে; বিশেষ ওকালতির দরকার করে না।

পদার্থ-বিদ্যার অন্তর্গত গতি বিজ্ঞানে একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, সময় মত থাকিয়া থাকিয়া একটু একটু ধাক্কা দিলে হিমাচলের মত প্রকাণ্ড পদার্থটাকেও কাঁপাইতে বা ধরাশায়ী করা যাইতে পারে। কৈলাশ-পর্ব্বত তুলিবার জন্য রাবণের এবং গন্ধমাদন উত্তোলনের জন্য হনুমানের মত মহাবীরের দরকার হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থ-বিদ্যার পেণ্ডুলাম্‌তত্ত্ব অবগত থাকিলে পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালকেও এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটা সহজেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিত। মনস্তত্ত্ববিদের ভ্রূকুটীভয় সত্ত্বেও আমি মনুষ্যের চিত্তটাকে একটা সুবৃহৎ মস্কোনগরের ঘণ্টার মত পদার্থ বলিতে চাহি। অর্থাৎ অনেক সময়ে বাহ্যশক্তি প্রভূত পরিমাণে বল প্রয়োগ করিয়াও মানুষের অন্তঃকরণকে স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে না; আবার অতি মৃদু পবন-হিল্লোল যদি সময় মত আসিয়া আস্তে আস্তে ছোট ছোট ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে ঘণ্টাটা বেগে আন্দোলিত হইয়া দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিতে পারে। কোন কোন মহাকায় অর্ণবযান বড় বড় ঝটিকার বেগ অতিক্রম করিয়া সামান্য হাওয়ায় জলমগ্ন হয়। আবার উত্তাল

তরঙ্গমালার উপর সের কতক কেরোসীন ঢালিয়াও তাহাদের ক্ষোভ প্রশমিত হইতে দেখা যায়। মানুষের মনও কতকটা সেইরূপ। যখন টলে না, তখন টলে না, আবার সময়ে অসময়ে অতি সামান্য কারণ উপরি উপরি ঘটিতে থাকিলে সাম্যাবস্থাচ্যুত হইয়া কোথায় পড়ে কে জানে।

ম্যাক্‌বেথ যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীরদর্পে ও রাজপ্রসাদাশয়ে স্ফীত হইয়া ফিরিতেছিলেন, ঠিক্ এমনি সময়ে তাঁহার মনের ছিদ্রটা একটু এমনি অসতর্কভাবে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল, যে শয়তানের অনুচরীগুলা ঠিক সময় বুঝিয়া একটা কুয়াশা ও দুর্দ্দিনের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির মুখখানা আঁধার করিয়া ফেলিল। এবং সেই আঁধারের সময় সুযোগ বুঝিয়া দুই চারিটা প্ররোচনা দ্বারা ছিদ্র-পথটা আর একটু প্রসারিত করিয়া দিল। ঠিক্ তদবধি ঘটনার পর ঘটনার ধাক্কা সময় মত আসিয়া বেচারির চিত্তকে একেবারে ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত করিয়া দিল। শেষের আন্দোলনটার বেগ এতখানি বাড়িয়া গেল যে, বেচারি আর ফিরিয়া স্বস্থানে আসিতে পারিল না; একেবারে উল্টাইয়া পড়িল। তখন আর আশা নাই। হিমাচলের প্রস্থদেশে গভীর ফাটগুলা হাঁ করিয়া থাকে; উপরে পর্য্যটকের একবার পদস্খলন হইলে আর নিস্তার থাকে না। সেইরূপ একবার যখন পদস্খলন হইল, তখন অধোগতি রোধ করে কাহার সাধ্য? শয়তানের অনুচরেরা মানুষকে সর্ব্বদাই ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় আছে; কিন্তু হায়, শয়তান যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই ঠাকুরটি তখন নিজের অনুচর প্রেরণ করিয়া হতভাগ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ করেন না।

ঠিক্ এই হিসাবে আমাদের কৃষ্ণকান্তের উইল ম্যাক্‌বেথের সহিত তুলনীয়। শেষ অধ্যায়ে কৃষ্ণকান্তের উইলের নায়ককে আমরা পাপের মূর্ত্তিমান্ অবতার স্বরূপে দেখিতে পাই। এমন কি, আমাদের অর্থাৎ সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ব্যক্তি খুবই অল্প আছেন, যিনি

নিঃসঙ্কোচে ও নির্ঘৃণ্যভাবে তদবস্থ গোবিন্দলালের সঙ্গে দাঁড়াইয়া দুটী মিষ্ট কথা কহিতে সাহস করিতে পারেন। যদি গোবিন্দলালের সঙ্গে কলিকাতার রাস্তায় ঘটনাক্রমে আমাদের চোখোচোখি হয়, তৎক্ষণাৎ আমরা ঘৃণায় চোখ ফিরাইয়া চলিয়া যাই। হয়ত পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন গোবিন্দলালের বৈঠকখানায় প্রত্যহ বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হইয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাস পিটিয়া আসিতাম, এবং বুড়া কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের সময় লুচি মণ্ডার যথেষ্ট সদ্গতি করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখন দৈবক্রমে দেখা হইলে তাঁহাকে দুইটী কায়িক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেও সংকোচ হয়। কি জানি অপরে পাছে দেখিয়া ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধঃপতনের আরম্ভে গোবিন্দলালে যে পরিমাণ মনুষ্যত্ব ছিল, তোমাতে আমাতে ঠিক্ ততখানি বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। এবং এমন কি প্রমাণ পাইয়াছ যে, তাহার সেই মনুষ্যত্ব একবারে পশুত্ব বা পিশাচত্বে পরিণত হইয়াছে। গোবিন্দলালকে দেবতা বলিয়া পূজা বা অনুকরণ করিতে বলিতেছি না; তবে তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার আমার ভাগ্যেও যে কখন ঘটিতে না পারে এমন বিশ্বাসের কারণ নাই। এবং তাহার অধঃপতনের কারণই বা কি? অনুসন্ধানে দেখা যায় তাহার দয়া, তাহার পরোপকারবৃত্তিই একটা সামান্য ছিদ্রমাত্র, যে ছিদ্রপথে দেবতাবিশেষ অব্যর্থ শর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিয়া বুঝা উচিত, যে সেই দেবতার নিকট শার্দ্দূল-চর্ম্ম ব্যবধানবতী দেবদারুদ্রুম-বেদিকায় উপবিষ্ট সংযমিশ্রেষ্ঠও সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ পান নাই। সুতরাং সুযোগক্রমে প্রেরিত শরের সন্ধানের সহিতই গোবিন্দলালের চিত্তটী সাম্যাবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইল। একটু ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইল। তার পর ঘটনার পর ঘটনা, ধাক্কার পর ধাক্কা, ঠিক্ সময় বুঝিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া ধাক্কা। বারুণীতীরে কুহুডাক, আর উইল চুরি, আর রোহিনীর আত্মহত্যা

চেষ্টা, আর কুন্দবিষাদি ঘটিত ব্যাপার, আর মিথ্যা অপবাদ রটনা, আর ভ্রমরের অভিমান, আর কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল। সাগর বক্ষশায়ী জাহাজ খানি টলিতে টলিতে এতদূর টলিয়াছে যে আর উদ্ধারের আশা নাই।

উদ্ধারের আশা নাই; ম্যাক্‌বেথের জীবনে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছিল তখন আর তাহার উদ্ধারের আশা ছিল না; এবং গোবিন্দলালের জীবনে এমন সময় আসিয়াছিল, যখন তাহার উদ্ধারের আশা ছিল না। বাঁধের ক্ষয় হইতে হইতে এমন সময় আসে যখন আর স্রোতের গতি রোধ করিবার আশা রহে না। কথাটা সত্য, কিন্তু মনুষ্যমাত্রের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সত্য। এই সত্যের সম্মুখে মানুষের হাসিবার বা উল্লাসিত হইবার কোন কারণ নাই। এই ভীষণ সত্য যে মনুষ্যের চোখের উপর অহরহ উপস্থিত রহিয়াছে অথচ মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া তাহা দেখে না, অথবা দেখিয়াও স্বীকার করে না, নিজে প্রবঞ্চিত হয় ও অন্যকে প্রবঞ্চনা করে, এই একটা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। যদিও বকরূপী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার আশ্চর্য্য ঘটনার যে তালিকা দিয়াছিলেন, সেই তালিকায় ইহার উল্লেখ নাই।

ইংরাজদের ম্যাক্‌বেথে ও আমাদের কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সত্য তত্ত্ব কথাটা খুব পরিস্ফুট করিয়া ধরা হইয়াছে। উভয়ে এই বিষয়ে সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য হয়ত পাঠকের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য এত বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নহিলে, প্রবন্ধের কলেবর বাড়ে না।

১৩০২, অগ্রহায়ণ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত ব্রজবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক আলোচনা সমিতিতে পঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ শুনিয়া যে দুচারিটী কথা মনে হইয়াছে, তাহা "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশ যোগ্য বিবেচিত হইলে অনুগৃহীত হইব।

প্রবন্ধের সমালোচনা কালে একটা কথা উঠিয়াছিল, একালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা পূর্ব্বের মত অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে কি না। কথাটা সে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল; কিন্তু ইহার উত্তর বোধ করি দুষ্প্রাপ্য নহে। কোন সামাজিক ব্যবস্থাই চিরকাল সমান ভাবে চলিতে পারে না ও চলেও না। সমাজ যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন সমাজ স্থিতির ব্যবস্থাও পরি-বর্ত্তনশীল হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। বস্তুতই মনুর সময়ের ব্যবস্থা এসময়ে সর্ব্বতোভাবে প্রচলিত নাই। ইংরাজীর প্রভাব সমাজে প্রবেশের পূর্ব্বেই সমাজ আপনা হইতে শাস্ত্রকারদের সম্মতিক্রমে বা নিয়োগক্রমে আপনার ব্যবস্থা আপনিই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। মনুর সময়ে চারিটি মুখ্য বর্ণ ও বোধ করি বহুতর সঙ্কর বর্ণ বিদ্যমান ছিল।

সেই চারিটি মুখ্য বর্ণের মধ্যে এখন কেবল ব্রাহ্মণই বিদ্যমান, "ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের" লোপ হইয়াছে। শূদ্রের নাম আছে, কিন্তু সামাজিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, শূদ্রের এই সামাজিক উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বহুপূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। চারিটি আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থাশ্রমটাই বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থের বিলোপ হইয়াছে। ভিক্ষু আছে কিন্তু সে মনুর ভিক্ষু নহে। সে বোধ করি বৌদ্ধ ভিক্ষুর রূপান্তর।

শুনিতে পাই, সংহিতাকারেরাই কলিকালে ভিক্ষুর আশ্রম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সেটা বোধ হয় ভিক্ষুগণের উৎপাতেরই ফল। ভিক্ষুর আশ্রম অতি কঠিন আশ্রম। ভিক্ষু সমাজের আশ্রয়ে বাস করেন ও সমাজের নিকট আপনার অন্ন বস্ত্র যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আদায় করেন; কিন্তু সমাজ তাঁহার নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিতে পায় না। এইরূপ স্থলে ভিক্ষুর জীবন দায়িত্বহীন, নীতিবর্জ্জিত জীবনে পরিণত হইবার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকে।

কিন্তু সেকালের অর্থাৎ মনুর সময়ের ভিক্ষুকে অত্যন্ত কঠিন এপ্রেন্টিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত।

বার্দ্ধক্যেই প্রব্রজ্যাগ্রহণ বিহিত ছিল। জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিয়া যখন অবসর লইবার সময়, তখনই বৃদ্ধেরা পুত্র পৌত্রাদির স্কন্ধে সংসার ভার সমর্পণ করিয়া ক্লান্ত দেহে জরাজীর্ণ শরীর ও অবসন্ন মন লইয়া সংসারের নিকট ছুটি লইতেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারের উপর আপনার বোঝা সমর্পণ তাঁহারা কতকটা অন্যায় মনে করিতেন; সংসারও তাঁহা-দিগকে আর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত রাখিয়া কষ্ট দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিত।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাঁহারা ছুটি লইতেন; আপনার কৃতকার্য্যের পেন্‌সন্ স্বরূপ যৎকিঞ্চিন্মাত্র অর্থাৎ প্রাণরক্ষার উপায় মাত্র সংসারের নিকট দাবী করিতেন। সংসার তাঁহাদের নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিত না।

কিন্তু এই বন্দোবস্তে ভিক্ষুর আশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে বিষম পরীক্ষা দিতে হইত। এই পরীক্ষা বানপ্রস্থাশ্রম। বনবাসীর জীবন অতি কঠোর জীবন; তাঁহাকে বনে বসিয়া সংসারের জন্য যৎপরোনাস্তি সহিতে হইত। অথচ সংসারের নিকট বিশেষ কিছু পাইতেন না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ভিক্ষুর আসনে অধিকার—ইহাই বোধ করি সাধারণ নিয়ম ছিল।

ভিক্ষুর আশ্রম-প্রবেশে এইরূপ কঠোর নিয়মের বাঁধাবাধি থাকায় নীতি-হীন ও দায়িত্বহীন ভিক্ষুর উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক ছিল, বোধ হয় না। বানপ্রস্থের কঠোর পরীক্ষার পর ভিক্ষুর জীবন-গ্রহণে সকলের সাহসে কুলাইত, তাহা বোধ হয় না। দ্বিজাতিমাত্রই বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষু হইতেন, এইরূপ মনে করিবার সম্যক্ কারণ নাই। দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রগণের অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিক্ষু হইবার অধিকারই ছিল না। কাজেই সমাজে কোনও কালে ভিক্ষুর সংখ্যা যে খুব বাড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।

কিন্তু বেদে নাকি একটা বিধি আছে, বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র যে কেহ যে কোন বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে। যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা দায়—বুদ্ধদেব বা শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্য, কাহাকেও কেহ কোন উপায়ে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে নাই। জোর করিয়া আট্‌কাইয়াও লাভ নাই, কিন্তু আশঙ্কা থাকে ভণ্ড বৈরাগ্যের। কৃত্রিম বৈরাগ্যের আক্রমণ হইতে গৃহস্থাশ্রমকে রক্ষা করিবার জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকার যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গতই মনে হয়।

ফলে বৃদ্ধ বয়সে কঠোর বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, এই সাধারণ নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও, সেকালেও অনেকেই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অকালে প্রব্রজিত হইত, সংশয় নাই; এবং প্রকৃত বৈরাগীর অনুকরণে বৈরাগীর দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব।

বুদ্ধদেবের সময়ে অথবা কিছু পূর্ব্বে এইরূপ অকালবৈরাগীর দল অনেক হইয়াছিল, এবং বৈরাগ্য-আশ্রয়টা একরকম ফ্যাসন হইয়াছিল, মনে এই রকম সন্দেহ হয়।

বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মই জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলেন। এত বড় কর্ম্মী সন্ন্যাসী ভূপৃষ্ঠকে আর কখনও পবিত্র করে নাই।

কিন্তু তিনি শাস্ত্রের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বার অবারিত-ভাবে মুক্ত করিয়া দিলেন, দ্বিজ-শূদ্র নির্ব্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সন্ন্যাসী হইতে থাকিল। পুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর অনুতপ্ত হইয়া বয়সের একটা নিয়ম করিয়াছিলেন; অন্ততঃ পিতামাতার অসম্মতিতে কেহ সংসার ত্যাগ করিবে না, এইরূপ একটা নিয়ম করিয়াছিলেন, এবং স্ত্রীজাতীকে সন্ন্যাস প্রবেশের অনুমতি দিয়াও শেষে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, মৎপ্রচারিত সদ্ধর্ম্মের আয়ুকাল এইবার কমিয়া গেল।

তাঁহার অনুতাপ অনুচিত হয় নাই। কেননা, দেশটা কিছু দিনেই কপট সন্ন্যাসীর দলে ভরিয়া গেল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত, পবিত্র চিত্ত মহাত্মা বসুধা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সত্য বটে, কিন্তু কপট সন্ন্যাসীর উৎপাত হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করিবার সম্যক্ উপায় বুদ্ধদেব কিছুই করিয়া যান নাই। যাহা করিয়াছিলেন তাহা নিষ্ফল হইয়াছিল। ফলে যে সমাজ-বিপ্লব ঘটে, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হয়। স্বেচ্ছাচারী মঠধারী মহান্ত ও ভিক্ষুর উৎপাতে দেশ হইতে সদাচার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

সাধারণ মনুষ্য, পৌরুষ শক্তি অপেক্ষা অপৌরুষেয় শক্তিতে অধিক আস্থাবান্; বুদ্ধদেব অপৌরুষেয় শ্রুতিকে অতিক্রম করিয়া পৌরুষ যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাচীন পরীক্ষিত ঐতিহাসিক আদর্শকে ঠেলিয়া দিয়া নূতন অপরীক্ষিত আদর্শকে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

তাহার ফলেই এই সমাজ-বিপ্লব ও স্বেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব। যদি কাহারও দ্বিধা থাকে, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ইতিহাসটা পড়িয়া দেখিবেন। শঙ্কর-বিজয়গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে মঠধারী মহান্তের ও ভিক্ষুর উপদ্রব রাজশাসন দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে

রাজশাসন এ সকল স্থলে হস্তক্ষেপে সাহস করে না। কিন্তু সমাজ শেষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধনাম দেশের মধ্যে হেয় হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণকেই হিমালয় পারে রাখিয়া আসে নাই; কিন্তু তাঁহারা আর সমাজে স্বনামে পরিচিত হইতে সাহস করে নাই; ভিক্ষুর আশ্রম-গ্রহণ বোধ হয়, এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এই বিপ্লব হইতে সমাজ রক্ষার জন্য শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রুতির ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া সদাচার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই জন্য সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কালে আমরা আচারের বন্ধনের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হই ও স্মৃতিগ্রন্থকারদিগকে গালি দিই।

তাঁহারা ধর্ম্ম-নীতির অপেক্ষা আচার-নীতির অধিক আদর করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ কুবাক্য বলি। আমরা ভুলিয়া যাই, নীতির প্রতিষ্ঠা কোন দেশেই কোন কালেই ব্যবস্থাপকের (Legislator এর) কাজ নহে। আইনের দ্বারা সন্নীতির প্রতিষ্ঠা কোন কালেই হয় না; তবে সদাচারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এবং সদাচার—ইংরাজীতে যাহাকে decency, propriety প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া যায়—তাহা সমাজ-স্থিতির জন্য একান্ত আবশ্যক; এবং তাহার জন্যই রাজ-শাসনের ও শাস্ত্রের শাসনের আবশ্যকতা; নীতি (Morality) প্রতিষ্ঠা পক্ষে, রাজ-শাসনের ও শাস্ত্রের শাসনের কোনই মূল্য নাই। আধুনিক কালে যে সকল নিবন্ধকার ও সংগ্রহকার আচার-বন্ধনে সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই রাজাশ্রয়ে প্রতিপালিত। তাঁহারা স্বয়ং ঋষি ছিলেন না। তবে ঋষিবাক্যের দোহাই দিতেন, ও রাজাকে পরামর্শ দিয়া রাজশাসন নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাজ-বিধিদ্বারা সদাচার প্রতিষ্ঠায় সফল হইয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে একালের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকলের প্রবর্ত্তকগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝেন নাই। এমন কি স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতির সেই প্রাচীন বচনের দোহাই দিয়া বৈরাগ্যের দ্বার অবারিত রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকেরা স্ত্রী-শূদ্রাদিকেও বৈরাগ্য গ্রহণে নিবারণ করেন নাই। ফলে আমরা শাক্ত মঠে ও বৈষ্ণব আখড়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে নাম মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বিরাজিত দেখিতে পাইতেছি। যতি শঙ্করাচার্য্য যে দিন গৃহস্থ-মণ্ডণ মিশ্রকে পরাজয় করিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপর সন্ন্যাসাশ্রমের প্রাধান্য সপ্রমাণ করেন, সেই দিনকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুর্দ্দিন বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।

একালে যে মনুর সময়ের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন না। সে দিন নাই,—হইবেও না। কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়। সেই আদর্শ, কালানুযায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই।

বিপ্লব বোধ করি কেহই চাহেন না। আধুনিক সমাজ সংস্কারকেরাও চাহেন না। পরিবর্ত্তন আবশ্যক ইহা সকলেই স্বীকার করেন, তবে এক পক্ষ যতটা পরিবর্ত্তন চান, অন্য পক্ষ ততটা চান না;—স্থিতিশীল ও উন্নতিশীলে বোধ করি, এই মাত্র প্রভেদ। এই প্রভেদ সর্ব্বত্রই আছে; এদেশেও আছে; থাকাও প্রার্থনীয়।

তবে একালে সমাজ ব্যবস্থায় রাজ-শক্তির সাহায্য পাইবার আশা নাই; পাওয়া প্রার্থনীয়ও নহে। যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন যে পরিবর্ত্তন শাস্ত্রজ্ঞগণের পরামর্শে রাজ-সাহায্যে ও অবাধে সম্পাদিত হইত; একালে তাহা হইবার উপায় নাই। কেননা, রাজ-শক্তি, সমাজ-শক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইহা অস্বাভাবিক; কিন্তু উপায় নাই। ইহার

ফলভোগে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা সমাজের চেষ্টায় ধীরে ধীরেই ঘটিবে। অনেকে শ্রুতির দোহাই দেওয়া, শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া, অনাবশ্যক মনে করেন; আমরা উহা অনাবশ্যক বোধ করি না। সভ্যতম দেশেও—বিলাত বা আমেরিকায়—শ্রুতির দোহাই না দিলে কোন রাজ-ব্যবস্থা টেকে না। সেখানে শ্রুতির নাম Constitution, উহা অপৌরুষেয়; কেননা, উহা অনাদি—উহার মূল কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ও উহা ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠিত নহে। অপৌরুষেয়ের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অঙ্গ দুইটি—প্রথম বর্ণ-ধর্ম্ম—ইহা লইয়া আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয় আশ্রম-ধর্ম্ম—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইহার প্রতিষ্ঠা। সমাজ-জীবনে বর্ণভেদ—ব্যক্তির জীবনে আশ্রম-ভেদ। বৈদিক কালে উভয় ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি ছিল, এখন তাহা নাই। পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। শ্রুতির ভিত্তি বজায় রাখিয়া পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছে। যেখানে শ্রুতির ভিত্তি ঠেলিয়া আকস্মিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই ফল শোচনীয় হইয়াছে—ইতিহাস সাক্ষী। বর্ত্তমান কালেও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ও ঘটিবে; কিন্তু শ্রুতির ভিত্তি ঠেলিয়া ফেলা বাঞ্ছনীয় নহে।

দেখিতে গেলে প্রাচীন কালের চারি আশ্রম, এখন কেবল গৃহস্থাশ্রমেই পরিণতি পাইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ একালে নাই। ভিক্ষু আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একালের ভিক্ষু, সেকালের ভিক্ষুর বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ণধর্ম্ম কিন্তু সমাজের অস্থি মজ্জায় বর্ত্তমান। একালের বর্ণগত প্রভেদ প্রধানত তিনটি;—প্রথম শোণিতগত—অনার্য্য সন্তানেরা হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়া নিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, দ্বিতীয় ব্যবসায়গত—কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, প্রভৃতির বিভেদ ব্যবসায় লইয়া—এই জাতিভেদ

দেশের মধ্যে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা বিস্তারের ও ব্যবসায়গত স্বার্থরক্ষার বর্ত্তমান কালের এক মাত্র উপায় স্বরূপ রহিয়াছে। যত দিন গ্রামে গ্রামে নূতন ধরণের টেক্‌নিক্যাল স্কুল না বসিতেছে ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন সমিতি গঠিত না হইতেছে, ততদিন এই জাতিভেদ এদেশ হইতে উঠিবে না। তৃতীয় দেশগত ভেদ—ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার বিবিধ শ্রেণী এই প্রাদেশিক ভেদ লইয়া; সেইরূপ অন্যান্য জাতির মধ্যেও এই প্রদেশিক ভেদ বর্ত্তমান।

ইংরাজের রাজ্যে, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের দিনে এই ভেদটা কমিয়া যায়; এইরূপ একটা স্পৃহা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে।

ইংরাজীতে যাহাকে Discipline বলে, আমাদের সমাজে বর্ণধর্ম্ম কতকটা সেই ডিসিপ্লিনের কাজ করে, যে দিন উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধের আলোচনা কালে শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'প্রবৃত্তির দমন' ও 'প্রতিভার বিকাশ' এই দুই বিষয়ে কতটা সফল হয়, তাহা দেখিয়া এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থার সার্থকতা বিচার করিতে হইবে। বস্তুতই তাহাই। মোটামোটি বলা যাইতে পারে, ইউরোপের সমাজের বন্দোবস্ত প্রতিভার বিকাশের অনুকূল; আমাদের দেশের সমাজের বন্দোবস্ত প্রবৃত্তির দমনের অনুকূল। ইউরোপে যে কোন ব্যক্তি যে কোন পদবীতে স্থান পাইতে পারে—ইহাই সে দেশের সমাজ তন্ত্রের থিওরি। বিলাতের যে কোন শ্রমজীবি গ্লাড্‌ষ্টোনের আসনে বসিবার আশা করে; ফ্রান্সে বা আমেরিকায় যে কোন ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে,—প্রত্যেকেই যখন এইরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণের অধিকারী, তখন সে দেশের সামাজিক নিয়ম যে, প্রতিভার বিকাশের অনুকূল হইবে; তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই আকাঙ্ক্ষা মিটেনা। ক্ষমতার অভাবে বা সুবিধার অভাবে বা ঘটনার চক্রে নিম্ন শ্রেণীর

অধিকাংশ লোকই চিরজীবন নিম্ন শ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকে, যাহার আকাঙ্ক্ষা মেটে সে হয় খুব প্রতিভাবান বা খুব সৌভাগ্যশালী। সাধারণত প্রতিভা ও সৌভাগ্য, উভয়ই একত্র না হইলে আকাঙ্ক্ষা মেটেনা। ফলে দাঁড়ায় এই, দুই চারিজন ক্ষমতা বলে বা সৌভাগ্য বলে গ্লাড্‌ষ্টোনের পদে উঠে বটে; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকায় একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; ফ্যাক্টরীর ভিতর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে বিলাতের দুর্ভাগা শ্রমজীবী যখন দেখিতে পায়, তাহার দিনান্তে অন্নের সংস্থান হইল না—সে জানে সে গ্লাড্‌ষ্টোনের আসনে বসিবার অধিকারী, অথচ অদ্য রাত্রিটা তাহাকে রাজ পথে ভূমি-শয্যাতেই কাটাইতে হইবে, তখন সে মনের ক্ষোভে বড় লোকের ঘরে ঢেলা ছুড়িয়া অসন্তোষের পরিচয় দেয় ও কেহ কেহ বা সুবিধা পাইলেই রাজ রাজড়ার বুকে গুলি চালায়।

আমাদের দেশের ব্যবস্থা কতকটা অন্যরূপ। চাষার ছেলে ও তাঁতির ছেলে কখন মনেও ভাবে না যে, তাহার রাজতক্তে বা রাজ-দরবারে বসিবার কোনও সম্ভাবনা আছে। সে জানে, সে পৈতৃক জাতিধর্ম্ম ও জাত ব্যবসায় অবলম্বনেই চিরজীবন কায়ক্লেশে কাটাইতে, বিধাতা-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে। তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার লেশ নাই। তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা উচ্চমুখে তাকায় না। তথাপি প্রতিভা এমনই জিনিস যে, ক্বচিৎ কোনও স্থলে দুরন্ত প্রতিভা সমাজের বন্দোবস্ত ঠেলিয়া দিয়া কৃষক পুত্রকে বা তাঁতির পুত্রকে রাজতক্তে বসাইয়াছে; এইরূপ উদাহরণ এদেশের ইতিহাসেও না মেলে, এমন নহে। কিন্তু এইরূপ উদাহরণ সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। সাধারণ নিয়ম মতে প্রত্যেকেই পৈতামহিক পদবীতেই চিরজীবন শান্তির সহিত, সন্তোষের সহিত কাটাইয়া দেয়। এবং বিধাতা যদি নিতান্ত বিরূপ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত

করেন, তখন নিতান্ত সন্তোষের সহিত মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করে,—রাজার বুকে ছুরি বসায় না।

কোন্ ব্যবস্থাটা ভাল, সে কথা নাই বা তুলিলাম। সকল জিনিষেরই ভাল মন্দ দুই দিক্ আছে। পাশ্চাত্য সমাজের ব্যবস্থার এক দিক্ ভাল, অন্য দিক্ মন্দ। আমাদের ব্যবস্থারও এক দিক্ ভাল, অন্য দিক্ মন্দ। তবে না হয় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, ওদের ব্যবস্থা উন্নতির অনুকূল, কিন্তু স্থিতির অনুকূল নহে, পাশ্চাত্য সমাজ জমকাল, কিন্তু হয় ত ভঙ্গপ্রবণ। আমাদের ব্যবস্থা স্থিতির অনুকূল, কিন্তু উন্নতির তেমন অনুকূল নহে।

আমাদের শাস্ত্রে যাহা 'লোক-স্থিতির' সহায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরূপ; কিন্তু এই বিভেদের জন্য কোন সমাজকে গালি দেওয়া সঙ্গত নহে। সমাজ অতি বৃহৎ পদার্থ—ইহা স্তুতি নিন্দার অতীত। নদনদীর গতির মত, জ্যোতিষ্কগণের গতির মত, সমাজের গতিও কাহারও স্তুতি নিন্দার অপেক্ষা না করিয়া আপন পথে চলিয়া যায়। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থার পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। সচরাচর বলা হয়, এদেশের লোকে Dignity of labour—পরিশ্রমের গৌরব বুঝে না। আমার বিশ্বাস ঠিক্ উল্টা। আমাদের বিশ্বাস "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—ইহার অর্থ আমি যে কর্ম্মে প্রেরিত ও নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা গৌরবকর কর্ম্ম আমার পক্ষে আর নাই। কর্ম্ম মাত্রই মহৎ— যদি তাহা যথাযথরূপে সম্পাদিত হয়।

অন্যের চোখে আমার কর্ম্ম নিন্দিত হউক, তাহাতে বড় আসে যায় না;—আমার নিকট আমার কর্ম্ম গৌরবের সামগ্রী—ইহাই যদি আমার জীবনে সম্পাদন করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।

আমার বোধ হয়, এই ভাবটা আমাদের দেশে অতি ইতর লোকের

মধ্যেও বিদ্যমান আছে। তাহাদের মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই; কিন্তু আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই আপন জীবন সার্থক হইবে, এরূপ বোধই এদেশে সাধারণ নিয়ম। চাষার ছেলে চাষার কাজকে হীন কাজ মনে করে না; তাঁতি তাঁতির কাজকে ঘৃণা করে না—বস্তুত গৌরবেরই বিষয় ও শ্লাঘার বিষয়ই মনে করে। সেই কাজ না করিলেই তাহার 'জাতি' যায়—তাহার 'স্বধর্ম্ম' পালিত হয় না। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার 'স্বধর্ম্মে' তাঁহার 'জাতি ব্যবসায়ে' যেরূপ গৌরব বোধ করেন, একজন চাষা তাহার 'স্বধর্ম্মে' তাহার 'জাতি ব্যবসায়ে' তাহার অপেক্ষা কম গৌরব বোধ করে, তাহা মনে হয় না। যে ব্যক্তির ধারণা আছে, আমি রাজ মন্ত্রীত্ব পাইবার অধিকারী, তবে দৈববশত বা অন্যের ষড়যন্ত্রের ফলে আমাকে কারখানায় মজুরি করিতে হইতেছে, তাহার স্বধর্ম্ম পালনে—মজুরি কর্ম্মে—অনুরাগ হইতেই পারে না।

এই ভাবটাকে আমি অতি উন্নত ভাব মনে করি। সে দিন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে মনুষ্য নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনে সমর্থ হয় না। ঠিক্ কথা। বিশ্বরূপ দর্শন সকলের সাধ্য নহে; সেইরূপ সৌভাগ্যশালীর সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে; এবং এতদ্দেশের কৃষক ও শ্রমজীবী এই নিষ্কাম-ধর্ম্মের আদর্শের প্রতি যতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, ততটা আর কোন দেশে হইয়াছে বোধ হয় না।

বস্তুতই আমাদের দেশে প্রত্যেক শ্রমজীবীর জীবনে এই মহান্ আদর্শ প্রতিবিম্বিত দেখি। যখন দেখিতে পাই, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত যাইতেছে, প্রকৃতির যাবতীয় অত্যাচার অকুণ্ঠিত ভাবে সহ্য করিয়া দরিদ্র কৃষক বৎসরের পর বৎসর তাহার ক্ষেতের টুকরাটিতে পরিশ্রম করিতেছে—কোন বার ফল পায়, কোন বার পায় না; কোন দিন উদর পূর্ণ হয়, কোন

দিন হয় না,—কোন দিন রাজ দরবারে বসিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উহাকে উত্তেজিত করিতেছে না,—গ্লাড্‌ষ্টোন্ হইবার সে কোনও স্বপ্ন দেখে না, তাহার অবসাদ দূর করিবার জন্য ও উত্তেজনা বিধানের জন্য চা নাই, মদ নাই, খবরের কাগজ নাই, রাজনীতি বিষয়ক, ধর্ম্মনীতি বিষয়ক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা নাই—অথচ সে খাটে, কিন্তু অবসন্ন হয় না।—সে খাটে কিন্তু নিজের জন্য নহে; আপন বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য, পত্নীর জন্য, পুত্রকন্যার জন্য, হয়ত পিসিমাসী, ভাইভগিনীর জন্য চির জীবন খাটে ও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বিরাম পায়—তখন আবার বোধ হয়, পৃথিবীতে নিষ্কাম ধর্ম্ম-পালনের উদাহরণ, যদি কোথাও থাকে, সে এখানে, এবং ভয়াবহ পরধর্ম্ম অবলম্বন অপেক্ষা এই স্বধর্ম্মে নিধনের কোন-না-কোন স্থানে অধিক মূল্য আছে বলিয়া সংশয় জন্মে। হইতে পারে জীবনের তাহার বহু স্থলে পদস্খলন হইয়াছে, সে লোকের সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিয়াছে, পেটের জ্বালায় কটু কথা ও মিছা কথা কহিয়াছে, রাগের মাথায় কাহারও পিঠে লাঠি বসাইয়াছে, তোমার আমার ও সকলেরই মত সে নানা দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছে; এবং ইহাও নিশ্চয়ই যে তাহার মৃত্যু হইলে সংবাদ পত্রে ঘোষণা হইবে না, কোন স্থানে লোক সভা বসিবে না, কোন স্থলে স্মৃতিস্তম্ভ উঠিবে না; কয়েক বৎসর পরে তাহার নাম পর্য্যন্তও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু তথাপি সার আইজাক নিউটন বা মাইকেল ফ্যারাডে বা উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়রের কৃতকর্ম্মের অপেক্ষা তাহার জীবনের কৃতকর্ম্মের গৌরব কম, তাহা মনে করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি।

১৩০৮, চৈত্র

পরাধীনতা

হিন্দু জাতির পরাধীনতা কেন ঘটিল, এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর ইতিহাস গ্রন্থে প্রচলিত আছে।

কেহ বলেন, হিন্দু রাজারা এ জন্য দায়ী। জয়চন্দ্র মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথম কীর্ত্তি রাখিয়া যান; লক্ষ্মণসেন মুসলমানের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই ইত্যাদি।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। দুই একটা লোকের দোষে এত বড় একটা ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইলে আরও মূলে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা আসিয়া পড়ে। অবশ্যই সেই সময়ে হিন্দুগণের জাতীয় প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল যাহাতে পরাধীনতার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। জাতীয় প্রকৃতির শোচনীয় অবনতি না ঘটিলে সহজে পরাধীনতা ঘটে না। নিশ্চয়ই কোন আভ্যন্তরীণ মূল কারণে সেই সময়ে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র অধঃপতিত হইয়াছিল। পরের আক্রমণে বাধা দিবার বা পরের আক্রমণ সহিয়া লইবার শক্তি তখন হিন্দু জাতির ছিল না। তাহাতেই মুসলমান এত সহজে ভারতবাসীকে পদানত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বস্তুতই জাতীয় চরিত্রের ভয়াবহ অবনতি ব্যতীত এরূপ পরাজয় বা পরাধীনতা ঘটে না। সে পরাজয়ই বা আবার কেমন! জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ ব্যাপারের পূর্ব্বেই হিন্দুর সহিত মুসলমানের যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

তাহারও তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা কিছুদিন সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল। হিন্দুদিগের দেবতার উপর, হিন্দু গৃহস্থের স্ত্রীকন্যার উপর মুসলমান কিরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহা হিন্দুগণ সেই কয়দিনেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা রক্ত গরম করিবার জন্য যে সকল ইন্ধন আবশ্যক, মুসলমানকৃত ব্যবহারে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। অথচ তাহাতেও হিন্দুর রক্ত গরম হয় নাই, একবারে তুষারের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সিন্ধুদেশ হইতে মুসলমান বিদূরিত হইবার পরও গজনীপতি কয়েকবার ভারতবর্ষে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অভ্যাগত মহোদয়ের এক একবার সৎকারব্যাপারে যে ব্যয়-বিধানের ঘটা ইতিহাসে বর্ণিত দেখা যায় তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালী হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হইয়া থাকে; এবং যখন শোনা যায়, এ হেন অতিথিকে দলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে একজন হিন্দু রাজা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, এবং আর একজন হিন্দু রাজা আপনার রাজ্যভার ও অধীন প্রজাবর্গের মান সম্ভ্রম ও ধন প্রাণ তাঁহাদের হস্তে বিনা বাক্য-ব্যয়েই সমর্পণ করিয়া আপনার জরাজীর্ণ অস্থি কয়খানিরও ভুক্তাবশিষ্ট প্রাণটুকুর কল্যাণ প্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন জাতীয় অবনতি যে নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ মাত্র জন্মে না॥

সুতরাং এই তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জাতীয় দুর্গতিরই কারণ নির্দ্দেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং তত্ত্বান্বেষী ঐতিহাসিক মাত্রেই এই জাতীয় প্রকৃতির অধোগতির একটানা একটা মৌলিক কারণ দেখাইয়াছেন।।

বলা বাহুল্য, ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখাইয়া দিলেও সেই সমস্ত একটা খাঁটি কথাতে শেষ পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়ায়, এবং আমাদের বৈদেশিক

ও স্বদেশীয় সমুদয় ঐতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যেই সেই কথা সমর্থন করেন। কথাটা পাঁচজনে পাঁচ রকমে সাজাইয়া বলেন, এবং আপন আপন বুদ্ধির হাপরে বিবিধ মর্ম্মভেদী যুক্তির হাতিয়ার বানাইয়া লইয়া তৎপ্রয়োগে ইতিহাসের শরীরকে, ছিন্দন, ভিন্দন, কৃন্তন ও বিশ্লেষণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে মূল তত্ত্বকে টানিয়া বাহির করেন। এক কথায় হিন্দুর যত দুর্গতির মূল হিঁদুয়ানী ও হিঁদুয়ানীর প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণঠাকুর।

ফলে, ঋগ্বেদের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের সময় হইতে পুনায় র‍্যাণ্ড সাহেবের হত্যাকাণ্ডের দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ যে একটা প্রকাণ্ড ও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আছে, অনাদি অনন্ত মহাকালের আদি ও অন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের আদি আবিষ্কার করিতে পারা যায় না ও অন্তেরও কোন উপস্থিত সম্ভাবনা নাই, ইহা বৈদেশিকগণের এবং আমাদের স্বদেশীয় শিক্ষিতগণের নির্দ্ধারিত অবিসংবাদিত সত্য; এবং এই ষড়যন্ত্র হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির যত কিছু দুর্গতি, দুঃখ ও যন্ত্রণা। এককালে হিন্দুজাতি অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই উন্নতি আবহমানকাল চলিতে পারিত, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণের কূটচেষ্টা পদে পদে সেই উন্নতির গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও অবশেষে হিন্দুজাতিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর হইতে নেপালের তরাই ভূমিতে নামাইয়া আনিয়া হাঁপ ছাড়িয়া প্রসাদলাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণই প্রাচীন ভারতের যত দুর্দ্দশার মূল।

এতগুলি বুদ্ধিমান লোকে এক বাক্যে যাহা বলেন, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য; তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে ব্রাহ্মণকে পুঁছিয়া ফেলিলে কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার কোন ঠাহর পাই না; এবং বাকী যাহা থাকে তাহার উন্নতিই বা কি আর অবনতিই বা কি তাহাও বুঝিতে পারি না।

বুঝি আর না বুঝি, ব্রাহ্মণের দুরন্ত শাসননীতিতে ভারতের জাতীয় জীবন যে একবারে কণ্ঠে আসিয়া পড়িয়া কেবল উড্ডয়নের অপেক্ষামাত্র করিতেছিল, তাহা যুক্তি প্রয়োগে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায়। এবং যে পণ্ডিতই দুর্ভাগ্য ভারতের অধঃপতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসেন, তিনিই এই ঐতিহাসিক ঘটনার মুখ্য কারণগুলি একে একে গণিয়া দিতে সঙ্কোচ করেন না।

কিন্তু এইখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ অধঃপতন ও অবনতির কথা উল্লেখ করাটা ঠিক হইতেছে কিনা তাহা লইয়াই তর্ক উঠিতে পারে। কেননা, বিলাতের টাইম্‌স পত্র সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমরা এককালে উন্নত ছিলাম, এখন অবনত হইয়াছি, ইহা মনে করাও আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক ভ্রম ও মহাপাপ। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে একালের কোনও কথা আলোচিত হইতেছে না। একালে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশে কেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত একবারে বিমানমার্গে উন্নীত হইয়াছি সে বিষয়ে যেমন কোনও সংশয় নাই, মুসলমানের সময়েও সেইরূপ আমাদের দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ নীতির বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের অবনতির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায়। এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে সেই কারণগুলি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুস্থানের অবস্থা ঠিক এইরূপ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তখন মুসলমানের আগমন ও তৎকর্তৃক আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম—ব্রাহ্মণের সমুদয় বিদ্যা একটা সিন্ধুকের মধ্যে পুরিয়া তাহার চাবি আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। জনসাধারণ বিদ্যার আলোকে বঞ্চিত হইয়া মূর্খতায় হাবুডুবু খাইতেছিল।

দ্বিতীয়—মূর্খতা হইতে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের চালকলার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই কুসংস্কারগুলির প্রশ্রয় দিতেছিলেন এবং নানাবিধ কুপ্রথার ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের সমবেত আত্মাকে জড়ীভূত ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৃতীয়—ব্রাহ্মণেরা জনসাধারণের পায়ে যে অধীনতার শিকল পরাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদের প্রতি যে অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর অধীনতা ও অত্যাচারও তাহার নিকট সুখের বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

চতুর্থ—ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া বিবিধ জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাদ লাগাইয়া দিয়াছিলেন ও তাহাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বহ্নিতে কেবলই ইন্ধন প্রয়োগ করিয়া আমোদ দেখিতেছিলেন। গৃহবিবাদে হীনবল সমাজের পরের আক্রমণ সহিবার ক্ষমতা থাকে না।

পঞ্চম—ব্রাহ্মণের অনুমোদিত কন্যা বিবাহাদি সামাজিক কুপ্রথায় সমগ্র জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি ক্রমে কারণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে পারা যায়, এবং সকলেরই মূলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ প্রবর্ত্তিত সর্ব্বনাশকর জাতিভেদ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এততেও মনের তৃপ্তি জন্মে না, যেন আরও একটা কিছু অভাব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান জয় ব্যাপারের ঐতিহাসিক বিবরণ দেখিলে একটা মোটা ঘটনা সহজে ধরা পড়ে। হিন্দুস্থানে যে সময়ে বড় রাজা কেহ ছিল না এবং দিল্লীপতি কতকটা ছোট খাট সাম্রাজ্য স্থাপনে যত্নপর হইয়াছিলেন এবং তিনিই মুসলমানের সঙ্গে কিছুদিন লড়িয়া ছিলেন।

কিন্তু তাঁহারই সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টাতেই সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, হিন্দু রাজার সহিত স্থানবিশেষে মুসলমানের লড়াই ঘটিয়া থাকিলেও হিন্দু প্রজা সেই লড়াইয়ে একবারে যোগ দেয় নাই। তাহারা নীরবে ও নির্ব্বিবাদে এই রাজনৈতিক বিপ্লব চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখিল। স্বয়ং মুখ ফুটিয়া একটা উচ্চ কথা কহিল না। মুসলমান হিন্দুর রাজসিংহাসন দখল করিয়া তাহাদের দেব মন্দির ভাঙ্গিল, তাহাদের জাতিধর্ম্ম লইয়া টানাটানি করিল, তাহাদের ধনমান অপহরণ করিতে লাগিল; রাজা তাহাদের রক্ষণে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তাহারা স্বয়ং একটা দল বাঁধিয়া এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা দেওয়া বা আপত্তি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিল না।

হিন্দু প্রজার প্রকৃতিতে এ বিষয়ে একটু অসাধারণত্ব আছে, অন্য দেশে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রজা স্বয়ং সচেষ্ট থাকে, বিদেশী শত্রু উপস্থিত হইলে কেবল রাজার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে না। রাজাকে যথাসাধ্য শত্রুদমনে সাহায্য করে এবং রাজা যখন নিজে পরাস্ত হয়েন, তখন প্রজা স্বয়ং কোমর বাঁধিয়া অবতীর্ণ হইয়া অন্ততঃ একবার চেষ্টাবেষ্টা করিয়া লয়। আমাদের দেশের ইতিহাস অন্যরূপ। এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় প্রজা নির্ব্বিকার চিত্ত। সে সময়ে তাহার নিজের যে একটা কর্ত্তব্য আছে তাহার সে অনুভবই করিতে পারে না, যুদ্ধ করিয়া দেশরক্ষা রাজারই কর্ত্তব্য, তাহাতে আমাদের যে কোন দায়িত্ব আছে তাহা আমরা বুঝি না রাজা আপন সিংহাসন রাখিতে পারেন ভাল, তিনি সুখে থাকুন, অপরে আসিয়া যদি তাঁহার রাজছত্র কাড়িয়া লয়, ভাল, তাহাই হউক আমরা নূতন রাজাকে খাজনা দিব, এবং তাঁহার বিধি ব্যবস্থা পালন করিব ভাবটা এইরূপ।

ভারতবাসীর নিকট রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও ঝড়ের মত সম্পূর্ণ দৈবনির্দ্দিষ্ট ঘটনা, দৈব উৎপাত উপস্থিত হইলে মরিতে হয় ও সহিতে হয়, তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্য নয়, রাজার পরিবর্ত্তনও কতকটা সেইরূপ। রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহাও সহিতে হইবে ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে ধনপ্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে নাচার। দৈব ঘটনার আর প্রতিবিধান কি? যাহাকে আধুনিক ভাষায় রাজনৈতিক জীবন বলে, স্বদেশ ভক্তি, জাতীয় ভাব প্রভৃতি যাহার লক্ষণ, ভারতবাসীর সেই জীবনটা একবারে নাই।

আর সেকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রকৃতি ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। ভারতের প্রজা ভারতের রাজাকে খাজনা দেয়, সম্মান করে ও তাঁহার আজ্ঞামতে চলে। কিন্তু তাঁহার ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, মুসলমানের হাত হইতে যখন রাজ শক্তি ইংরাজের হাতে গেল, তখনও ভারতীয় প্রজা তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাহার মনে তজ্জন্য কোন দুঃখের উদয় বা আনন্দের উদয়ও হয় নাই, দেশের মধ্যে যে একটা ওলট পালট ঘটিয়া গেল, বিশ কোটির মধ্যে উনিশ কোটি লোক, বোধ হয় তাহার কোন সংবাদ রাখাও দরকার বোধ করেন নাই মুসলমানের কর্ম্মচারী খাজনা আদায় করিতে আসিলে আমরা আপত্তি না করিয়া খাজনা দিতাম এখন ইংরাজের কর্ম্মচারী খাজনা আদায় করিতে আসে, আমরা তাহার হাতে খাজনা দিই।

এই রাজনৈতিক জীবনের অভাবের কতকগুলা স্থূল লক্ষণ দেখা যায়। এ দেশে রাজায় প্রজায় কখন বিরোধ নাই; আবার রাজায় প্রজায় সহানুভূতি বা স্বার্থের টানও নাই—তাঁহার আদেশ মানিয়া চলা উচিত। তিনি সুখে রাখেন সুখের বিষয়; তিনি নিগ্রহ করেন তথাস্তু। দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু রাজকৃত অত্যাচারের আবার প্রতিবাদ কি? তাহা হইলে

ভূমিকম্প ও মারিভয়েও প্রতিবাদ আবশ্যক হইতে পারে। উভয়েরই পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ইংরাজ নূতন রাজা হইয়া আমাদিগকে আয়াসে রাখিয়াছেন, পরম সৌভাগ্য; আমরা ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিব। ইংরাজ যদি অত্যাচারই করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তাহা সহিতাম। বিধাতার বিধান মানুষে কি করিবে?

আর একটা লক্ষণ—এই আসমুদ্র হিমাচল আমার স্বদেশ। হিমাচলের ওপারে ও সমুদ্রের পারে ম্লেচ্ছভূমি; সেখানে আমাদের যাইতে নাই ও সে দেশের সংবাদ গ্রহণের কৌতূহলও অস্বাভাবিক। সে সকল দেশে ম্লেচ্ছ বাস করে ও হয়ত গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরাদিও লীলাখেলা করিয়া থাকে। তাহাদের কাজকর্ম্ম আহার ব্যবহার জানিয়া আমাদের কোন ফল নাই। কিন্তু হিমাচল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই দেশটুকু আমাদের। কামরূপ হইতে সিন্ধুতট পর্য্যন্ত এবং হরিদ্বার হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের স্থান, এই দেশে আমাদের দেবমন্দির, আমাদের তীর্থস্থান সমস্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম্ম, আত্মীয়, অন্তরঙ্গ সকলেই এই পরিধির মধ্যে বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্ম্মী আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর মাথাব্যাথার প্রয়োজন কি? অথবা বিধর্ম্মীর পদানত হইল তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়?

জাতীয়তার ও রাজনৈতিক জীবনের যে সমস্ত লক্ষণ, এদেশে তাহার কিছুই নাই। কোন কালে যে ছিল, তাহারও প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। রাজা নিগ্রহ করিলে তাহার প্রতিবাদ করা যেমন আমরা আবশ্যক বোধ করি না, রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সাহায্য দানও তেমনি অনাবশ্যক বোধ করি। রাজা প্রজা হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রাজলোক কতকটা দেবলোকের মত পুণ্য-স্থানীয়। সেখানে কি হয়,

কি আসে তাহা আমাদের কৌতূহলের বা অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইতে পারে না, সেখানকার ব্যবহারের উপর আমাদের কোন হাত নাই। সত্য বটে, আমাদের শুভাশুভ রাজলোক হইতে অনেক সময় নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু আকাশে গ্রহগণের গতায়াত বা দেবলোকে দেবগণের গতিবিধিও আমাদের শুভাশুভের নিয়ামক। গ্রহের ফের ও দেবতার ইচ্ছা যেমন আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে বাধ্য, রাজলোকের বিহিত ব্যবস্থাও তেমনি মানিয়া লইতে ও গ্রহণ করিতে বাধ্য রহিয়াছি।

কিন্তু অন্য দেশের ইতিহাস ঠিক এমন নহে। সেখানে রাজা প্রজার সম্বন্ধ অন্যরূপ। রাজায় প্রজায় এমন সখ্য সৌহৃদ্য নাই। কথায় কথায় প্রজা রাজার কৈফিয়ৎ চাহিয়া থাকে, রাজা ঘাড় ধরিলে প্রজা শিং নাড়া দেয়, রাজা ভ্রূভঙ্গি করিলে প্রজা দাঁত দেখায়। * * * কিন্তু আবার বৈদেশিক আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে তখন তাহারা রাজ্যের বিপদ নিজের বিপদ ভাবে; তখন তাহারা দল বাধিয়া অস্ত্র হাতে রাজাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, রাজা ও তাঁহার বেতনভুক সৈন্যের বাহুবলের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না; বৈদেশিককে রাজার সহিত লড়াই করিতে হয় না। তাঁহার লড়াই প্রজার সহিত। রাজা সেখানে প্রজার সহায়মাত্র, অথবা প্রজার নির্দ্দিষ্ট বিশ্বস্ত সেনাপতিমাত্র।

তাহার সেই জাতীয়ভাবের লক্ষণ কি? যতদিন বহিঃশত্রুর আশঙ্কা না থাকে, সে ততদিন রাজ্যের মধ্যে অহর্নিশি রাজার সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকে। অহর্নিশি দ্বন্দ্ব—উৎকট কলরব। রাজায় প্রজায় নিয়ত অবিশ্রান্ত মল্লযুদ্ধ—কে কাহাকে হঠায়? ইউরোপের ইতিহাসই এই। রাজা সময়ে সময়ে প্রজাকে দলিত করেন; প্রজা কখন দলিত সর্পের ন্যায় গর্জ্জাইয়া রাজাকে দংশন করে। যাহারা সমাজিক ও শান্ত, তাহারা রাজাকে বুঝাইতেছে ও থামাইতেছে, শাসাইতেছে; যাহারা সমাজদ্রোহী

ও দুরন্ত, তাহারা রাজার ও রাজ মন্ত্রীর মুণ্ড পাতের জন্য গভীর রাত্রে ষড়যন্ত্র করিতেছে! ভারতের প্রজা বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটিলে, লক্ষ হিসাবে ও কোটী হিসাবে নির্ব্বাক্‌ভাবে মরিতে থাকে, ইউরোপের প্রজা একবেলা উদর তৃপ্ত না হইলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য ডাইনামাইট সংগ্রহ করে। এই গেল একদিক্। অন্য দিকে যখন আবার বাহিরের শত্রু আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করে, প্রজা তখন দলে দলে রাজার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, এবং রাজা যদি পরাস্ত হয়েন তখন তাঁহার হস্ত হইতে শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। ভারতের প্রজা শান্তির সময়ে রাজাজ্ঞা অবহিত পালন করে, কিন্তু রাজার নাম পর্য্যন্ত জানিবার আগ্রহ দেখায় না। আবার এক রাজার হস্ত হইতে যখন রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া অপরের হাতে যায়, তখন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে চাহিয়া দেখে। ইউরোপের প্রজা শান্তির সময় রাজার প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্য্যের কৈফিয়ৎ না লইয়া চলে না, কিন্তু বিগ্রহের সময় ও বিপ্লবের সময় সে স্বয়ং রাজার আসনে আসিয়া দাঁড়ায়।

কেন এমন হইল? ইতিহাস কি এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ নহে? কেবল দুষ্ট ব্রাহ্মণের উপর দোষ চাপাইয়া দিলে প্রশ্নটার প্রতি সুবিচার হইল, বোধ হয় না।

আবার সময়ে সময়ে মনে হয়, এই প্রশ্নের কতকটা এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।—ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের কারণ, ইউরোপের প্রজা চিরকাল ধরিয়া পরাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজা স্বাধীন।

উত্তরটা নিতান্তই হেঁয়ালি গোছের হইয়া পড়িল। সাধারণত শুনা যায়, ইউরোপের প্রজা স্বাধীন ও ভারতের প্রজাই চির-পরাধীন। ইউরোপে এক হিসাবে আবহমান কাল হইতে প্রজাতন্ত্র শাসন-নীতি চলিতেছে; ভারতে হিন্দু রাজার সময়েও রাজশক্তি যথেচ্ছাচার পদ্ধতি ক্রমে বলিতে হইত।

ইহাই ইতিহাসের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। কিন্তু এই প্রচলিত মীমাংসার বিরুদ্ধ একটা কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন তাহার সমর্থন আবশ্যক; ভাষাশাস্ত্র ও যুক্তিশাস্ত্রকে টানিয়া বুনিয়া যেমন করিয়া হউক সমর্থন করিতে হইবে।

পরাধীন ও স্বাধীন শব্দ দুইটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি হিন্দু রাজ্যে ও মুসলমান রাজ্যে কি খৃষ্টানের রাজ্যে বাস করি, তাহা দেখিয়া আমার স্বাধীনতার পরিমাপ হইবে না। আমার নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের কতকখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন, জীবনের কতগুলা কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলা কাজই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই হিসাবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিয়াছে।

ইউরোপের ইতিহাস ধারাবাহিক সূত্রে আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? রোম নগরীর সম্প্রসারণ হইতে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভ। গ্রীস অন্যান্য বিষয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার জননী হইলেও রাজনীতি বিষয়ে গ্রীসের সহিত আধুনিক ইউরোপের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। রোমে রাজা ছিল না, কিন্তু প্রজার সমবেত শক্তি রাজার স্থানে কার্য্য করিত। রোম ক্রমে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া আপনার কলেবর সম্প্রসারিত করিতে লাগিল, এবং যেখানে যাহাকে পাইল, সকলকেই এক আইনে অধীন করিয়া সকলকেই সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়া সমান অর্থে রোমান করিয়া ফেলিল। ইউরোপের সমগ্র দক্ষিণ ভাগে আফ্রিকার উত্তর ভাগে ও এসিয়ার পশ্চিম ভাগে যেখানে যে ছিল সকলেই বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন আচার লইয়াও খাঁটি রোমক হইয়া

উঠিল। এবং অবশেষে একজন বা বহুজন সেনানীর হাতে প্রভু শক্তি সমর্পণ করিয়া রোমের বিশাল কলেবর পার্শ্বস্থ শত্রুগণের গ্রাস হইতে রক্ষার প্রয়াসী থাকিল। মহা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু একটা মহাজাতির সৃষ্টি হইল না। রোমের অভ্যুদয় কালে যে জাতীয় ভাবের, রাষ্ট্রের হিতের জন্য ব্যক্তিগত হিত-পরিহারের জন্য ব্যগ্রতার যেমন উদাহরণ মিলে, রোম যখন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইল, তখন আর তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্য জমাট বাঁধিল না। ব্যক্তি মাত্রেই রোমক, কিন্তু মহা রোমক জাতির প্রতিষ্ঠা হইল না। উত্তর দেশীয় বর্ব্বরগণ সাম্রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। যেমন উন্নতি, তদুপযোগী পতন! সেই ভয়ানক বিপ্লবে ইউরোপের ইতিহাসের প্রাচীন পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া নূতন পরিচ্ছেদ আরব্ধ হইল। এই নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভে আমরা কি দেখিতে পাই? এক এক সঙ্কীর্ণ সীমা বদ্ধ ভূখণ্ডে এক একটা নূতন সঙ্কীর্ণ জাতীর প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নূতনে পুরাতনে মিশিয়া গিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন মশলায় পুরাতন ইঁটের বাধন দিয়া নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই নূতন পরিচ্ছদে দুইটি নূতন ঘটনার অবতারণা দেখা যায়।

প্রথম, পূর্ব্বে যে একটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, তাহার মধ্যে কাহারও পরস্পর বিবাদ বিসংবাদের উপায় ছিল না। রোমক তাহার অসংখ্য শত্রুর সহিত লড়াই করিতে বাধ্য হইত। রোমক সেনানী রোমক সেনানীর সহিত লড়াই করিত; কিন্তু রোমক প্রজা কখন রোমক প্রজার সহিত লড়াই করে নাই। কিন্তু এই নূতন অধ্যায়ের সূচনায় ইউরোপ কতিপয় খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইল; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ; সেই যে রণ কোলাহলের আরম্ভ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা থামে নাই। নবম শতাব্দীর আরম্ভে পশ্চিম ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল নামে, সেই নূতন প্রতিষ্ঠার আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ ব্যাপার, রাজার

সহিত রাজার, রাজ্যের সহিত রাজ্যের, জাতির সহিত জাতির ভীষণ জীবন-দ্বন্দ্ব নিবারণে সমর্থ হয় নাই। এবং সহস্র বৎসর ব্যাপী প্রবন্ধের বিফলতার ফলে এই উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই রোমের শেষ সম্রাট্ রোম রাজ্যের নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয়—রোমের রাজা ছিল না; খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রোমের শেষ রাজা তার্কুনি সিংহাসন হইতে তাড়িত হয়েন; এবং খ্রীষ্ট জন্মের আটশত বৎসর পরে জার্ম্মানির রাজা পোপের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের মুকুট গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গা ইঁট জুড়িয়া নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে রোমে রাজা ছিল না। তিনি সম্রাটের মুকুট ধারণ করিবেন, তিনি রোমক জনসাধারণের বিশ্বস্ত ও মনোনীত ভৃত্য ও সেনানী মাত্র ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এই নূতন পরিচ্ছেদে প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন স্বতন্ত্র দণ্ডধর রাজার অভ্যুদয় দেখিতে পাই। তিনি রাজা বলিয়া রাজা নহেন;—তিনি বৈদেশিক, বিধর্ম্মী, বিজেতা, অস্ত্রধারী শাসক, পালক, প্রজার বাহ্য জীবন ও অন্তর্-জীবনের নিয়ামক রাজা। রাজার প্রথম কাজ, প্রতিবেশী রাজার সহিত যুদ্ধ,—প্রজার অর্থব্যয়ে প্রজার শোণিত ব্যয়ে; আপন স্বার্থের জন্য। রাজার দ্বিতীয় কাজ, প্রজার নিপীড়ন, প্রজার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রভু-শক্তি স্থাপনার জন্য আরম্ভে কিছুদিন ধরিয়া শৃঙ্খলমুক্ত বর্ব্বরতা; তখন প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের অট্টালিকা ভাঙ্গিতেছে। ইউরোপের সেই তামস যুগ। পরে সেই নূতন ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ—নূতন নূতন খণ্ড রাজ্য তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগ। এই সময়ে সুবিখ্যাত ফিউডল তন্ত্রের উৎপত্তি।

ফিউডল তন্ত্রের অর্থ কি? নবাগত বিজেতা বৈদেশিক রাজা আসিয়া

প্রজার সমস্ত ভূসম্পত্তি একবারে আত্মসাৎ করিলেন। তারপর সেই ভূসম্পত্তি আপনার আশ্রিত ও অনুগতকে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাজা দাতা ও প্রজা গ্রহীতা। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা যুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। দাতা প্রতিবেশীর সহিত যুদ্ধ করিবেন। গ্রহীতা আপনার জীবন আপনার শোণিত দিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে দাতার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। যাঁহারা জমির বড় বড় টুক্‌রা ভাগে পাইলেন, তাঁহারা আবার সেইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া আপন অধীন ভৃত্যবর্গকে জমি বাঁটিয়া দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই, যাহার এক টুক্‌রা জমি আছে, তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ। নিজের জন্য নহে, পরের জন্য, শেষ পর্য্যন্ত রাজার স্বার্থ সাধনের জন্য ইউরোপ একটা বিশাল সমর ক্ষেত্রে পরিণত হইল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ—তাঁহাদের খেয়াল মর্য্যাদা রাখিবার জন্য যুদ্ধ। প্রজা সাধারণ অস্ত্রধারী ভৃতিভুক্‌ সৈনিক ও ভৃত্য; তাহাদের প্রধান কার্য্য রাজাজ্ঞায় দেহপাত ও জীবন দান।

ইউরোপের মধ্যযুগে মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ। মনুষ্য মাত্রেই তখন যোদ্ধা ও অস্ত্রধারী সৈনিক। যে যুদ্ধ করিতে জানে না, সে মানুষের মধ্যে গণ্য হইত না। রাজায় প্রজায় আর এক অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। কেবল যুদ্ধের সময় রাজার আদেশে দেহপাতে প্রতিশ্রুত থাকিয়াই প্রজা মুক্তি পাইল না। রাজা তাহার পদদ্বয়ে শিকলের উপর শিকল পরাইয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। তাহার অন্তঃ শরীরেও বন্ধনের উপর বন্ধন করিলেন। রাজা শাস্তা, রাজা বিচারক, রাজা ব্যবস্থাপক, রাজার আদেশের নাম আইন। কেবল তাহাই নহে—রাজা গুরু, রাজা শিক্ষক, রাজা উপদেষ্টা, রাজা জ্ঞানের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা ধর্ম্মের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা মুক্তির পন্থা দেখাইয়া দিবেন। প্রজাকে সেই পথে চলিতে হইবে—নতুবা মঙ্গল নাই। ধর্ম্মযাজক রাজশক্তির সহকারী

পোপ এবং কৈসার উভয় পর দেবতার নরদেহে অবতার। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন। নীতির পথ রাজার আদেশে নিরূপিত হইবে। প্রজা যদি মানিয়া চলে, তাহার পক্ষে মঙ্গল, নতুবা তাহার নশ্বর জীবনের সার্থকতা নাই। তাহাকে পোড়াইয়া ফেলাই যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে। এবং ইহাকে যদি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলিতে চাও, শব্দ-শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

আরম্ভ এইরূপ, কিন্তু এই আরম্ভের পরিণতি কোথায়? রাজা মনুষ্যের আত্মাকে লুপ্ত করিতে চাহেন, কিন্তু মানুষের আত্মা লুপ্ত হইবার পদার্থ নহে। মানুষের আত্মা এক অপরূপ জিনিস।

মানুষের আত্মাকে স্বাতন্ত্র্যের যুক্ত বায়ুমার্গে বিচরণ করিতে দাও। সে মুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া কারাগারে আরামে নিদ্রা যাইতে থাকিবে। তাহাকে দলিত ও পীড়িত কর, সে ভুজঙ্গের মত গর্জ্জিয়া উঠিবে। ইউরোপে তাহাই ঘটিয়াছে। যেখানে রাজায় প্রজায় সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজার জয়। রাজা স্বার্থের উদ্দেশে প্রজার হস্তে হাতিয়ার দিয়াছিলেন, প্রজা সেই হাতিয়ার শেষ পর্য্যন্ত রাজারই বিরুদ্ধে চালনা করিয়াছে, ধীরে ধীরে রাজার হস্ত হইতে প্রভুশক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। এবং এক দিকে বহিঃশত্রুর নিকট ও একদিকে রাজার নিকট হইতে আত্মরক্ষণে কৃতকর্ম্মা হইয়াছে।

মধ্যযুগে ইউরোপের প্রজামাত্রকেই বাধ্য হইয়া অস্ত্র ধরিতে হইত, তাহাদেরই উপর দেশ রক্ষার ও রাজ্য রক্ষার ভার ছিল, বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহারাই রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইত। প্রত্যেকেই এইরূপ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য থাকায় ইউরোপ কতকগুলি সামরিক জাতির বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্ত্তী ইতিহাসে

প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইউরোপের প্রজাসাধারণ আজি পর্য্যন্ত এক হিসাবে সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মধ্য যুগ অতীত হইলে পর রাজা আর প্রজার উপর ভরসা স্থাপন করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তখন রাজায় প্রজায় রীতিমত বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রাজা প্রজার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না; তারপর আবার বারুদের আবিষ্কারে পুরাতন সামরিক পদ্ধতিই একবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। রাজা তখন বেতনভুক্ বাঁধা সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রজারা আপন আপন গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রাজার এই বেতনভোগী সৈন্য প্রজার অর্থে পুষ্ট হইত ও যখন বাহিরের শত্রু উপস্থিত না থাকিত তখন প্রজারই শাসন ও দমনে নিয়োজিত হইত। প্রজাও কাজেই আত্মরক্ষণের অনুরোধে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও ইউরোপের প্রত্যেক রাজা বেতন দিয়া বিরাটবাহিনী পোষণ করিতেছেন। রাজার নিকট প্রজার ততটা ভয় নাই, কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধের, রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা পূর্ব্বের অপেক্ষাও বাড়িয়াছে বই কমে নাই, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, লোলুপ ঈর্ষাপর প্রতিবেশীর গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য, অদ্যাপি ইউরোপের প্রত্যেক প্রজা অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। জার্ম্মাণি প্রভৃতি রাজ্যে প্রজামাত্রেই সৈনিক; আবশ্যক মতে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডে প্রজার অধিক মাত্রায় এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানেও ইংরাজের রণপোত ও ইংরাজের বলন্টিয়ার উভয়েই রাষ্ট্রের পক্ষে সমান মূল্যবান।

প্রজার পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কার্য্যেই ইউরোপের রাজা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন; বজ্র বন্ধনে বাঁধিয়া তাঁহার দেহ ও মন উভয়কেই অভিভূত করিতে চাহেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে সনাতন দ্বন্দ্ব। এই সনাতন দ্বন্দ্বের ফলে সেখানে মুহুর্মুহুঃ রাষ্ট্রবিপ্লব।

ফরাসীবিপ্লবে যে ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার ধাক্কা মধ্যে চলিতেছে। রাজায় প্রজায় বিবাদ অদ্যাপি থামে নাই। কখনও যে থামিবে তাহার ভরসাও নাই।

ঠিক এই কারণেই ইউরোপের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব এত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; বাহিরে জাতির সহিত জাতির, রাজ্যের সহিত রাজ্যের চিরন্তন বিসংবাদ; ভিতরে রাজার সহিত প্রজার সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজামাত্র তৎপর, কর্ম্মঠ, অস্ত্রধারী সৈনিকে পরিণত। এই অংশে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সমগ্র জাতি কখনও এক হইয়া জমাট বাঁধে নাই। এক মহা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সকলেই কখনও স্থান লাভ করে নাই। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সমগ্র মহাদেশকে বিভক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই একটা রাজ্যের অধিবাসীরা কখনও এক জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জার্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি কয়েকটি দৃঢ়বদ্ধ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের স্বার্থ পরস্পরের প্রতিকূল, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সহানুভূতির বন্ধন নাই, ভারতবর্ষে সেরূপ কয়েকটী সভ্য জাতি গঠিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থা কতকটা ইহার জন্য দাবী। ইতালীর একটা ভৌগলিক সীমানা আছে, স্পেনের আছে, গ্রীসের আছে, ইংলণ্ডের আছে, ফ্রান্সও জার্ম্মানির মধ্যেও একটা সীমানা খুঁজিলে মিলিতে পারে। বাঙ্গলার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই, পাঞ্জাবেরও সীমানা নাই, মধ্য দেশেরও নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই; এক বিশাল সমতল প্রান্তরের এক এক অংশ লইয়া এক এক জাতি বাস করে। সেইরূপ কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের মধ্যে, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে কোন ভৌগলিক সীমা রেখা প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। উৎকলের ভাষাকে বাঙ্গালী পরিহাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন্ স্থানে বাঙ্গালার শেষ, আর কোথায় উৎকলের আরম্ভ, তাহার নির্দ্দেশ একবারে

অসাধ্য। কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জাতি বিভাগ ও জাতি বিদ্বেষ স্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশী হিন্দুস্থানীকে বিশেষ প্রেমের চক্ষে দেখে না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন ধর্ম্মগত বিদ্বেষও বর্ত্তমান নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষে একই সময়ে অনেকগুলি রাজা থাকিতেন। কিন্তু কোন রাজারই রাজ্যের স্থায়ী সীমাচিহ্ন ছিল না। যিনি যতটা অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহার রাজ্য। রাজায় রাজায় লড়াই হইত বটে, যিনি যখন একটু প্রধান হইতেন, তিনিই একবার করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। কিন্তু আবহমান কাল ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বদ্ধমূল বিদ্বেষের উদাহরণ প্রায় ঘটিতনা। ইউরোপের ইতিহাসে কালের সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত ফরাসীর সহিত ইংরাজের বা জার্ম্মানের সহিত ফরাসীর যে সম্বন্ধের উল্লেখ করে, সেইরূপ সম্বন্ধের উদাহরণ ভারতবর্ষের মধ্যে নাই।

ভারতবর্ষে জাতিভেদের উল্লেখ করিয়া যাঁহারা একটা প্রকাণ্ড অনর্থের কারণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক বুঝাইয়া দেন না, জাতিভেদ সূত্রে রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে। জাতি ভেদ একটা বৈষম্য বটে, কিন্তু তাহা রাজ নৈতিক অধিকার লইয়া নহে, তাহা সামাজিক অধিকার লইয়া। খুব সম্ভব, ইতিহাসের পুরাতন পাতা উল্টাইলে এই বৈষম্যের মূলে রাজনৈতিক কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অংশের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বিপদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই কাল মধ্যে ব্রাহ্মণ কখনও অস্ত্র ধরিয়া শূদ্র দমনে প্রবৃত্ত হয় নাই, শূদ্রও কখনও অস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণের কণ্ঠচ্ছেদে উদ্যত হয় নাই। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রেম শূদ্রের না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই নিদারুণ বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও মূল বিচারে কিছু আসে যায় না। ব্রাহ্মণও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী, শূদ্রও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী, উভয়ে কিছু স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বাস করে না। কোন রাষ্ট্রীয় বিপ্লব উপস্থিত হইলে উভয়েরই লাভ বা উভয়েরই ক্ষতি সম্ভব।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপে একটা যাহা বিদ্যমান আছে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-রাজ্য উভয়েই বর্ত্তমান, কিন্তু ইউরোপে যেমন ফরাসী জার্ম্মান প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী, পরস্পর প্রতিকূল দৃঢ়বদ্ধ, সুগঠিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেই অর্থে তেমন ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী জাতির বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষের যে কিছু বর্ণগত বা ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধ আছে, তাহা রাজনৈতিক বিরোধ নহে, তাহা সামাজিক বিরোধ; তাহা প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। তাহা জমাট বাঁধিয়া এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা-বিশিষ্ট ভূখণ্ড অধিকৃত করিয়া রাখে নাই। ফলে ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, রাজবংশে রাজবংশে বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছে, কিন্তু জাতিতে জাতিতে মর্ম্মঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এক প্রদেশের লোকজন বাঁধিয়া অন্য প্রদেশের লোকের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। *

আমার বিবেচনায় ভারবতবাসী প্রজার এই প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতাই তাহার পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। ভারতবাসী পরাধীন, কেননা,

* মধ্যে মুসলমানের আমলে মারাঠাগণ ও শিখগণ দুইটা জাতির প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল; তাহার মধ্যে মারাঠা প্রতিবেশীর উপর উৎপাত করিতেও ছাড়িত না। এইখানে ইউরোপীয় ইতিহাসের কতকটা অনুকৃতি দেখা যায়।

বাহিরের শত্রু আসিয়া স্বদেশ আক্রমণ করিলে তাহাতে যে আপত্তি করিতে হয়, সে তাহা জানে না; রাজলোকে কোন অঘটন ঘটনা হইলে তাহাতে যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা তাহার মনের মধ্যে স্থান পায় না। ইংরাজিতে যাহাকে প্যাট্রিয়টিজম্ বলে সে ভাবটা তাহার মনে কখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আলোচ্য বিষয়; এবং দুষ্ট ব্রাহ্মণের ঘাড়ে সমস্ত নিক্ষেপ করিলেও যে উত্তরটা সম্যক্ হইল, তাহা বিবেচনা করিতে পারি না।

মনে করিও না যে ভারতবাসীর প্রাণের ভয় অন্যের অপেক্ষা বেশী, বা ভারতবাসী সাহস বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা হীন। একথা যে বলিবে, সে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই।

জাতীয় ভাব কেন যে এদেশে বিস্তার লাভ করে নাই, তাহার একটু অনুসন্ধান দরকার। সমুদায় হিন্দুজাতি কেন যে একটা মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা একটু বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

এক রাজার অধীনতা জাতীয় ভাবের বিকাশে সহায়তা করে। রাজনৈতিক বন্ধনের মত বন্ধন খুব কম আছে। আজ কাল এদেশে যে একটু সুর ফিরিবার রকম দেখা যাইতেছে, যেন জাতীয়ভাবের অতি সামান্য একটু বিকাশ হইতেছে বলিয়া কখন কখন সন্দেহ জন্মিতেছে, এক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজছত্রের অধীনতা তাহার কারণ, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এ ঘটনা বোধ হয় কখনই ঘটে নাই। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নরপতি এক একবার বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সাম্রাজ্য বোধহয় অধিক দিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। সমগ্র ভারতকে বহুদিন ধরিয়া একচ্ছত্র করিয়া রাখিতে কোনও রাজ বংশই বোধ হয় সমর্থ হন নাই। তৎপূর্ব্বে সমগ্রদেশ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে

বিভক্ত ছিল। এই ব্যাপারটা জাতীয় ভাবের অবিকাশের একটা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আরও কয়েকটা কথা আছে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহার ভিতর নানা জাতীয় নানা বর্ণের লোক বাস করে। প্রথমেই ত আর্য্য ও অনার্য্য ও তদুভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন বিবিধ শঙ্কর বর্ণ। আবার অনার্য্যগণের মধ্যে ছত্রিশ কোটী শাখা।

এই বর্ণ ভেদ ও জাতি ভেদের সহিত আবার ভাষাগত ভেদ। আর্য্য ভাষা অনার্য্য ভাষাকে একবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই। দক্ষিণাপথের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী লোকও অনার্য্য ভাষায় কথা কহে। সেই ভাষার মধ্যেও আবার তামিল তেলুগু প্রভৃতি নানা ভাষা। আরণ্য ও ও পার্ব্বত্য অনার্য্যদিগের সহস্র ভাষার কথা ছাড়িয়া দাও। এক আর্য্য ভাষাই আবার প্রদেশ ভেদে কতরূপ গ্রহণ করিয়াছে। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, বাঙ্গালা,—এক প্রদেশের লোকে অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝেন না। ভাষা গত ঐক্য না থাকিলে সামাজিক বন্ধন কোনও কাজের হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক দেশ বলাই কঠিন। বরং সমগ্র ইউরোপকে এক দেশে বলা যাইতে পারে, সমগ্র ইউরোপকে এক জাতিভুক্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষকে একটা দেশ ও সমগ্র ভারতবাসীকে এক জাতিভুক্ত বলিতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বনা।

বন্ধনের মধ্যে কেবল একটা বন্ধন ছিল। বন্য ও পার্ব্বত্যগণকে ছাড়িয়া দিলে প্রায় সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আর্য্য জাতির বেদমূলক পন্থায় প্রায় সকলেই চলিতে শিখিয়াছিল ও বেদমূলক আচার গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবিধ সম্প্রদায় ভেদ, বিবিধ আচার ভেদ ঘটিয়া সমস্ত জাতিকে কখনও জমাট বাঁধিতে দেয় নাই।

জাতিয়ত্তার অভাব বুঝাইবার জন্য এইরূপ কতকগুলা কথা বলা যাইতে পারে; এবং সচরাচর এইরূপ কারণই অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সবগুলা জড়াইলে একটা কথায় দাঁড়ায়। ভারতবাসী এক জাতিতে পরিণত হয় নাই; কেন না, ভারতবর্ষ দেশটা অতি প্রকাণ্ড। ইহা একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইহা এক জাতির আবাস-ভূমি নহে, এক বর্ণের লোক ইহাতে বাস করে না। ইহা নানা জাতি ও নানা বর্ণের মনুষ্যের বিহার ক্ষেত্র। ইহাতে নানা ভাষা, নানা আচার, নানা ধর্ম্ম। রাজনৈতিক বা সামাজিক, ধর্ম্মগত বা ভাষাগত বা আচার-গত, কোন একটা সাধারণ সম্বন্ধ এই বিংশ কোটী মনুকুলকে একটা বাঁধনে আবদ্ধ রাখে নাই। এই সাধারণ বন্ধনের অভাবে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির এমন আকর্ষণ ঘটিতে পারে নাই, যাহাতে উভয়ে একত্র হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্যে আপনার জীবনের গতি পরিচালিত করিতে পারে।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলেই কি মনের তৃপ্তি হয়? ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? অন্যত্রও কি ঠিক এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও অন্যবিধ ফলের উৎপত্তি হয় নাই?

মনে কর ইউরোপ। ইউরোপ একটা মহাদেশ, কিন্তু রুসিয়াখণ্ড ছাড়িয়া দিলে এই মহাদেশের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আয়তনে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক বড় হইবেনা। সেখানেও ঠিক জাতি ভেদ, বর্ণ ভেদ, আচার ভেদ আমাদের মতই বিভিন্ন। ইউরোপীয়েরা সকলেই আর্য্য বংশীয় বলিয়া যতই আস্ফালন করুন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকরই রক্তে বার আনা অনার্য্য রক্ত রহিয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা। তবে ইউরোপে আর্য্য ও অনার্য্যে যতটা মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে ততটা মিশিতে পারে নাই, ইহা সত্য বটে, আর্য্য অনার্য্য বিভেদ ততটা পরিস্ফুট না থাকিলেও এক আর্য্য জাতিরই বিবিধ শাখা ইউরোপের

মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর অসাদৃশ্য, এমন কি বিদ্বেষের ভাবও নিতান্ত কম নহে। তারপর ভাষাভেদ, সেও নিতান্ত ফেলিবার নহে। ইউরোপে যতগুলা দেশ, ততগুলা ভাষা; এমন কি, একটা দেশের মধ্যেও পাঁচটা ভাষার অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। একটা ধর্ম্মের বন্ধন উপর উপর দেখা যায় বটে; তুর্কি ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের সকলেই খৃষ্টান। কিন্তু সে বন্ধনটা কেবল নাম মাত্র, কাজে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। * * * * *

ফলে ভারতবর্ষও যেমন কথনও একছত্র হয় নাই, ইউরোপও কথনও তেমনই একছত্রাধীনতায় আসে নাই। ভারতবাসী একত্র হইয়া যেমন মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করে নাই, ইউরোপবাসীও সেইরূপ মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করে নাই, উভয়েরই একই কারণ। ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইউরোপও তেমনই একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ভারতবর্ষে যেমন একটা জাতি নাই, অনেক জাতি, ইউরোপেও তেমনই একটা জাতি নাই, অনেক জাতি। ভারতবাসীর যেমন ভারতের জন্য প্রাণ কাঁদেনা, ইউরোপবাসীরও সেইরূপ ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদেনা।

একই কারণে একই কাজ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ ও ইউরোপ দুই মহাদেশে একই কারণে একই কাজ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উভয়ে সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। ইহার পর আর সাদৃশ্য নাই। ইউরোপবাসীর ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদেনা বটে, কিন্তু ফরাসীর প্রাণ ফ্রান্সের জন্য কাঁদে; জার্ম্মাণের প্রাণ জার্ম্মাণির জন্য আবেগের সহিত কাঁদিতেছে; ইতালীয়ের প্রাণ ইতালীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়া ইতালীকে এক মহারাজ্যে পরিণত করিয়াছে; ইংরাজের প্রাণ রোমের জন্য কাঁদিয়া থাকে, গ্রীসের প্রাণের অবরুদ্ধ প্রবাহ বাহির হইতে না পারিয়া অন্তঃসলিল বহিতে থাকে। আধুনিক ইতিহাস

তাহার প্রমাণ। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালার জন্য কখনও কাঁদে নাই, পাঞ্জাবীর প্রাণ পাঞ্জাবের জন্য কাঁদে নাই—সে একবার কাঁদিয়াছিল অত্যাচারী ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানের রক্ত পানের অবসর না পাইয়া। মারাঠা মহারাষ্ট্রের জন্য কাঁদিয়াছিল বলিলে বোধ করি ভুল হয়, সে যে একবার অশ্রু ফেলিয়াছিল, সে বোধ হয় আনন্দের অশ্রু ও উল্লাসের অশ্রু। আনন্দ—মোগল সেনাপতির গলার মুক্তা ছড়াটার জন্য, উল্লাস—যবন রাজার টুপি কাড়িয়া ও দাড়ি মুড়াইয়া আপন উৎকট পরিহাস রসিক বৃত্তির চরিতার্থতায়। ভারতবাসী কেহ কখনও স্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য কাঁদে নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম; সাধারণ নিয়মের ব্যভিচারের কেবল একটা মাত্র উদাহরণ ইতিহাসে লেখে,—তেমন উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বোধ করি দুর্লভ; সে উদাহরণ মেওয়ারের রাজপুত।

এইখানে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে তফাৎ। ইউরোপবাসী মহাদেশের ভাবনা ভাবেনা ও মহাজাতি প্রতিষ্ঠায় তাহার আগ্রহ নাই, কিন্তু সে তাহার খণ্ড দেশ মধ্যে খণ্ড জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে সেই জাতির শরীরের অঙ্গীভূত করিয়া আনন্দিত হয়। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এক একটা রাজ্যে এক একটা দুর্দ্দম দৃঢ়বদ্ধ সকল জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ফরাসী জার্ম্মাণের শোণিত পানে ব্যাকুল; কিন্তু ফরাসী আবার ফ্রান্সের জন্য আপন শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু প্রদান করিতে প্রস্তুত। তেমনি জার্ম্মাণ, তেমন ইংরাজ। ইউরোপে এই অর্থে জাতীয় ভাবের স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপে এই অর্থে প্যাট্রিয়টিজম্ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

তারপর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ। আমাদের দেশে এই সম্বন্ধও ইউরোপ হইতে বিসদৃশ। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীন শাসনপ্রণালীকে রাজতন্ত্র বা যথেচ্ছাচার প্রণালী বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু

আমার বিবেচনায় সে কালের শাসন প্রণালী সম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক ছিল; প্রজা যে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগের আপনা হইতে অধিকার পাইয়াছিল, সহস্র বৎসরের বিবাদের ফলে আধুনিক ইউরোপীয় প্রজা তাহা পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। প্রাচীন হিন্দুরাজা পুরাণ-প্রথিত রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের সদৃশ ছিলেন, এরূপ আমার বিশ্বাস নাই। তাঁহারা দোষের গুণের মানুষ ছিলেন; এবং রাজ-জাতীয় মনুষ্যের স্বাভাবিক নিয়ম মত বোধ হয়, গুণের ভাগ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক ছিল। স্বার্থের জন্য বা রাজ্যের জন্য, বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এরূপ উদাহরণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও বিরল নহে। কিন্তু অন্যত্র প্রজার সহিত রাজার যে একটা বিরোধ দেখা যায়, এখানে সেটা তেমন প্রবল মাত্রায় ছিল না। রাজার ও প্রজার মধ্যে তেমন দৃঢ় বন্ধনই বোধ হয় ছিল না। প্রজা খুব সামান্যভাবেই রাজার প্রভুশক্তির অধীন ছিল। প্রজার রাজার নিকট নিপীড়িত হইবারও বিশেষ অবসর ঘটে নাই, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবারও তেমন দরকার হয় নাই। অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা কেহ ছিল না, এমন কথা নহে। কথাটা হইতেছে সাধারণ নিয়ম লইয়া। কয়েকটা বিষয় আলোচনা করিলে এ বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

সে কালের রাজার কেবল একটি কাজ। তিনি দণ্ডধর। তিনি সৈন্য পরিবৃত হইয়া শত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করেন ও রাজসিংহাসন রক্ষা করেন। এবং তিনি রাজ্যের মধ্যে দুষ্টের শাসন দ্বারা শান্তিরক্ষা করিতেন, সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থানে মন্ত্রণা দান ও বিচারের ভার ব্রাহ্মণের হাতে ছিল; এবং ব্রাহ্মণকে, যেমনই প্রবল রাজা হউন, ভয় করিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। শাসন বিষয়ে ও বিচার বিষয়ে রাজার খেয়াল ততটা কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু এই স্থলেই বোধ হয় প্রজার সহিত রাজার

সম্বন্ধের শেষ। রাজা কর আদায় করিতেন, করের ভার দুর্ব্বহ ছিল কিনা সে বিষয়ে ইতিহাস কিছু বলে না। কর সংস্থাপনে রাজা ইচ্ছার উপর ও খেয়ালের উপর চলিতেন কিনা, সে বিষয়েও ইতিহাস নিরুত্তর। রাজা যাহাই করুন, শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ কিন্তু এ বিষয়েও রাজার শক্তি সংযত করিয়া দিতে অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। রাজা কর আদায় করিতেন, তাহার দ্বারা আপন সেনা পোষণ করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, বাবুয়ানা করিতেন, এবং ইচ্ছা হইলে হয়ত সাধারণের হিতের জন্যও কত খরচ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু প্রজার স্বাধীনতা সংহারের জন্য এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতেন, এরূপ প্রমাণ নাই।

ব্যবস্থা প্রণয়ন অর্থাৎ আইন কানুনের প্রণয়ন রাজার হাতে ছিল না। প্রজা আপন চিরাগত প্রথানুসারে আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আইনের ব্যবস্থাটা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের হাতে ছিল বটে, এবং তিনি দায়ভাগ হইতে ডাক্তারী উপদেশ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে ছাড়িতেন না; এবং অপরাধীর সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া একবারে গণণার বাহির করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল অপরাধের অধিকাংশ স্থলেই স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত, জোর এক আধটু সামাজিক নিগ্রহের বিধান ছিল। রাজদ্বারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর পঁহুছিত না। বিচারাদি কার্য্যও অনেক স্থলে মধ্যস্থের দ্বারা ও সমাজের মুরুব্বিদের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গ্রামের ভিতর, পল্লীর ভিতর প্রজার দৈনন্দিন ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-ব্যাপার গ্রামের লোকের পরস্পর সাহায্যে সম্পাদিত হইত। রাজার সহিত কোন বিষয়ে কোন সম্বন্ধ ছিল না, বা সংঘর্ষ ঘটিত না। ফলে শান্তিরক্ষা ও শত্রুর সহিত লড়াই ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত কাজই প্রজারা আপনা আপনি আপনাদের মধ্যেই গোছাইয়া লইত। গ্রামের পাঁচজনে মিলিয়া গ্রামের কাজ সম্পাদন করিত। রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হইত না; রাজাও

কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি রাজার অধিকার বহির্ভূত ছিল। হইতে পারে, এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতির উপর অবৈধভাবে ও অন্যায্য উপায়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করিতেন, হয়ত এই সূত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপরের বিরোধ ঘটিত, বা বিদ্বেষ ঘটিত। কিন্তু সে বিরোধ প্রজায় প্রজায়; রাজার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

আর একটা প্রকাণ্ড স্বাধীনতা ভারতের প্রজার স্বাভাবিক ছিল,—ভারতের বাহিরে অন্যত্র মনুষ্য যাহার রসাস্বাদনে আজি পর্য্যন্ত বঞ্চিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে রাজা কখনও প্রজার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যাজক সম্প্রদায় জনসাধারণের জন্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। রাজা সেই যাজক সম্প্রদায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যে ব্যক্তি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে রসনাস্ফালনে সাহসী হইত, সমগ্র রাজশক্তি বজ্রেরমত তাহার মস্তকের উপর নিপতিত হইত।

কেহ যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের একটা নূতন কথা প্রচার করিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে প্রজ্জ্বলিত চিতানলে তাঁহার শরীরকে ভস্মীভূত করিয়া আত্মার সদ্গতির ব্যবস্থা হইল। ফলে অজ্ঞানের তমোময় অন্ধকার সমগ্র মহাদেশকে সহস্র বৎসর ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্ব প্রান্তে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, খৃষ্টানের রাজশক্তি ও যাজক শক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাতে শীতল বারিধারা নিক্ষেপ করিয়া অচিরে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা অঙ্কুরিত হইয়া সতেজে শাখা প্রশাখা

সৃষ্টি করিতেছিল; তাহারা একবারে উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইল।
সুকুমার কলাবিদ্যা মানবের দুঃখময় জীবনে সুখের ও শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উপায়ে নিযুক্ত হইতেছিল, প্রতিবন্ধকদিগের প্রবল কুঠারাঘাতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। জ্ঞানের পন্থা কণ্টকিত হইল; স্বাধীন চিন্তার দ্বার আবদ্ধ হইল; ইউরোপের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে চিতার অনলে দার্শনিকের ও তত্ত্বানুসন্ধানীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

রাজ সম্প্রদায়ের ও যাজক সম্প্রদায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মানবাত্মার সম্প্রসারণের পথ রোধে সমবেত যাজক শক্তি ও রাজশক্তি কৃতকার্য্য হয় নাই। মনুষ্য আপন স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। খড়্গহস্তে আপনার ন্যায্য সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই অন্তিম কালে, বিজ্ঞান যখন দর্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে, দর্শন যখন অজ্ঞানের তিমির রাশি ভেদ করিয়া সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য চলিয়াছে, এখনও কি সেই পুরাতন জরাজীর্ণ রাজশক্তি ও যাজক শক্তি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাই?

ভারতবর্ষে বিধান অন্যরূপ। এখানে যে মানব সম্প্রদায়ের হস্তে জ্ঞানালোচনার ভার অর্পিত ছিল, রাজশক্তি সভয়ে তাহার নিকট প্রণত থাকিত। মনুষ্যের ধীশক্তি অপ্রতিহতপ্রভাবে সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সহস্র দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল; কেহ বলিতে সাহস করে নাই, ঐ পন্থায় তুমি চলিওনা। যিনি বলিতে চাহেন, ভারতের ব্রাহ্মণ মনুষ্যের চিন্তাশক্তিকে শৃঙ্খলিত ও নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি হয় অন্ধ, নতুবা মিথ্যাবাদী। তাঁহার সহিত বিচারের অবতারণা বিড়ম্বনা।

সামাজিক, নৈতিক, ভৌতিক ও মানসিক সকল ব্যাপারেই ভারতীয় প্রজা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিল; ঠিক এই কারণে রাজার সহিত কথনই

তাহার বিরোধের আশঙ্কা ঘটে নাই। এই জন্য সে কখন অস্ত্রধারী সৈনিকের ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হয় নাই। রাজার সহিত রাজার যুদ্ধ হইত; এক রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড অন্যে কাড়িয়া লইতেন; কিন্তু প্রজার স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইতেন না। প্রজাও সেই জন্য রাজ পরিবারের ও রাজ বংশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়, রাজার নিকট আপনার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে হয়, কথায় কথায় রাজার কৈফিয়ৎ চাহিতে হয়, ভারতের প্রজার এই শিক্ষালাভের অবসরই ঘটিয়া উঠে নাই। যে শিক্ষা ও যে পরীক্ষা যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব হইলে জাতীয় ভাব ও রাজনৈতিক ভাব বিকশিত হয়, এদেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কারণের অভাব, ফলেও সেইরূপ। ভারতের প্রজা জানিত না, রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়, সে জানিত না, রাজার ছত্র দণ্ড লইয়া অপরে টানা-টানি করিলে রাজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে হয়; সে জানিতনা, রাজ বিপ্লবের ফলের সহিত প্রজার সামাজিক জীবনের শুভাশুভ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে যুদ্ধ ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের নাম ছিল ক্ষত্রিয়। রাজার সিংহাসন রক্ষার জন্য, শক্রর হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্য এই ক্ষত্রিয় জাতিই প্রয়োজনমত অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইত। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যুদ্ধ ব্যবসায়ী মনুষ্য-সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল না; যাহারা বেতন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের কোন নৈতিক দায়িত্ব-বোধ ছিলনা। প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির লোপ হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নূতন সমাজ গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইতেছিল মাত্র। এই সময়ে পশ্চিম দেশ হইতে যবন, শাক, হূণাদি বিবিধ সমরপ্রিয়

বর্ব্বর জাতি হিন্দুস্থানে দলে দলে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে; অনেক বড় বড় রাজ্য স্থাপনেও কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু অল্পদিনেই তাহারা হিন্দুস্থানের সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সকল নবাগত সমরপ্রিয় জাতিগণকে লইয়া ভারতবর্ষের নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের অভ্যুত্থান হইল। যখন মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ তাহাতে শঙ্কিত ত্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় নাই। আত্মরক্ষার জন্য যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা কখনও তাহারা পায় নাই। তাহারা দল বাঁধিয়া সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই, অথবা ঐ কার্য্যের আবশ্যকতার উপলব্ধি করে নাই। নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুত একা সেই দুরন্ত শত্রুর প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিল। বেগবতী প্রবাহিনীর গতিরোধ তাহাদের অসাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মুসলমানের মত প্রচণ্ড শত্রুর সঙ্গে তাহারাও যেরূপ লড়িয়াছিল, তাহার বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে।

মুসলমান আমাদের দেশের রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজার উপর উৎপীড়ন অত্যাচারও যথেষ্ট করিতেন; কিন্তু মোটের উপর প্রজার পারিবারিক ও সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে তাঁহাদেরও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; একই ভারতমাতা উভয়েরই জননী-স্বরূপা হইয়া উঠিয়াছিলেন। * * * * উভয়ের মধ্যে সামাজিক আচারগত বন্ধন অসম্ভব; কিন্তু ভরসা যে, বিশাল সত্যয় ব্রিটিশ রাজছত্রের তলে দণ্ডায়মান উভয় জাতি এক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরকে বর্দ্ধিত ও পোষিত করিতে থাকিবে।

শিক্ষাপ্রণালী

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মীমাংসা হইয়াছিল ইংরাজি না পড়িলে আমাদের কোন উন্নতি হইবে না, যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাল পত্রের গ্রন্থগুলিতে কেবল ক্ষীরসমুদ্রের ও দধিসমুদ্রের বর্ণনা আছে।

আজকাল সাব্যস্ত হইতে বসিয়াছে ইংরাজি পড়িয়া ত বিশেষ কিছু ফল হইল না। পঞ্চাশবৎসরের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হইল দেখিয়া দেশের মধ্যে একটা হাহুতাশ ও কলরব উপস্থিত হইয়াছে, ও চারিদিকেই তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে।

বৎসর দুই পূর্ব্বে এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভাপতি বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতাকালে সোসাইটির জন্মকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সোসাইটির সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির লেখকের তালিকা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, তালিকা মধ্যে বাঙ্গালীর নাম কেমন বিরল, এতকাল ইংরাজি শিখিয়াও একটা সুচারু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইহাদের মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইল না; বাঙ্গালীর কোন আশাই নাই। তাহাদের মাথাই নাই।

দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতির প্রতি দয়া বিতরণে বিধাতা তেমন মুক্তহস্ত নহেন, তথাপি কেমন করিয়া এই নিদারুণ বাক্যবাণ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার হৃদয়কে একটু যেন করুণ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কেননা, উক্ত অধিবেশনের পর এক বৎসর পার না হইতেই ডাক্তার জগদীশ-চন্দ্র বসুর কার্য্যকলাপ বাঙ্গালীর মলিন মুখকে সহসা জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দিয়াছে।

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রটি বনমানুষের হাড়ের বিনা প্রয়োগে আদেশমাত্র আকাশ তরঙ্গ ঘটিত যে সকল নিগূঢ় কথা বলিয়া ফেলে, তাহা সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট দুর্ভেদ্য রহস্য মাত্র, কিন্তু তিনি যে তাহার শুষ্ক মুখে হাস্য সঞ্চার করিয়াছেন, তজ্জন্য সে তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে।

যাহাই হউক, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অনুর্ব্বরতা সম্বন্ধে আজকাল তত লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি বর্ষণ সত্ত্বেও ফল প্রসব হইতেছে না কেন তাহা চিন্তনীয় বিষয়।

সেদিন বিজ্ঞান সভায় বঙ্গের মহামান্য শাসনকর্ত্তা বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিরাশ হইবার তেমন কারণ নাই, তবে কর্ষণের পদ্ধতি দোষে এ রকম ফলাভাব। সুচারুরূপে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কর্ষিত হইলেই ক্ষেত্রে শস্য জন্মিবে এবং কৃষ্ণ কাকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটিলেই সে গৃধ্র-রাজের সহিত আপনার পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া তাহার কর্কশ কলরবে বিরাম দিবে।

সেই পদ্ধতিটা কি? বক্তার মতে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীটা ঠিক্ নহে। অর্থাৎ ভারত গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা লাভ যে প্রণালীতে বাঙ্গালী সন্তানকে মানুষ করিতেছেন, তাহাতে সে মানুষ না হইয়া কাক হইতেছে। ছাত্রেরা পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল শব্দতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব অভ্যাস করে, সেই জন্য তাহাদের কেবল শব্দালঙ্কারে ও বাক্যালঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিবার শক্তি জন্মে। কখনও হাতে কলমে কাজ শেখে না, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র নামে যে একটা শাস্ত্রকে সকলেই নিন্দা করে, অথবা যাহার সাহায্য না লইলে এক পা চলিতে পারে না; সেই শাস্ত্রের একবারে আলোচনা নাই বলিলেই হয়। অথচ অন্য পক্ষে মিলের ও বার্কের রচনা

হইতে কতকগুলা বচন সংগ্রহ করিয়া তাহার বাবদ্ কথা বৃদ্ধি পায়। কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে সে জ্ঞানই তাহার জন্মে না। অস্ত্র বড় উপকারী পদার্থ, কিন্তু যে অস্ত্রের ব্যবহারে অনভিজ্ঞ ও প্রয়োগে অপটু, তাহার পক্ষে তাহা কেবল ভার স্বরূপ।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি; বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অন্যের কোন সন্দেহ থাকিলেও আমাদের কিছু মাত্রও সংশয় নাই এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের কার্য্য-কারণ তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সহিত কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে তাহাও আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; আর হাতে কলমে শিক্ষা, যাহাকে ইংরাজিতে টেকনিকাল শিক্ষা বলে, তাহার অভাবে প্রয়োগাভিজ্ঞতা জন্মে না তাহাও স্বীকার করি। তথাপি একটা কিন্তু আছে, তাহার উত্থাপনের পূর্ব্বে আর কে কি বলেন, তাহা একবার দেখিয়া লওয়া যাক্।

অনেকের মত এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই জন্য আমাদের চরিত্র ভাল জমাট বাঁধিতেছে না; এবং চরিত্রের সারবত্তা না থাকিলে কোন শিক্ষাতেই কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মহীনতা, ও নীতি-জ্ঞানের অভাবে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব বুঝিতে পারি না। আমরা সংসারে থাকি। অথচ সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বুঝি না। আমরা উপরে ভাসি, তলে মগ্ন হইতে পারি না। যত দিন ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষা বর্ত্তমান থাকিবে তত্তদিন আমরা সংসার-সলিলে ভাসিতেই থাকিব।

এই কথাটাও আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই বিষয়ে কথা তুলেন, তাঁহারা মীমাংসার পথ দেখান না। যাঁহাদের উপর শিক্ষার বন্দোবস্তের ভার আছে, তাঁহারাও ইহা স্বীকার করেন কিন্তু কর্ত্তব্য-বিচারের সময় কেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। গবর্ণমেন্ট

ও বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান জড়িত সমাজে আমরা কিরূপে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি; বিশেষতঃ যখন আমরা এবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না এই প্রতিশ্রুতি করিয়া বসিয়া আছি। তবে ধর্ম্ম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও নীতির উপদেশ চলিতে পারে; তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, প্রবেশিকার সাহিত্য পুস্তকের এত পাতার মধ্যে এত পাতার কম যেন নীতি-কথা না থাকে। নীতিশিক্ষার এমন রাজকীয় পন্থা আবিষ্কার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্যের কর্ত্তৃক অসাধ্য। কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মিশনরী সাহেবেরা ছাত্রদিগকে ভয় দেখান, বাইবেল ক্লাশে উপস্থিত না থাকিলে পরীক্ষা দিতে দিব না। অথচ, আর্য্য-বিদ্যার আকরগুলিতে আজকাল গীতা পাঠের ও চাণক্য শ্লোক আবৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। এমন কি গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে স্থাপিত "উচ্চতর শিক্ষাসমাজ" আপনার নাম গোপন করিয়াও মাঝে মাঝে নৈতিক লেক্‌চারের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, শুনিয়াছি। আশা করা যায়, গবর্ণমেণ্ট আগামী দশম বার্ষিক সেন্সাস লইবার সময় এই সকল উপায়ে নীতিশিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণের সংখ্যা লইবার একটি ঘর রাখিয়া দিবেন, ও বর্ষে বর্ষে এই সকল উপায়ে বাঙ্গালী যুবকের নীতির কি হারে উন্নতি হইতেছে তাহার একটা করিয়া রিপোর্ট দিবেন।

আর এক সম্প্রদায় আরও একটু মূলে হাত দেন। তাঁহারা বলেন, পরিশ্রমের অভাবে কেবল মানসিক ব্যায়ামে লিপ্ত থাকিয়া বাঙ্গালী সন্তানের মাথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এ কথাটা ঠিক্। রুগ্নদেহে সুস্থ চিত্তের অবস্থিতি বিজ্ঞান বিরুদ্ধ; এবং যথোচিত দৈহিক ব্যায়াম শারীরিক বলের পুষ্টিলাভের সঙ্গে মানসিক বলও যে বৃদ্ধি পায় কোন্ ব্যক্তি তাহা

অস্বীকার করিবে? এই জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব হইয়াছিল, যাহারা বৎসরের মধ্যে এত দিন কুস্তিশালায় উপস্থিত না থাকিবে, তাহাদিগকে যেন পরীক্ষা দিতে না দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মানসিক ব্যায়ামের মাত্রাটা কিছু কমাইবার এবং দরিদ্র অন্নহীন বালকের শারীরিক ব্যায়ামে অত্যন্ত আবশ্যক শরীর পোষণের উপাদান সংগ্রহের কোন প্রস্তাব হইয়াছিল কিনা, ঠিক্ জানি না। এইরূপে নানারূপ কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কেহ বলেন, পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বেশী; কেহ বলেন, পাঠ্য পুস্তকের পাতা বেশী; কেহ বলেন, ছেলেরা না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করে; কেহ বলেন, পুস্তক মুখস্থ না করিয়া তাহার "কী" অর্থাৎ অর্থ পুস্তক মুখস্থ করে; কেহ বলেন, সেই 'কী' আবার ভুলে পূর্ণ। সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ কয়েক মাস ধরিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন যে, বাঙ্গালী লিখিতে গেলেই ইংরাজি ভুলে, সেই জন্য এত দুরবস্থা। কেহ বা একবারে নির্ঘাত বলিয়া ফেলেন, ইংরাজি শিক্ষাটাই কিছুই নয়; স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া টোল বসাও।

আমরা নিরীহ ভাবে এই সকল কথারই সারবত্তা মানিয়া লইতেছি; কিন্তু প্রত্যেকটাতেই আমাদের সেই প্রাচীন "কিন্তু" রহিয়াছে। ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া দিলে যে চলিতে পারে না, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহা ঘটিবে কি? ভুল না লিখিয়া শুদ্ধ ইংরাজি লিখিলে ভাল হয়, কিন্তু কোন্ অছিলা অনুসারে ভ্রান্ত লেখকের শাস্তি বিধান করিব? শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, কিন্তু ফ্যামিন ফণ্ডের তহবিলেও আর এত মৌজুদ নাই, যে তাহার সাহায্যে ফুটবল ক্রীড়ার্থীর আহারের ব্যবস্থা করা যাইবে। ধর্ম্ম-শিক্ষা ত ভাল, কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিরারের সার্টিফিকেট সত্ত্বেও সকলে গীতার অর্জ্জুনকৃত ভগবৎ গোত্রকেও অসাম্প্রদায়িক

বলিয়া স্বীকার করিবে না। বিজ্ঞান শিক্ষা ত অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু যে শেক্ষপীয়র বা বার্ক মুখস্থ করিয়াছে তাহার মুখে দুইটা মিষ্ট বাক্যের আশা করা যায়, কিন্তু যে কেবল ডেশানেলের বিজ্ঞান গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছে তাঁহার নিকট সে আশাও নাই।

সকলেই সকল কথা বলেন, কিন্তু একটা সোজা কথা কেহই বলেন না, অথবা মুখে বলিলেও সেই বাক্যের ন্যায় সঙ্গত তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখেন না। সেই সোজা কথাটা এই, যে, শিক্ষা কোথায় যে বাঙ্গালী সন্তান শিক্ষালাভ করিবে? উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেন না; কেবল পরীক্ষা করেন; এবং সেই পরীক্ষার পদ্ধতি আবার এমন, যে, যে শিখিতে ব্যস্ত, তার পরীক্ষায় উদ্ধারের আশা নাই; যে মুখস্থ করে সেই তরিয়া যায়। শিক্ষার ভার স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের হাতে; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাদানে প্রকৃত বিদ্যালয়ের জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা যিনি জানেন তিনিই বুঝিবেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দেয় না, বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য ছাত্র তৈয়ার করে মাত্র।

সেই পদ্ধতিই বা আবার কেমন? ইংরাজেরা আজকাল সকল কাজ কলে চালান। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত নানা যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। জল তোলা, গাড়ী টানা, আলো জ্বালা সমস্তই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের সাম্রাজ্যে শাসনকার্য্য যন্ত্রে চলে। এ দেশে ইংরাজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষাকার্য্যও যন্ত্রে সম্পাদিত হয়। ছাত্রের পিতা বা অভিভাবক যথা সময়ে বালককে কলে ফেলিয়া আসেন; এবং কিছু দিন পরে কল হইতে বাহির করিয়া লয়েন। বালক যখন কল হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার ললাটপটে 'শিক্ষিত' শব্দ যদি অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে পরিশ্রম ও ব্যয় বিধান সার্থক হইয়াছে; বালকের

মন-শরীরের অভ্যন্তরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না দেখিয়া লওয়া অনাবশ্যক।

মধ্যে শুনিয়াছিলাম, এডিসন সাহেব সন্দেশ তৈয়ার করিবার কল বাহির করিয়াছেন,—কলের এক প্রান্তে একটা গরু ও কয়েকগাছি ইক্ষু দণ্ড পুরিয়া দিলে অন্য প্রান্ত হইতে সন্দেশ বাহির হইয়া আসে।

গরু ও ইক্ষুদণ্ডকে আহারোপযোগী সন্দেশে পরিণত করিবার জন্য যে সকল প্রতিভা আবশ্যক, তাহা যন্ত্রটি নীরবে ধারাবাহিকরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রে লব্ধপ্রবেশ বালক যখন শিক্ষিতের ছাপ লইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন যন্ত্রসম্পাদিত বিকৃতিটা সন্দেশের মত মধুর হয় কি না তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

জীব শরীরকেও আজকালি যন্ত্রের সহিত উপমিত করিবার প্রথা দাঁড়াইতেছে। জীব-দেহ অনেক বিষয়ে যন্ত্রের মত হইলেও উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। শরীর-যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরস্পর যতটা সম্বন্ধ আছে, নির্জ্জীব যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরস্পর তেমন সম্বন্ধ নাই। ঘটিকা চক্রের একখানা চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে যন্ত্র কিছু-কালের জন্য বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অন্যান্য চাকা ও অন্যান্য অঙ্গ নষ্ট হয় না; সেই ভাঙ্গা চাকাখানি মেরামত করিয়া দিলে ঘটিকা যন্ত্র আবার পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে। কিন্তু জীব-দেহের একটা অঙ্গ বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অনায়াসেই অন্যান্য অঙ্গও অল্প বা অধিক মাত্রায় বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, রক্তের দোষে মাথা খারাপ হয়, মাথার দোষে হাত পা নষ্ট হয় ইত্যাদি। এবং একটা অঙ্গ একবার নষ্ট হইয়া গেলে তাহার মেরামতও সহজে চলে না।

নির্জ্জীব যন্ত্রের এক স্থানে বিকৃতি ঘটিলে বিকৃতিটা সেইখানেই আবদ্ধ থাকে; আর সজীব যন্ত্রের একটা স্থানে ব্যাধি ঘটিলে সেই ব্যাধি ক্রমে

প্রসার লাভ করিয়া সমগ্র যন্ত্রকেই আক্রমণ করে। এক কথায় ইংরাজিতে যাহাকে সিম্পাথি বলে, জীব-দেহের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে তাহা বর্ত্তমান; যন্ত্র-দেহের বিবিধ অবয়ব মধ্যে তাহা বর্ত্তমান নাই।

আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালীর সহিত আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর তুলনা করিতে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। উভয়ই যন্ত্র সাহায্যে সম্পাদিত হয়। ইংরাজের রাজ্য শাসন কলে চলে, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানও কলে চলে। শাসন-যন্ত্র ও শিক্ষা-যন্ত্র উভয়েরই বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেই সকল অবয়বের মধ্যে পরস্পর যেন একটা সম্বন্ধ বা সহানুভূতি বা সিম্পাথি নাই। প্রথমে শাসন-যন্ত্রের কথা ভাবিয়া দেখ। সত্য বটে, একজন বর্ষীয়সী গরিষ্ঠচরিতা মহারাজ্ঞী ভারত-সম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থলে বর্ত্তমান আছেন, এবং চক্রের নেমি যেমন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে ভারত-সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের নিয়তি সেইরূপেই সেই কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে বিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সেই কেন্দ্রও সেই নেমির মধ্যে ব্যবধান এতই অধিক, যে একের সংবাদ অন্যের নিকট পৌঁছিতে পারে কি না সন্দেহ। জীব-দেহে হৃৎপিণ্ড হইতে যে শোণিত ধারা বাহির হয় তাহা শত সহস্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ধমনী ও দৈহিক নালীর যোগে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া অস্থি-মজ্জা ও স্নায়ু-পেশী প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক দূরস্থিত কোষের নিকট স্নেহ সামগ্রী ও পুষ্টির উপাদান লইয়া যায়; ও বিশুদ্ধ রক্ত-ধারা বাহিত উপাদানে পুষ্ট ও স্নিগ্ধ ও নবীকৃত হইয়া প্রত্যেক কোষ আপন জীবনযাত্রা নূতন বলে আরম্ভ করে। হৃৎপিণ্ড এইরূপে প্রত্যেক কোষের যথা সময়ে সংবাদ লয়, ও প্রত্যেক কোষ তাহার প্রতিবেশীরও দূরস্থিত কুটুম্বগণের সংবাদ রাখে, ও কেন্দ্রস্থিত হৃৎপিণ্ডের নিকট আবেদন পাঠাইয়া দেয়। আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনচক্রে এইরূপ

সজীবতার কোন চিহ্ন নাই। যাঁহাদের হস্তে শাসন ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুসারে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া যান; ঘটিকাচক্রের চাকা হয়ত সব সময়ে যথানিয়মে কর্ত্তব্য পালন করে না, কিন্তু শাসন-যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র বিনা তৈল প্রয়োগে নীরবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অথবা জড়-প্রকৃতি যেমন নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃত নিয়মের অনুসারে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহার দয়াও নাই আবার ক্রোধও নাই, প্রেমও নাই, তেমনি বিরাগও নাই, সেইরূপ প্রেমশূন্য ঈর্ষ্যাশূন্য; ঘৃণাশূন্য, অনুরাগ বিরাগ উভয় ভাব বিবর্জ্জিত শাসন-যন্ত্র অহর্নিশ আপন কাজ করিয়া যাইতেছে, কাহারও মুখের পানে চাহিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকে না। শাসন-যন্ত্রের যে কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহার করিলাম তাহার সকলগুলি ঠিক্ হইয়াছে কি না সে বিষয়ে কাহারও কাহারও সংশয় জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-যন্ত্রের প্রতি যদি ঐ সকল বিশেষণ প্রয়োগ করি, তাহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি ঘটিবে না। বীজগণিত শাস্ত্রে অজ্ঞাত রাশি একটা সাঙ্কেতিক বর্ণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়—যেমন ক। ক বলিলে বুঝিতে হইবে উহার প্রকৃত পরিমাণ কি তাহা এখনও জানি না। ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জের অধিকাংশের নিকট তাহাদের অধীশ্বরী মহারাজ্ঞী সেইরূপ অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অনির্দ্দেশ্য অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য ক না হইলেও, আমাদের শিক্ষা-যন্ত্রের নেমিপ্রদেশে ঘূর্ণমান বালকবৃন্দের জীবনকেন্দ্র উপাসিতা বাগ্দেবী সরস্বতী নিতান্তই ক। পৌরাণিকের নিকট বাগ্দেবী নীরস, বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তাস্বরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিত্তালয়েরও শিক্ষা-বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্পন্দহীন, বর্ণহীন, নীরস নীরব ক'য়ে পর্য্যবসিতা হইয়াছেন। তাঁহার চিন্তা নাই,

বেদনা নাই, অনুভূতি নাই, তিনি কেবল শিক্ষা-যন্ত্রের কোন অনির্দ্দেশ্য স্থানে অবস্থিত থাকিয়া শুষ্ক কঠোর ব্যবস্থা নির্দ্দেশে ও নিয়ম নির্দ্দেশে ও দণ্ডচালনায় শিক্ষার্থীর ভ্রমণ পথ নিয়ন্ত্রিত করেন। বাগ্দেবী ত দূরে আছেন, যে শিক্ষক ও অধ্যাপক সম্প্রদায় মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া উপাসিতার সহিত উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপনে নিয়োজিত তাঁহারাও রাগানুরাগশূন্য যন্ত্রাঙ্গ মাত্রে পরিণত হইয়াছেন। আচার্য্য ও শিষ্যের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ও অনুরাগের সম্বন্ধ না থাকিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য কেবল পণ্য বিনিময়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়; এবং সেই পণ্য বিনিময়ের ফলে আর যাহাই হউক না কেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের পুষ্টিলাভের কোন আশা থাকে না। একালের বেতনভোগী রাজপুরুষ যেমন আপন নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের পর আপনাকে ঋণমুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহার পরিশ্রমের আশানুরূপ ফল লাভ ঘটিল কি না তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, একালের অধ্যাপকও সেইরূপ তাঁহার বৃত্তির বিনিময়ে নির্দ্ধারিত কর্ম্ম সম্পাদিত করিয়া আপনার সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল ধ্রুব জানেন, তাঁহার শিষ্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন ঘটে না।

কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজ কাল বিজ্ঞানশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ইতিহাসশিক্ষা, হাতে-কলমেশিক্ষা বা টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; এবং কোন্ শিক্ষা ভাল আর কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে একবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি স্ফূর্ত্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব

পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না। সত্য বটে, মনুষ্য বয়স্ক হইলে তাহাকে একটা ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়,—এবং সেই ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কিছুদিন একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় শিকল পায়ে দিয়া বিচরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু সে বয়সের কথা, বাল্যের কথা নহে।

যাহার মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, যাহার গায়ে বল জন্মিয়াছে, যে অন্যের হাত না ধরিয়া অথবা যষ্টির সাহায্য না লইয়া নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার চোখের উপর একটা রঙিন পরকলার আচ্ছাদন নাই, এবং সেই চোখ উন্মীলন করিয়া যে দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে এই ব্যবসা শিক্ষার জন্য প্রয়াসের দরকার হইবে না। সে আপন ব্যবসায় আপনি বাছিয়া লইবে, আপন রাস্তা আপনি দেখিয়া লইবে, এবং আবশ্যক হইলে সেই নির্ব্বাচিত পথে বাহির হইয়া কুঠার হস্তে তাহার প্রতিরোধক বিঘ্ন অপসারিত করিয়া যাহা দুর্গম ছিল তাহা সুগম করিয়া লইবে। তাহার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। কিন্তু সেই বল সঞ্চয়ের পূর্ব্বে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—যাহাতে তাহার আপনার উপর নির্ভর করিবার শক্তি জন্মে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রকৃত কথা এই যে, বাল্যকালের উপযোগী যে শিক্ষা, সে শিক্ষার কেবল একটা অর্থ, এবং তাহার কেবল একটা উপায়। সত্য বটে যে, ব্যক্তিভেদে সেই উপায় প্রয়োগের বিধিরও অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন আবশ্যক; কিন্তু সাধারণ নিয়ম একটা। কেবল বিজ্ঞান, কেবল ইতিহাস বা কেবল সাহিত্য শিক্ষা

দিলে চলিবে না। যেরূপেই হউক, বালকের মনুষ্যত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীর এবং চাঁদের সূর্য্যের, অম্লজানের ও যবক্ষারজানের কতকগুলি সংবাদ আনিয়া মাথায় পূরিয়া দিলে তাহাকে শিক্ষা বলিব না। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন নহে, বালক যাহাতে স্বয়ং আপন চেষ্টায় সমর্থ হয়, তাহার বিধানের নামই শিক্ষা।

এইরূপ শিক্ষাকে ধর্ম্মবর্জ্জিত বা নীতিবর্জ্জিত শিক্ষা বলিলে চলিবে না; ঠিক্ যে উপায়ে তাহার মন শরীরে বলের সঞ্চার করিতে হইবে, ঠিক্ সেই উপায়েই এক সঙ্গে ধর্ম্মের ও নীতির বিকাশেরও চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞানশিক্ষার অথবা ধর্ম্মশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই,—আমাদের ইচ্ছা শিক্ষা যেন বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্ম্মসঙ্গত হয়। বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্ম্মসঙ্গত দুইটা বিশেষণ পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করিলাম তাহাতে কেহ যেন না বুঝেন, যে বিজ্ঞানসঙ্গত শিক্ষা একরূপ, ও ধর্ম্মসঙ্গত শিক্ষা অন্যরূপ, দুইটা দুইকালের শিক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যাহা বিজ্ঞান সম্মত তাহাই ধর্ম্মসম্মত যাহা বিজ্ঞান সম্মত নহে তাহা ধর্ম্মসম্মতও হইতে পারে না।

এইরূপ শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে? বর্ত্তমান প্রবন্ধে সকল কথার আলোচনা অসম্ভব। প্রচলিত পদ্ধতির সমালোচনা ও দোষ প্রদর্শনার্থ ই বোধ হয় চারিটা প্রস্তাব লেখা যাইতে পারে, ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি একটা গড়িয়া তুলিতে হইলে আরও দুটো প্রস্তাবে কুলায় না, তবে একটা মনের কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রথমেই আমরা শিক্ষকমহোদয়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিব, মানব সন্তান যতই দুর্ব্বল হউক তাহাকে যেন একটা গতিহীন যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা না হয়। প্রকৃতপক্ষে সে একটা জীব। অন্ততঃ একটা উদ্ভিদের পালন ও বর্দ্ধনের জন্য সচরাচর যে বিধি প্রচলিত আছে, মনুষ্য শিশুর

পালনে ও বৰ্দ্ধনে যদি সেইরূপ বিধানও অবলম্বিত হয় তাহা হইলেও আমাদের তত ক্ষোভ থাকে না।

এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, একটা সামান্য তৃণজাতীয় উদ্ভিদেরও বৃদ্ধির জন্য খানিকটা হাওয়া ও খানিকটা জল ও খানিকটা রৌদ্রের নিতান্ত আবশ্যক। যদি কেহ আঁধার গর্ত্তের ভিতর অথবা শুষ্ক বালুকার উপর বাগান তুলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা ভক্তির সহিত বন্দনা করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ পারে নাই। গাছের অঙ্কুর যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হয়, তখন যদি তাহার চারিদিকে একটা লোহার জাল পাতিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে না দেওয়া যায়,—তবে তাহার উদ্ভিদ-লীলা অচিরেই সমাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। প্রশস্ত স্থানে রসপরিসিক্ত মৃত্তিকার মধ্যে খোলা বাতাসে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহাকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দাও, ও তাহাকে আপনার আহার আপনি সংগ্রহ করিয়া আপনার অঙ্গ পোষণ করিতে দাও, ও যতদিন বাল্যকালানুগত দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন প্রবল শত্রুর ও প্রবল আপদের আক্রমণ হইতে যত্নের সহিত ও স্নেহের সহিত রক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, কিছুদিন পরেই সে আপনি পূর্ণ ও সমর্থ হইয়া শাখায় পল্লবে হরিদ্বর্ণ হইয়া উঠিবে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে; তখন আর সে তোমার সাহায্যের প্রার্থী থাকিবে না, তখন সে আত্মরক্ষার জন্য তোমার মুখাপেক্ষী হইবে না, তখন সে উন্মত্ত প্রভঞ্জনের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও স্থানচ্যুত হইবে না; স্বয়ং দূরপ্রসারী মূল বিস্তার করিয়া বসুন্ধরাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে, ও উৰ্দ্ধে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আতপতপ্ত পথিককে ছায়াদানে তৃপ্ত করিবে।

যম নিয়ম ও শাসনের কোন আবশ্যকতা নাই এ কথা আমি বলিতে চাহি না। যদি প্রস্তাবের ভাষার ভঙ্গীতে সেইরূপ কেহ বুঝিয়া থাকেন,

তাঁহার নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার এইমাত্র বলা উদ্দেশ্য যে শাসন ও সংযম সম্পূর্ণ আবশ্যক হইলেও স্বাধীনবৃত্তির একবারে সংহার সাধনটা ঠিক্ নহে। শিক্ষার্থীর অন্তঃকরণে যে সকল শক্তির অঙ্কুর হইতেছে, সেই সকল শক্তিকে একবারে আবদ্ধ ও সংযত না করিয়া স্বাধীনভাবে খেলিতে দাও, এবং যতক্ষণ সে স্বাধীনভাবে খেলা করিতে থাকিবে ততক্ষণ একটু দূরে ও অন্তরালে দণ্ডায়মান থাক। যদি তাহাকে পথভ্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে দেখ তখনই সময় নষ্ট না করিয়া সাবধান করিয়া দাও; মুখের কথায় ফল না হইলে তীব্রতর শাসনের ব্যবস্থা কর। কিন্তু যখন বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইবে, তখনও যেন তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় বলিয়া ভ্রম জন্মিতে না পারে। এ কথাটা মনে রাখিবে যে, জননীর পীযূষপূর্ণ স্তন্য ধারাতেই তোমার জড়দেহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, কারাগৃহের নিয়মের মধ্যে তোমাকে বাস করিতে দিলে তোমার গুরুত্ব প্রাপ্তির অবকাশ ঘটিত না।

বাস্তবিকই নবাগত মানবশিশুর চোখের সম্মুখের এত বড় সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বসুন্ধরাটা বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাতে দেখিবার বিষয় কত আছে। শিশুর সহিত যখন তাহার ভবিষ্যতের বাসভূমির প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন সকলই তাহার নিকট নূতন ও নূতনত্বের রহস্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। কত আগ্রহের সহিত কত ঔৎসুক্যের সহিত সে সেই নূতন পরিচিতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য চেষ্টা পায় এবং সম্বন্ধ স্থাপনে যে একটু সফলতা লাভ করে তাহাতে তাহার কত আনন্দ উপস্থিত হয়। এমন সময়ে তুমি যদি তাহার ও জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা দিতে চাও, ও তাহার সেই আনন্দের প্রতিরোধী হও, তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড; তুমি যদি সেইরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি ঘোর মূর্খ।

তোমার এস্থলে কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে। তুমি যদি বেত্রহস্তে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হও ও মুক্ত জগতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করা নিষেধ করিয়া তোমার কাল্পনিক জগতের একটা মিথ্যা ছবি কেবল তোমার বাক্যের উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যালঙ্কারে সংযত করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুঝিব তোমার কর্ত্তব্যবোধ হয় নাই। তুমি তাহাকে স্বাধীনভাবে জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে দাও; নিত্য নূতন সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহার ইন্দ্রিয় পঞ্চকের সম্মুখে স্থাপিত কর, তুমি তাহার হইয়া দেখিও না বা দেখাইয়া দিও না, সে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দেখিতে থাকুক। তাহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক পেশী জাগতিক বিবিধ পদার্থের স্পর্শে আসিয়া পরিচালিত হউক ও বৃদ্ধিলাভ করুক ও পুষ্টিলাভ করুক। তুমি গুরু মহাশয়ের ও উপদেষ্টার কঠোর মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া সহচরের মত ও বন্ধুর মত তাহার পাছে পাছে চলিতে থাক। তাহার চিত্ত যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে না পারে; খাদ্য সামগ্রীর অভাবে যেন তাহার পাকস্থলীর নিষ্কর্ম্মা হইবার অবসর না ঘটে অথচ দুষ্পাচ্য ও গুরুভার পদার্থের ভারে যেন পাকস্থলী অবসন্ন হইয়া না পড়ে। সে স্বয়ং দেখিবে, স্বয়ং শুনিবে, স্বয়ং স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিবে; এবং পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিবিধ পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে থাকিবে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দেখিবে; সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিবে, পাঁচবার বা প্রতারিত হইবে এবং প্রতারিত হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রতারিত হইতে দিবে; যে কখন সংসারের মধ্যে প্রতারিত হয় নাই তাহার ভাগ্যের আমি প্রশংসা করি না। সে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হউক তাহাকে প্রতারিত হইতে দেখিয়া তুমি দয়া করিবে না; কেবল আশার বাক্যে, উৎসাহের বাক্যে ও স্নেহের বাক্যে তাহার মনে

আগ্রহের ও প্রীতির ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার কর। সে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হউক ও অবশেষে সফলতা লাভ করিয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকুক; তুমি তাহার আনন্দে আনন্দ দেখাও, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হও, তাহার মনে উৎসাহের শক্তি আরও উদ্দীপিত করিয়া দাও। ইহারই নাম বিজ্ঞানশিক্ষা, ইহারই নাম সাহিত্যশিক্ষা, ইহারই নাম ধর্ম্মশিক্ষা। শারীরিক ও মানসিক ও নৈতিক ত্রিবিধ শিক্ষাই একই প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে। যাহাতে শরীরে বল আসিবে, তাহাতেই চিত্তে স্ফূর্ত্তি জন্মিবে, তাহাতেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ইহারই নাম আবার হাতে-কলমে শিক্ষা; যে ঠেকিয়া না শেখে তাহার হাতে-কলমে শিক্ষা হয় না।

আমার বিবেচনায় এই মূল সূত্রটি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যকালে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে কিরূপ বিশেষ বিধান ও বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে, এস্থলে সে সকল বিশেষ বিধির অবতারণায় প্রবৃত্ত হইব না।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে বিশেষ কোন নূতন তত্ত্বের উল্লেখ হইল তাহা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় সকলেই প্রায় এক রকম কথাই বলিয়া থাকেন, তবে প্রয়োগের সময় আর মূল সূত্রের অনুসারে কার্য্য হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা বক্তৃতার সময় শিক্ষা সম্বন্ধে নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যমালা সাজাইয়া বলেন, তাঁহারাই আবার প্রয়োগের সময় ঠিক বিরোধী নীতি অবলম্বন করেন।

আজকাল আমাদের শিক্ষা-বিভাগের বালকদের ডিসিপ্লিনের একটা ধূয়া উঠিয়াছে। বাজারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বস্তুতঃই ডিসিপ্লিনের ব্যবস্থা

একটু সুচারু না থাকিলে জীবনযাত্রা অচল হয়। কিন্তু তথাপি ডিসিপ্লিন কথাটা শুনিলেই মনে কেমন একটা ব্যথা লাগে। সেনা নিবাসে, পুলিশের থানায় ও কারাগারে ডিসিপ্লিনের কঠিন বন্দোবস্তের দরকার বুঝিতে পারি; কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলিও কি কাল মাহাত্ম্যে ঐ সকল স্থানের সহিত ক্রমে পর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে? কর্তৃপক্ষেরা এ ঘটনা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অন্যান্য দেশে ব্যবস্থা কিরূপ জানি না, কিন্তু আমাদের সে কালে চতুষ্পাঠীতে শান্তি-রক্ষার জন্য ও নীতি রক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগের কোন দরকার ছিল, বোধ হয় না। মনুসংহিতাতেও ব্রহ্মচারীর কঠোর সংযম অভ্যাসের বিধি আছে; কিন্তু বিধির অপালনে দণ্ডবিধানের পারুষ্য দেখি না। অথবা মনুসংহিতার মহিমান্বিত ব্রহ্মচর্য্যের কথা এস্থলে উত্থাপন করিয়াই আমি কেন অকারণে পাতকগ্রস্ত হইতে বসিয়াছি?

শিক্ষার প্রণালী যেমনই হউক না কেন, আনন্দ ও আগ্রহ ও উৎসাহ যদি তাহার আনুষঙ্গিক না হয় তবে তাহাকে যে শিক্ষা নাম দিতে চাহে সে মূর্খ, সে পাষণ্ড, সে নাস্তিক। অভিধানে বাছিয়া আমি তাহার উপযুক্ত বিশেষণ সংগ্রহে অসমর্থ। আজকাল হিপ্নটিজম্ বিদ্যার সমালোচনায় যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে এই কথারই সমর্থন করে। মনুষ্যের চিত্তের মত নমনীয় কোমল পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শিক্ষার কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল বেত্রাঘাত ও শাসন ও ভয় প্রদর্শন ও নৈরাশ্য সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া মানসিক উৎকর্ষ জন্মাইবার আশা কেবল বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। পক্ষান্তরে স্নেহের বাণী ও আশার বাণী দুর্ব্বল হস্তেও বল প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। স্পন্দহীন হৃৎপিণ্ডকে উত্তেজিত করিতে পারে, স্নায়ুর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ

সঞ্চারিত করিয়া নির্জীব দেহেও জীবনের সঞ্চার করিতে পারে। এ সকল স্থূল কথা ও সহজ কথা; অথচ কেহ বুঝিবে না, হা হতোঽস্মি। হা দগ্ধোঽস্মি!

ব্যক্তিগত শিক্ষার সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল, জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধেও সেই কথা আরও জোরের সহিত বলা যাইতে পারে। এবং আরম্ভ করিলে কথাও বোধ হয় ফুরাইবে না। প্রবন্ধান্তরে সে কথার আলোচনার চেষ্টা করিব।

১৩০৫, জ্যৈষ্ঠ

রাষ্ট্র ও নেশন্।

বিংশ শতাব্দীতে যুগধর্ম্ম—রাষ্ট্র ও নেশন্ এই দুই ঐতিহাসিক পদার্থ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিয়াই এই যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বঙ্গদর্শনের অতীত জীবনের সহিত অসঙ্গত নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ভারতবর্ষে এই দুইটি পদার্থেরই কোন কালে অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবোদ্দিন ঘোরিকে যদি ভারতবর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রের সম্মুখীন হইতে হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। এবং ভারতবর্ষে নেশন্ থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসও কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না।

অধ্যাপক সীলী বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেশন্ নাই; কিন্তু এমন বীজ হয়ত আছে, যাহা হইতে কালে নেশন্ অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে। এই কারণে রাষ্ট্র কাহাকে বলে ও নেশন্ কাহাকে বলে, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু বুঝা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নেশনের লক্ষণ সম্বন্ধে রেণার মত বঙ্গদর্শনে সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি অবহিত ভাবে উহা পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন, এক কথায় নেশনের সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। রাষ্ট্র আশ্রয় করিয়া নেশন্ উৎপন্ন হয়; কিন্তু রাষ্ট্র মাত্রেই নেশন্ জন্মে না। ইউরোপ খণ্ডে রুষিয়া প্রবল প্রতাপ রাষ্ট্র; কিন্তু রুষীয় জাতিকে নেশন্ বলা যায় কি না সন্দেহ।

নেশন্ বলা যায় না, কেননা, রুষিয়া নামে মহারাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ন্তা

সর্ব্বতোমুখী রাজশক্তি। এই রাজ-শক্তি প্রজা-শক্তির একবারে মুখাপেক্ষা করে না। প্রজা-শক্তি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, রাজ-শক্তিকে সমর্থন করে না।

যেখানে রাজ-শক্তিতে ও প্রজা-শক্তিতে এইরূপ বিচ্ছেদ নাই, সেইখানেই নেশন্ মূর্ত্তিমন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইউরোপে ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ এবং আমেরিকায় মিলিত রাষ্ট্রের প্রজাগণ নেশনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহুদিন পূর্ব্বে সেখানেও নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। তবে ইউরোপের সমাজক্ষেত্রে বহুদিন পূর্ব্বে এমন বীজ উপ্ত হইয়াছিল, যাহা হইতে বিবিধ নেশন্ অঙ্কুরিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছে।

ইটালী নেশন্ ও জার্ম্মাণ নেশন্ প্রকৃতপক্ষে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্ব প্রধান ঐতিহাসিক সৃষ্টি।

সংক্ষেপে নেশনের লক্ষণবিবৃতি চলে না, যদি নিতান্তই সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা হইলে নেশন্ অর্থে আমরা সুগঠিত, সংহত, শরীরবদ্ধ মানব-সমাজ বুঝিব। ঐ সমাজ-শরীর সর্ব্বদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিয়া আপনার স্বার্থ অর্থাৎ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট; শত্রু হইতে আত্ম-রক্ষণে ও পরের বিরুদ্ধে আত্ম প্রসারে সর্ব্বদাই উন্মুখ, উহার প্রত্যেক অঙ্গ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য একযোগে কাজ করে; এক অঙ্গে আঘাত দিলে অন্য অঙ্গ হইতে আর্ত্তধ্বনি উদ্গত হয়; এবং সমগ্র শরীরের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক অঙ্গ আপনার সঙ্কীর্ণ মঙ্গল পরিহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সমগ্র নেশনের শক্তিকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায়, নেশনের রাজশক্তির মূল প্রজা-শক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ও প্রজাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান। প্রজাশক্তি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র রাজশক্তির মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নপর।

এবং যে প্রজাসঙ্ঘ লইয়া নেশনের শরীর, সেই প্রজাসঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীন

মঙ্গল সাধনার্থই রাজশক্তি বর্তমান। রাজশক্তির অস্তিত্বের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

গজনীপতি মামুদ যখন সোমনাথ মহাদেবের মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দু-সমাজের সকলে সেই অত্যাচার কাহিনীর সংবাদ রাখাও কর্তব্য বোধ করে নাই। মহারাণা প্রতাপসিংহ যখন একাকী সিংহ বিক্রমে দিল্লীশ্বরের সহিত যাবজ্জীবন সংগ্রাম করিয়াও আপনার উন্নত মস্তক অবনত করিতে স্বীকৃত হন নাই, ভিন্ন প্রদেশের ভারত সন্তানের শীতল শোণিত তখন উষ্ণ হয় নাই; মারাঠা সৈন্য যখন উত্তর কালে দিল্লীশ্বরের প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়াইত, তখন সেই প্রজাগণের স্বজাতিত্ব ও স্বধর্ম্মত্বের কথা মনেও স্থান দেয় নাই।

তাহার অর্থ, ভারতবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড পুরাতন হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু হিন্দু নেশনের অস্তিত্ব ছিল না, হিন্দু সমাজের একাঙ্গের ব্যথা অপর অঙ্গ অনুভবে সমর্থ ছিল না।

আবার চৌহানপতিকে আক্রান্ত ও বিপন্ন দেখিয়া রাঠোর রাজ যখন হাস্য করিতেছিলেন; এবং মুসলমান হস্তে মগধ রাজ্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও পার্শ্ববর্ত্তী বাণরাজ যখন পলায়নের শুভ মুহূর্ত্ত নিরূপণার্থ পঞ্জিকা দেখিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে খণ্ডরাষ্ট্র ছিল ও খণ্ডরাষ্ট্র মধ্যে কুলের ও কুলপতিগণের মর্য্যাদা ছিল, কিন্তু ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র ব্যাপী মহা নেশন্ ছিল না।

অতি প্রাচীনকালে এই সকল খণ্ডরাষ্ট্রে রাজশক্তি এক বংশ হইতে বংশান্তরে সংক্রান্ত হইত, এক কুল হইতে কুলান্তরে সংক্রান্ত হইত, প্রজাসঙ্ঘ উদাসীনের মত চাহিয়া দেখিত। শাসনদণ্ড মৌর্য্যের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া মিত্রের হস্তে, মিত্রের হস্ত হইতে সুঙ্গের হস্তে,

সুঙ্গের হস্ত হইতে অন্ধ্রের হস্তে সঞ্চালিত হইত, মৌর্য্য ও মিত্র ও সুঙ্গ ও অন্ধ্রের প্রজাপুঞ্জ তাহাতে সুখ দুঃখের কোন কারণ দেখিত না। উত্তর কালে হিন্দুরাজার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড মুসলমানের হস্তে, মুসলমানের শাসন হইতে খ্রীষ্টানের হস্তে গিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজাগণ এই সকল রাজ-বিপ্লবকে নৈসর্গিক বিপ্লবের ন্যায় অকাতর সহিষ্ণুতা সহকারে গ্রহণ করিয়াছে; স্বয়ং এই বিপ্লব ঘটনায় অনুকূলে বা প্রতিকূলে দাঁড়াইবার কর্ত্তব্যতা মনে স্থান দেয় নাই। ইহার অর্থ—ভারতবর্ষে প্রজাশক্তি কখনও রাজশক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উহাকে বলবতী করে নাই; রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; ভারতবর্ষে কখনও নেশন্ ছিল না।

ভারতবর্ষে নেশন্ ছিলনা বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস এইরূপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইউরোপেও এককালে নেশন্ ছিল না। ইউরোপের নেশনের উৎপত্তির ইতিবৃত্তি আলোচনা করিলে, ভারতবাসীর কতকটা আশ্বাস না হউক, কতকটা শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে, সন্দেহ নাই।

সামাজিক একতা, নেশন্ গঠনের সাহায্য করে; কিন্তু এই একতা কোথায়? বাহির করা দুষ্কর, ব্রিটিশ দ্বীপ মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন, ব্রিটিশ দ্বীপে সংহত নেশনের উৎপত্তি হইয়াছে বুঝা যায়। জাতিগত একতা পূর্ণমাত্রায় নাই; তবে অধিকাংশ ব্রিটিশ প্রজা সাক্সন্ বংশধর বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। ভাষাগত একতা ছিল না, তবে ইংরাজি ভাষার প্রচারে অন্যান্য ভাষা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধর্ম্মগত একতা অনেকটা আছে; এককালে সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে একই বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, ধর্ম্মগত ঐক্যের অপেক্ষা আচারগত ঐক্য অধিক আছে; আর সকলের উপর আছে, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সমস্ত প্রজা এক রাষ্ট্রতন্ত্রের তুল্যরূপে অধীন। এই সমস্ত ঐক্যের ফলে বৃটিশ নেশন্; বহু শত

বৎসর ব্যাপিয়া ইহার জীবন এক টানে উন্নতির মুখে চলিয়াছে। এই ঐতিহাসিক প্রাচীনতা প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজার আর একটা গৌরবের কথা—আর একটা ঐক্য-সাধন-বন্ধন।

আইরিশ জাতির বাসভূমি ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন; তদ্ভিন্ন জাতিগত ভাষাগত ও ধর্ম্মগত অনৈক্য বর্ত্তমান; সকলের উপরে আইরিশ জাতি আপনাদের পরাজয়ের ও অপমানের কাহিনী এখনও ভুলিতে পারে নাই; ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও তাহা ভুলিবার অবসর দেন নাই, এখানে রাষ্ট্রীয় একতা সত্ত্বেও আইরিশ জাতি ব্রিটিশ নেশনের কলেবরে মিশিতে পারে নাই।

ফরাসী দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখা প্রায় চারিদিকেই স্পষ্ট, কেবল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সুচিহ্নিত সীমা নাই। সেই দিকেই গোল।

আইবিরীয় ও কেল্ট ও জার্ম্মাণ একত্র মিশিয়া ফরাসী জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক ফরাসীর দেহে বোধ হয় তিনের রক্তই বর্ত্তমান। ধর্ম্মগত, আচারগত, ভাষাগত, একতা অনেকটা বর্ত্তমান আছে। ফরাসী সাহিত্যের ও ফরাসী বিজ্ঞানের গৌরবে ফরাসী মাত্রই অধিকারী। আর একটা একতা প্রতিবেশী জার্ম্মাণের প্রতি বিদ্বেষে। ফরাসীর প্রাচীন ইতিহাস জার্ম্মাণের পরাজয় কাহিনী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া ফরাসীর ঐক্য-বার্ত্তা ঘোষণা করে। এই সকল ঐক্যের ফলে ফরাসী নেশন্।

তারপর জার্ম্মাণ নেশন্। এই জাতিতে বংশগত বিশুদ্ধি যতটা আছে, ততটা অন্য জাতিতে আছে কিনা, সন্দেহ। জার্ম্মাণের শরীরে পুরাতন রোম সাম্রাজ্যের বিপ্লাবক টিউটনের রক্ত প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান বলিয়া জার্ম্মাণ শ্লাঘা করেন। তদুপরি ভাষাগত, আচারগত ঐক্যতাত আছেই। তথাপি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ নেশন্ ছিলনা। জার্ম্মাণ নেশন্ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের সৃষ্টি।

জার্ম্মাণ নেশন্ জমাট বাঁধিতে এত সময় লাগিবার কারণ কি? যে

একতাবন্ধনে নেশনের উৎপত্তি সেই একতা জার্ম্মাণ জাতি মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তথাপি জার্ম্মাণ নেশন জমাট বাঁধে নাই। ইহার অর্থ আলোচনার যোগ্য।

প্রথমেই দেখা যায় জার্ম্মাণির সুনির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। উত্তরে ডেনমার্কের ও হলণ্ডের লো জার্ম্মাণ। পশ্চিমে ফরাসী, দক্ষিণে হাঙ্গেরীয়ান্ ও তুর্কি; পূর্ব্বে শ্লাব জাতি, এই বিভিন্ন ভাষী বিভিন্ন জাতির মধ্যে জার্ম্মাণের বাস। কোন উন্নত পর্ব্বত প্রাচীর বা কোন সাগর শাখা ব্যবধান স্বরূপ হইয়া জার্ম্মাণের ভৌগলিক সীমা রেখার নির্দ্দেশ করে নাই। জার্ম্মাণ ঠিক জানেনা, উত্তরে ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে ও পূর্ব্বে কোথায় উহার বাসভূমির শেষ, কোন্ রেখা পার হইয়া সে পদার্পণ করিবে না। তাহার প্রতিবেশীরাও জানেনা, কোন্ রেখা পার হইলে জার্ম্মাণের স্বদেশে অনধিকার প্রবেশ ঘটিবে, ফলে পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন জাতি জার্ম্মাণকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া ঐ দেশকে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এই অবিরাম সংগ্রামের তুমুল কোলাহলে ইউরোপের মধ্য যুগের ইতিহাস মুখরিত হইয়া রহিয়াছে।

নৈসর্গিক সামান্তরেখার অভাবে জার্ম্মাণও পুনঃ পুনঃ পররাষ্ট্র ও পরজাতিকে আক্রমণ করিয়াছে। শান্তির অভাবে জার্ম্মাণ জাতি জমাট বাঁধিতে অবসর পায় নাই।

এই নৈসর্গিক কারণ ছাড়া আর একটা ঐতিহাসিক কারণ দেখা যায়। সেই কারণ অনুসন্ধানে রোমসাম্রাজ্যের পতন কালে যাইতে হয়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় জার্ম্মাণ জাতি বিবিধ কুলে বিভক্ত ছিল। এক একটা কুল রোম সাম্রাজ্যের এক একটা প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। ফ্র্যাঙ্ক, গথ, লম্বার্ড প্রভৃতি কুলের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই সকল বিভিন্ন কুলের পরস্পর সম্প্রীতি ছিল না। উহাদের পরস্পর

বিরোধ জার্ম্মাণ জাতির সংহতির পক্ষে এককালে প্রধান অন্তরায় ছিল, কুলপতিগণের পরস্পর বিরোধ জার্ম্মাণ জাতিকে বহুদিন সংহত হইতে দেয় নাই।

কালক্রমে এই কুলগত বিরোধ লোপ পাইয়াছিল; কিন্তু আর একটা বিরোধ আসিয়া পড়ে। রোম সম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া কুলপতিগণ আপনাদের অনুগত অনুচরগণকে ভূমি বণ্টন করিয়া দেন। এই অনুচরগণের এক এক জন এক এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের ভূস্বামী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। রোম সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে সম্রাট্-পদবী একটা কুলবিশেষে ও বংশবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্রাট্ স্বয়ং প্রাদেশিক পরাক্রান্ত ভূস্বামীগণের একান্ত অধীন হইয়া পড়েন। এইরূপে ইউরোপের ফিউডাল তন্ত্রের উৎপত্তি হয়। জার্ম্মাণ-রাজ রোমক সম্রাট্ নামে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু কাজে এই সকল খণ্ডরাষ্ট্রের অধিপতি পরাক্রান্ত সামন্তবর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন মাত্র। খণ্ডরাষ্ট্রগুলি চিরদিন ধরিয়া পরস্পর বিবাদ করিত; সম্রাট্ সেই বিবাদ নিবারণে একান্ত অসমর্থ ছিলেন। কালক্রমে ধর্ম্মগত বিবাদ এই রাষ্ট্রগত বিবাদের সহিত যুক্ত হইয়া আগুন আরও জ্বালাইয়া তুলে, প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক জার্ম্মাণরাষ্ট্রপতিগণ বিকট ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই অগ্নিকাণ্ডে জার্ম্মাণরাষ্ট্রতন্ত্র এককালে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

রোমক সম্রাটের পদবী কালক্রমে হাক্‌স্‌বর্গ বংশে আবদ্ধ হইল; হাক্‌স্‌বর্গ বংশধরগণ বহুদিন ধরিয়া সমগ্র খৃষ্টীয় জগৎকে রোম সম্রাটের শাসনাধীন রাখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র-পতিগণের একতা সাধনে সমর্থ হন নাই। নেপালিয়ন বোনাপার্টির অভ্যুদয়ে রোম সাম্রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল; কিন্তু সেই ফরাসী সংঘর্ষের

তুমুল বিপৎপাতও জার্ম্মাণির একতা সাধনে সমর্থ হয় নাই। একতা সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু জার্ম্মাণ জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এই একতা বন্ধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। নূতন সৃষ্টি জার্ম্মাণ-সাহিত্য ও জার্ম্মাণ-দর্শন ও জার্ম্মাণ-বিজ্ঞান, এই একতা লাভের জন্য জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র সকলকে একস্বরে আবাহন করিতেছিল। হাব্‌স্‌-বর্গ বংশধর রোম সম্রাটের উপাধির মায়া কাটাইয়া অস্ট্রিয়া সম্রাট রূপে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতিগণের উপর নাম মাত্র প্রাধান্যে তৃপ্ত রহিলেন। কিন্তু সেই প্রাধান্য পরিচালনায় তাঁহার শক্তি ছিল না। সহসা উদ্ধত প্রুসিয়া রাজ্য বিস্‌মার্কের মন্ত্রণাশক্তিতে পরিচালিত হইয়া অস্ট্রিয়া-পতিকে জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র-তন্ত্র হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দিল; এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের অদূরদর্শিতার ফলে ফরাসী বিগ্রহের সুযোগ আশ্রয়ে, জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জার্ম্মাণ নেশনের সৃষ্টি করিল। এই বিস্ময়কর ঘটনার পর সংহত জার্ম্মাণ নেশন্ ইউরোপ খণ্ডে উন্নত মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে; এবং ধরাপৃষ্ঠে আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিয়া দর্পের সহিত জার্ম্মাণ নেশনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। জাতিগত, ভাষাগত ও আচারগত একতায় ধর্ম্মগত অনৈক্য লোপ করিয়াছে। এবং স্বার্থের ঐক্য ও ফরাসী বিদ্বেষের সাধারণ ঐক্য সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া নৈসর্গিক সীমান্ত রেখার অভাব মোচন করিয়াছে।

ধর্ম্মগত, জাতিগত, আচারগত ও ভাষাগত একতা নেশন্ বন্ধনে সাহায্য করে, সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ ও ফরাসী ও জার্ম্মাণ জাতির নেশন্-বন্ধনে এই একতা সাহায্য করিয়াছে, অস্ট্রিয়া রাজ্য জার্ম্মাণ রাষ্ট্র-সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও মুখ্যত এই ঐক্যের অভাবেই নেশনে পরিণত হইতে পারে নাই। অস্ট্রিয়া রাজ্যে জার্ম্মাণ ও স্লাব ও তুরাণিক,

তিন বিভিন্ন জাতির নিবাস ; তাহাদের মধ্যে শোণিতের ভেদের সঙ্গে ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

সেই জন্য এই বিভিন্ন জাতি জমাট বাঁধিয়া একটা পরাক্রান্ত নেশনে পরিণত হইতে পারিতেছে না; এবং এই অনৈক্যজাত দুর্ব্বলতার জন্যই অস্ত্রিয়াপতি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিশ্রুতি সত্ত্বেও জার্ম্মাণ জাতির নেতৃত্ব পদ হইতে বহুশত বৎসর পরে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। ভাষাগত ও আচারগত ও ধর্ম্মগত, ও কিয়ৎপরিমাণে জাতিগত ঐক্য ছিল বলিয়াই বিবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপতির দ্বন্দ্বক্ষেত্র ইতালী ভূমিতেও এতদিনে নেশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সকল একতা ছাড়িয়া স্বার্থগত একতা। ইংরাজ জাতি স্কচ ও ওয়েল্‌সের ভাষাভেদ ও জাতিভেদ সত্ত্বেও উহাদের সহিত একত্রে মিশিয়া নেশনে পরিণত হইয়াছে। তাহার কারণ স্কচের স্বার্থ ও ওয়েল্‌সের স্বার্থ সম্প্রতি ইংরাজের স্বার্থের সহিত অভিন্ন। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহ যে এতকালে বিসংবাদ ভুলিয়া একতা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ—ফরাসীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। ইতালির নেশনত্ব প্রাপ্তির মূলেও সেই শত্রু হইতে আত্মরক্ষণরূপ সাধারণ স্বার্থ বিদ্যমান। এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ও সাধারণ স্বার্থের একতা অন্তর্বিধ অনৈক্যকে পরাভূত করিয়াছে। জার্ম্মাণীর নিকট পরাভবে সাধারণ স্বার্থে আঘাত পাইয়া ফরাসী জাতির নেশনত্ব আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজের সহিত বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষে জার্ম্মাণ জাতির সাধারণ স্বার্থে আঘাত সম্ভাবনায় জার্ম্মাণ জাতির নেশনত্ব ক্রমেই সংহত হইতেছে। এই সাধারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের একতায় সকল বিভেদকে ডুবাইয়া দিয়া নেশনের সৃষ্টি করে। এই রাষ্ট্রীয় একতাই সর্ব্ববিধ অনৈক্যকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে

বলিয়া ব্রিটিশ দ্বীপের অধিবাসী মাত্রেই আজি, তুল্য রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে ও সকলেই আপনাকে ব্রিটিশ নেশনের অঙ্গীভূত জানিয়া গৌরব বোধ করিতেছে। এই কারণেই আমরা ভারতজাত, পার্শীকে ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টে দেখিতে পাইয়াছি। এই কারণেই ইহুদীর হস্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন দণ্ডের পরিচালনা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই; ইহুদী বল, আর পার্শী বল, আর মুসলমান বল, আর খ্রীষ্টাণ বল, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ব্রিটিশ রাজার ব্রিটনবাসী প্রজামাত্রই প্রকাণ্ড ব্রিটিশ নেশনের অঙ্গীভূত; ও সেই ব্রিটিশ নেশনের মাহাত্ম্য রক্ষায় যত্নশীল।

ধর্ম্মগত, ভাষাগত, জাতিগত ঐক্য নেশন্ বন্ধনে আনুকূল্য করে। এই খানেই নেশন্‌রূপ মহাবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গমের বীজ। ইহার উপর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ঐক্য থাকিলে সেই মহাবৃক্ষ সহজে পুষ্টিলাভ করে ও বৃদ্ধিলাভ করে। স্বার্থের ঐক্য অন্যান্য বিষয়ে সামান্য অনৈক্যকে নষ্ট করিয়া নেশন্-শরীর গড়িয়া তুলে। আর যেখানে রাষ্ট্রীয়-স্বার্থের আকর্ষণ, ধর্ম্মগত বা আচারগত বা ভাষাগত অনৈক্যের বিকর্ষণে পরাভূত হয়, সেখানে নেশনের উৎপত্তি ঘটে না।

কিন্তু কেবল স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইলেই নেশন্ হয় না। বর্ত্তমান কালে রুশিয়ার মত স্বার্থরক্ষণে সমর্থ মহারাষ্ট্র কোথায়? কিন্তু রুশিয়া মহারাষ্ট্র মাত্র? রুশিয়ায় নেশন্ নাই। নেশন্ নাই, কেননা, এখানে রাজশক্তি প্রজাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন। দোর্দ্দণ্ড রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে সংযত ও নিয়মিত করে; কিন্তু প্রজাশক্তির উপর উহার প্রতিষ্ঠা নাই। রাজা ও প্রজা জনসমাজের দুই প্রধান অঙ্গ; যেখানে দুই অঙ্গের বিচ্ছেদ, যখন একের ব্যথায় অন্যে কাতর হয় না, যখন একে আঘাত পাইলে অন্যে সাড়া দেয় না, সেখানে নেশন্-শরীর বর্ত্তমান নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে খণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু সেই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সমবেদনার আত্মীয় বন্ধন ছিল না। ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র স্থাপনের অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র ত ছিল না; আবার নেশন্ও ছিল না; কেননা, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। রাজশক্তির অভ্যুদয়ে বা পরাভবে প্রজাশক্তি চিরদিনই উদাসীন ছিল। কাজেই ভারতবর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রও ছিল না, ভারতব্যাপী নেশন্ও ছিল না।

সম্প্রতি ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ সাম্রাজ্যপতির ছত্রতলে ব্রিটিশ প্রজা ও ব্রিটিশ সম্রাটের সামন্ত ভূপতিগণ আশ্রয় লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রের সৃজন করিয়াছে। রুশিয়া সম্রাট্ দূর হইতে ইহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহার সাহস হয় না, এই মহারাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন। কাজেই ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রের এখন অস্তিত্ব আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে অদ্যাপি নেশন্ সৃষ্টি হয় নাই। কেননা, ভারতে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোন দৃঢ় বন্ধন নাই।

প্রজাশক্তির উপর রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রজাশক্তি রাজশক্তির সহায় নহে; রাজশক্তিকে প্রজাশক্তি বিনীত ভাবে ভয় করে ও ভক্তি করে, কিন্তু ভালবাসে না ও আপনার আত্মীয়রূপে জানে না। যতদিন এই উভয় শক্তির মধ্যে একাত্মতা না জন্মিবে, ততদিন ভারতবর্ষে নেশনের সৃষ্টি হইবে না। যদি কালক্রমে একাত্মতার উৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে নেশনের উৎপত্তিও অসম্ভব।

বর্ত্তমান কালে আমাদের রাজশক্তি বৈদেশিকের হস্তে; কাজেই রাজায় প্রজায় মমত্ব-বন্ধনের অভাব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু যখন

রাজশক্তি দেশীয় রাজার হাতে ছিল, তখনও এই রাজায় প্রজায় মনত্বের বন্ধন কেন ছিল না, বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়ে।

মুসলমান আক্রমণ কালে ভারতবর্ষে একতার অভাব বেশ বুঝা যায়। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একতার অভাব, ভারতবর্ষের পতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের একতার অভাব, পতনের প্রধান কারণ বটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজার সহিত প্রজার ঐক্য-বন্ধনও অন্যতর প্রধান কারণ, তাহা ঐতিহাসিকেরা সর্ব্বদা লেখেন না। ভারতবর্ষে রাষ্ট্ররক্ষার কাজ চিরদিনই রাজার হাতেই অর্পিত আছে। রাজা আপনার সৈন্য সামন্ত লইয়া শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু প্রজা তাহার সাহায্য কারত, এরূপ প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় না। রাজা যাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন—প্রজা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। রাজার সহায়রূপে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দাঁড়ান কর্ত্তব্য বোধ করে নাই; অথবা রাজার পরাজয়ের পর স্বয়ং আক্রমণকারীকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস। এখানে রাজায় রাজায় চিরকাল যুদ্ধ হয়। প্রজা উদাসীন হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, এবং যে জয়লাভ করে, তাহার নিকট অকাতরে আত্মসমর্পণ করে।

ইউরোপের ইতিহাস অন্যরূপ। বোনাপার্টি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন, এই আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্র ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে ভলন্টিয়রের খাতায় নাম লেখাইয়াছিল। সিডান ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিন আত্মসমর্পণ করিবার পরও ফরাসী প্রজা জার্ম্মাণের সহিত যুঝিয়াছিল। সেদিন বুয়র যুদ্ধে ইংরাজের রাজশক্তি কয়েকবার আঘাত পাইবামাত্র ব্রিটিশ প্রজা দলে দলে সমুদ্র পারে দেহ পাতের জন্য ছুটিয়াছিল।

সেকালে ভারতবর্ষ শত খণ্ডে শত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইহাতে বিস্মিত হইবার বড় কারণ নাই। ইংরাজদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, ফরাসীদের মধ্যে কেমন ঐক্য আছে, জার্ম্মাণেরাও এতকাল পরে ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে; আর ভারতবাসীরা এক হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াও ঐক্য-বন্ধন লাভ করে নাই; এজন্য ভারতবাসীকে তিরস্কার করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের কোন একটা দেশের তুলনা ঠিক সঙ্গত নহে। বরং সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা হইতে পারে। আয়তনে বা লোক সংখ্যায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ মহাদেশেরই তুলনা হয়; ইউরোপের অন্তর্গত কোন দেশেরই তুলনা হয় না। রোম সম্রাট্ সমগ্র ইউরোপকে একচ্ছত্র করিতে পারেন নাই।

দুই সহস্র বৎসর চেষ্টার পর সেই চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপ খৃষ্টাণ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু এক হয় নাই। প্রায় সমগ্র ইউরোপ রোমের সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তথাপি সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই। তখন ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড দেশ, যাহা আয়তনে ইউরোপ অপেক্ষা অধিক ছোট নহে, যাহার লোক সংখ্যা ইউরোপের সমান, যাহার ভিতরে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ আচারভেদ প্রভৃতি ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশী, সেই প্রকাণ্ড দেশের সমগ্র অধিবাসী যে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটা বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বরং ইউরোপের মধ্যে যেরূপ জাতি-বিদ্বেষ ও ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বর্ত্তমান, ভারতবর্ষের মধ্যে সেইরূপ জাতি-বিদ্বেষ বা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ কোনও কালে ছিল না।

ইংরাজ ও ফরাসী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ, জার্ম্মাণ ও রুশ, ইংরাজ ও রুশ ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষের মাত্রা অত্যন্ত

তীব্র। বাঙ্গালী ও বেহারী, বেহারী ও পাঞ্জাবী, মারাঠা ও রাজপুত, ইহাদের মধ্যে সেইরূপ তীব্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা কোনও কালেই ছিলনা। আবার ইউরোপে প্রোটেষ্টাণ্ট ও কাথলিকের মধ্যে যেইরূপ বিদ্বেষ, মারামারি, রক্তারক্তি ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে, শাক্তে শৈবে বা শাক্তে বৈষ্ণবে, এমন কি হিন্দু বৌদ্ধেও, সেইরূপ রক্তারক্তি ব্যাপার কখনও ঘটে নাই; বোধ করি, এইরূপ ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বভাব বহির্ভূত।

ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে, ঐক্যের অভাবে ভারতবাসীকে তিরস্কার করা উচিত হয় না।

সমগ্র ইউরোপ এক হয় নাই। উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র খণ্ডরাষ্ট্রগুলি জমাট বাঁধিয়া এক একটা মহাপ্রতাপ নেশনে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ এক মহারাষ্ট্রে পরিণত না হইয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হইত, তাহাহইলেও ভারতবর্ষের পতন অনিবার্য্য না হইতেও পারিত।

এই জন্য আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় অনৈক্য। বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যের অস্তিত্ব পতনের একটা প্রধান কারণ হইলেও প্রধানতম কারণ নহে। ভারতবর্ষ ইউরোপের মত বহুরাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও ভারতবর্ষের পরাধীনতা অনিবার্য্য হইত না। ভারতবর্ষের পতনের কারণ যে উহার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নেশনে পরিণত হয় নাই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অনৈক্যত ছিলই, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র মধ্যে প্রজা-শক্তি রাজ-শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজ-শক্তি প্রজা-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। প্রজা-শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় রাজ-শক্তি সম্যক্‌রূপ সামর্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। রাজার সুখ দুঃখে প্রজা কখনও সমবেদনা দেখায় নাই। রাজার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে প্রজা উদাসীন ছিল। রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রজা রাষ্ট্র রক্ষার জন্য আপনার দুর্জ্জয় শক্তি

প্রয়োগ করিতে শিখে নাই। রাজ-শক্তি ও প্রজা-শক্তি যেখানে এইরূপ বিচ্ছিন্ন, সেখানে নেশন্ জন্মে না।

ভারতবর্ষে নেশনের অস্তিত্ব ছিল না; সেই জন্য ভারতবর্ষ পরাক্রমণ নিরোধে সফল হয় নাই। নেশন্ জন্মিবার বীজ ভারতক্ষেত্রে না ছিল, এমন নহে, কিন্তু সেই বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে নাই।

এইখানে ইউরোপের ইতিবৃত্তের সহিত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে অনৈক্য আছে। উভয়ত্র ইতিহাস ভিন্ন পন্থায় চলিয়া ভিন্ন ফল উৎপাদন করিয়াছে। উভয়ত্র এই প্রভেদের মূল কারণ কি, তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য বিষয়। প্রস্তাবান্তরে আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে।

সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার।

মানবদেহে কতকগুলি ব্যাধি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সহস্রবিধ ঔষধের ব্যবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়। সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে এই শ্রেণীর প্রত্যেক রোগের জন্য সংখ্যাতীত অব্যর্থ ঔষধের নূতন আবিষ্কার, আড়ম্বর সহকারে প্রতিনিয়ত ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য রোগী সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তিনিই জানেন, যেখানে অব্যর্থ ঔষধের সংখ্যা যত অধিক, রোগমুক্তির আশাও সেখানে ততই সামান্য।

এই ঘটনাকে একটা নৈসর্গিক নিয়মের একটা উদাহরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে স্থলে উপদেষ্টার সংখ্যা-বাহুল্য বিদ্যমান, সেখানে উপদেশ বিশেষ ফল প্রসব করে না বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেখানে শিক্ষাদানের সম্বন্ধে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের সৃষ্টি আবশ্যক হয় নাই, সেখানে ফলোৎপত্তিও শিক্ষকদত্ত উপদেশ অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না।

পৃথিবীর বর্ত্তমান দেড়শত কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই জননীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জননীর স্নেহে পালিত হইয়া মানুষ হইয়াছে, কিন্তু এই অত্যন্ত প্রাচীনা বসুন্ধরার পৃষ্ঠদেশে এমন কত দেড়শত কোটি মানব এপর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলীলা সমাপন করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু জননীগণকে অপত্য স্নেহের উপদেশ দিবার জন্য একখানাও নীতি-পুস্তক এপর্য্যন্ত রচিত হইল না, অথবা ধর্ম্মপ্রচারক মুখে একটাও Sermon প্রদত্ত হইল না। অথচ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে

প্রত্যেক জননী বিনা উপদেশে, বিনা আইনে, বিনা পুলিশে, অপত্যের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য যথোচিতরূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে, যেদিন হইতে বিদ্যালয় নামক শিশুজন-ভয়ঙ্কর পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে, সেইদিন হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের ঔচিত্য সম্বন্ধে কত সালঙ্কার বক্তৃতামালা ছাত্রবৃন্দের প্রতি প্রদত্ত হইয়া অসিতেছে; তথাপি ডিসিপ্লিনের ও ইণ্টার-স্কুল-রুলের এত কড়াকড়ির দিনেও এই ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এমন উদাহরণ বিরল নহে, যাহারা জনান্তিকে মাষ্টার মহাশয়কে নিতান্ত অশাস্ত্রীয় বিশেষণে সম্বোধন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

আমাদের সমাজমধ্যে উপদেষ্টার সংখ্যা ও গুরুর সংখ্যা যেরূপ সমগুণ শ্রেণীর নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, তাহাতে সমাজের ভবিষ্যত সামাজিকগণের পক্ষে চিন্তার বিষয় হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজ বিবিধ ব্যাধিতে রুগ্ন ও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু চিকিৎসকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া এক একবার আশঙ্কা হয়, বুঝি বা বৈদ্য-সঙ্কটেই রোগীর প্রাণ যায়।

প্রত্যেক বৈদ্যরাজই এক একটা অব্যর্থ ঔষধের পেটেণ্ট লইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, ও প্রশংসাপত্রমণ্ডিত ঔষধের বোতল মাথায় রাজপথে হুঙ্কার করিয়া গৃহস্থের শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন কিন্তু হায়! অমোঘ ঔষধের সংখ্যাও যে পরিমাণে অধিক, রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে অল্প। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তি আপনাকে অকস্মাৎ লোকসমাজে জাহির করেন ও সামাজিক ব্যাধির উৎকটতা সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি ভদ্রজনের সংশয় সমাকুল দৃষ্টিপাত কতকটা স্বাভা-

বিক হয়। সাধারণে আশঙ্কা করিতে পারেন, এই অপরিচিত মনুষ্যটির অসাময়িক বক্তৃতাবর্ষণের পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার ঝুলি হইতে এমন একটি কৌটা বাহির হইবে যে কৌটার অন্তর্গত বটিকাগুলি সাইবিরিয়ার তুষার ক্ষেত্র হইতে আনীত ম্যামথের অস্থিচূর্ণ হইতে প্রস্তত হওয়ায় একেবারে অব্যর্থ, এবং তাহার একটি কৌটামাত্র যিনি খরিদ করিবেন, তাঁহার রোগ মোচন ত হইবেই, পরন্ত পথ্যলাভের পরদিনই কবিরাজ মহাশয় ঘটকালি করিয়া ক্যাম্‌স্‌কাট্‌কার রাজকন্যার সহিত রোগীর বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ মহোদয়েরা নিতান্ত অনুকম্পা করিয়া যে অক্ষম ব্যক্তিকে এই মাননীয় জনসাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যদি সেই শ্রদ্ধালব্ধ অনুকম্পার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া দুঃসাধ্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহার অহম্মুখতা হয়ত মার্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়া এই অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার পরম সহিষ্ণু শ্রোতৃ মহোদয়গণ ক্ষমার জন্য কতকটা প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, এইরূপ ভরসা করিতে পারি। এবং শ্রোতৃবৃন্দ যখন স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া অনুগ্রহ বর্ষণে উন্মুখ, তখন তাঁহাদের সহিষ্ণুতা পরীক্ষায় আমরও কতকটা অধিকার আছে,—ধরিয়া লইতে পারি।

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই দেখিতে পাই, আমাদের সমাজে সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা বড় একটা আশা বুকে বাঁধিয়া এতকাল আশ্বস্ত ছিলাম, যেন সে আশা আমাদের চূর্ণ হইয়াছে। আমরা এতদিন ধরিয়া যাহার মুখ চাহিয়া ছিলাম, সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অস্ফুটভাবে, কোথাও

পরিস্ফুটভাবে, সমুদ্গত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্যের মূল কি ?

অধিক দিনের কথা নহে, বোধ করি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের ত এমন অবস্থা ছিল না। যে আশালতা আজ ছিন্নমূল হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, সেই আশালতার তখন সতেজে অঙ্কুরোদ্গম হইতেছিল।

পঞ্চশত বর্ষব্যাপিনী অশান্তির পর যখন আমরা পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য-জাতির রাজছত্রতলে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রথম শান্তির মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তখনই এই আশালতার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোক আমাদের মুদিত নেত্রকে সহসা খুলিয়া দিল, তখন আমরা যেন দীর্ঘনিদ্রার অবসানে সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া নূতন ভাস্করের প্রভাত কিরণ দেখিতে পাইলাম, আমাদের মৃত-কল্প শরীরে নবজীবনের সঞ্চার হইল। যখন দস্যু তস্করের হস্ত হইতে আমাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ হইল, যখন প্রবঞ্চক প্রতিবেশীর হস্ত হইতে সম্ভ্রমরক্ষার জন্য রাজদ্বার অবারিতভাবে উন্মুক্ত হইল, যখন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা দ্বারা অভিনব সভ্যতা ও বৃহত্তর জগতের সহিত আমাদের নূতন ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল, যখন ষ্টীম এঞ্জিন ও টেলিগ্রাফ এই নূতন সভ্যতার অজেয় বিক্রম ও অতুল ঐশ্বর্য্য ও অমিত মহিমার সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদিগকেও সেই বিক্রমের ও ঐশ্বর্য্যের ও মহিমার অংশভাক্ করিবার আশা দিল, তখন আমাদের আশালতা যে অচিরে পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, তাহার সংশয়-মাত্রও নিরাকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সে অধিক দিনের কথা নহে; সিপাহীযুদ্ধের বিপ্লবান্তে যে মহীয়সী মহারাজ্ঞী ভারতের সাম্রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বিংশকোটি প্রজার হৃদয় অভয়-বাণী দ্বারা আশ্বস্ত

ও আনন্দিত করিলেন, সেই পূজনীয়া মহিলা আজ বেলাবপ্রবলয় পরিখীকৃতসাগর বসুন্ধরার ঐশ্বর্য্যমহিমমণ্ডিত সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; কিন্তু তাঁহার কোটি প্রজার হৃদয়ে যে আশার ও আশ্বাসের ও পুলকের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা যেন অঙ্কুরেই ছিন্ন হইয়াছে। পাশ্চত্য জাতির সম্পর্কে আসিয়া আমরা যে ভাবী ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সে সুখস্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে মোহের ঘোরে আমরা এতদিন অ'চ্ছন্ন ছিলাম সে মোহের ঘোর যেন কাটিয়া গিয়াছে। কেহ যেন আমাদের কাণে কাণে দৃঢ় স্বরে বলিয়া দিয়াছে, তোমরা দীন, কুটীর মধ্যে ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া তোমরা ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলে, সে স্বপ্ন সফল হইবার নহে। পরন্তু তোমরা ভিক্ষুক; ভিক্ষুকের জীবনে শ্রেয়োলাভের আশা বিড়ম্বনা। গত কতিপয় বর্ষ ধরিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অধিক কথা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ফলে আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলাম, সে পথ যেন ঠিক পথ নহে; এখন কোন নূতন পথ আমাদের অবলম্বনীয়, তাহার নির্ণয়ই আমাদের সামাজিকগণের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পথভ্রান্ত পথিক যেমন দিশাহারা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, আকাশের ধ্রুবতারা তখন তাহার সংশয়াকুল চিত্তে বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হয় না, আমরাও সেইরূপ দিশাহারা হইয়া গন্তব্য পথ নির্ণয়ে অসমর্থ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি; কোন অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে কাল মেঘ আসিয়া আমাদের সেই ক্ষীণপ্রভ ধ্রুবতারাটিকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

যদি কেহ মনে করেন, আমি কোন কাল্পনিক-বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইয়া আপনিই প্রতারিত হইতেছি ও অন্যকে অমূলক আশঙ্কায় উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইতেছি, তাঁহাদিগকে আমার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া

বুঝাইবার জন্য দুই একটা উদাহরণের উল্লেখ আবশ্যক হইতে পারে। দুর্ভাগ্য ক্রমে এইরূপ উদাহরণও নিতান্ত বিরল নহে, এবং তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। আমরা যে কাজে হাত দিতে যাই, সেই কাজই শেষ পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া পড়ে। আমরা যে পথে কোন একটা লক্ষ্যের অভিমুখে গমন করি, সেই পথ আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী না করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে লইয়া যায়। অন্যান্য দেশে যে প্রণালীতে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, আমাদের দেশে সে প্রণালীতে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইতে হয়। আমরা পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া যে ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, সে ফল যথাসময়ে উপস্থিত হয় না; যাহা আমরা মনে ভাবি না, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য একটা উদাহরণের আলোচনা করিব, আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষের প্রজাগণের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন, তখন বাগ্‌দেবী প্রাচ্য বা প্রতিচ্য কোন্ মূর্ত্তিতে আমাদের উপাসনা করিবেন, এই কথা লইয়া একটা বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিতণ্ডার ইতিবৃত্ত ও চরম মীমাংসা সর্ব্বজনবিদিত; তাহার বিস্তৃত পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। প্রাচ্য শিক্ষা ও প্রতিচ্য শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই বড় বড় মহারথ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রতিচ্য শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী তাঁহারাই জয়লাভ করেন। তাঁহাদের যুক্তি কতকটা এইরূপ।—ভারত-বাসীর ধাতুতে ও মজ্জাতে বৈজ্ঞানিকতার অত্যন্ত অভাব; প্রাচ্য প্রণালীর শিক্ষা সেই অভাবের পূরণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। ভারতবাসী চিরদিন ধরিয়া কাব্য লিখিয়া আসিতেছে ও স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিকট বাহ্যজগতটা সমগ্রই একটা তরল পদার্থে

অথবা একটা ছায়াময় কল্পনার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে, সেইজন্য বাহ্যজগতের উপর তাহাদের কিছুমাত্র প্রসক্তি নাই। সেই জন্য তাহারা বাহ্যজগতের উপর প্রভুত্ব লাভেও সমর্থ হয় নাই। বাহ্যজগতকে তাহারা যথাসাধ্য অপমানিত করিয়াছে, তাহাতেই যেন জগতও অপমানিত বোধ করিয়া আর তাহাদিগকে ধরা দিতে চাহে না; তাহাদের স্পর্শের মধ্যে আসিতে চাহে না। ভারতবাসী যখন বাহ্যজগতকে আলিঙ্গন করিতে উপস্থিত হয়, তখন বাহ্যজগত তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়। ভারতবাসী যখন ধরাপৃষ্ঠে পদক্ষেপ করে, বসুন্ধরা তখন তাহার পদতল হইতে সরিয়া যান। কাজেই ভারতবাসী তখন শূন্য পথে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। বস্তুতঃ ত্রিশ কোটি মনুষ্যের সমবায়ে গঠিত একটা সমগ্র জাতি ইউলিসিসের দৃষ্ট লোটস্‌ইটারগণের মত নেশার ঘোরে ঝিম ধরিয়া বসিয়া আছে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা প্রকাণ্ড ফক্কিকার ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যন্ত্রবিষ্য সাজিয়া বসিয়া আছে, এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর অন্যত্র বিরল। একটা সমগ্র জাতি পুরাণ-কথিত হরিশ্চন্দ্রের কটকের মত সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শূন্য মধ্যে নিরবলম্বভাবে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ দৃশ্য আর কোথাও নাই।

সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, প্রাচ্য দেশের বীণাপুস্তকধারিণী, শতদলবাসিনী বাগ্দেবীকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন দিয়া ঈজি চেয়ারশায়িনী, বুটপরিহিতা, পাউডার পরিলিপ্তা বিলাতী সরস্বতীকে এ দেশে আমদানী করিতে হইবে। প্রাচীন কল্পনা-প্রধান প্রাচ্য বিদ্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া, তাহার স্থানে বিজ্ঞান-প্রধান প্রতীচ্য বিদ্যাকে স্থাপিত করিতে হইবে। প্রাচীন-কালের পৌরাণিক ভূগোল বিবরণে দধি সমুদ্র ও ক্ষীর সমুদ্র প্রভৃতির বিবরণ আছে, অথচ কলম্বস্, ড্রেক্ ও ফ্রাবিশারের সময় হইতে ফ্রাঙ্কলিন, রস ও ন্যানসেনের সময় পর্য্যন্ত নাবিকেরা সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া

সমুদ্র মধ্যে নোনা জল ব্যতীত এক ছটাকও স্বাদুজল সংগ্রহ করিতে পারিলেন না! এই সকল কাল্পনিক বিবরণে কেবল মাত্র রসনেন্দ্রিয় দ্রাবিত হয় মাত্র অথচ তাহার পরিতৃপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না; ইত্যাদি বিবিধ যুক্তি পরম্পরা দেখাইয়া বিখ্যাত লর্ড মেকলে, তাঁহার মহোৎপাদিনী ভাষায় প্রতীচ্য শিক্ষা নীতির সমর্থন করিলেন; এবং কবে সেই শুভদিন আসিবে, যখন প্রাচ্য বর্ব্বরগণ প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত প্রতীচ্য সভ্যতা লাভ করিয়া প্রতীচ্য রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য লালায়িত হইবে, এই সুখস্বপ্ন দেখিয়া পুলকিত হইলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজী বিদ্যা প্রলেপের সূত্রপাত হইল। ভারতবর্ষের রাজধানীতে ইংরাজ অধ্যাপকের পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ইংরাজ অধ্যাপকের পদপ্রান্তে বসিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ বেকনের Essay ও মিল্‌টনের Areopagitica অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আরিষ্টটলের সমাজনীতি ও হব্‌সের রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। Paleyর Evidenceএ, Reid এর মনস্তত্ত্ব হইতে নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, বার্কের অনুকরণে প্রকাশ্য সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতায় গলা সাধিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু কালেজ হইতে প্রতীচ্য সভ্যতার ধ্বজা ধরিয়া যে সকল মহারথগণ বহির্গত হইলেন তাঁহাদের আস্ফালনে ভূমিকম্পের সূচনা হইল। বাঙ্গালীর ক্ষীণবল জাতীয় জীবনে এমন উৎসাহের আবেগ আর কখনও দেখা যায় নাই। বহু কাল পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে সুগ্রীব পরিচালিত সেনা স্বর্ণলঙ্কার বেলাভূমিতে পদার্পণ করিয়া যে মহোৎসাহ দেখাইয়াছিল, বোধ হয়, তাহারই সহিত এই নবীন উৎসাহের কতকটা তুলনা হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে সীতার উদ্ধার বিষয়ে সংশয় সকলের মন হইতে গিয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানিরূপ বিকট দশাননের কবল হইতে

ভারত মাতার উদ্ধার যে অবিলম্বেই সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কাহার দ্বিধা রহিল না। কিছু দিন মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য সভ্যতার আলোক নিভৃত পল্লিগ্রাম মধ্যেও কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজী লেখকে ও ইংরাজী কথকে অচিরকাল মধ্যেই "ছাইল সকল ঘাট বাট ;" স্থির হইয়া গেল, ভারতের মুখচন্দ্রমার মালিন্য অচিরেই অপসৃত হইবে।

তাহাদের অধিক দিন গত হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই বায়ু প্রতিকূল মুখে ফিরিয়াছে। চারিদিকেই এখন হতাশের আক্ষেপ। বিলাতী বিদ্যা এদেশে ফলিল না। প্রাচীন পন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজী শিখিয়া ছেলেগুলা কেবল সহবৎ বর্জ্জিত হইতেছে, ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য হইতেছে, নাস্তিক হইতেছে। রাজপুরুষেরা বলিতেছেন, ইহারা কেবলই চাকরি চাহিতেছে, ও চাকরি না পাইলে সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া দেশ মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতেছে। রাজজাতীয়েরা বলিতেছেন, ইহারা শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই সেলাম করিতে চাহে না, ইহাদের এতটা নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, ইহারা এতকাল ধরিয়া বিজ্ঞানের বহিঃমুখস্থ করিল, অথচ ইহাদের মধ্যে একটা নিউটন জন্মিল না; একটা ফ্যারাডে জন্মিল না; ইহাদের মস্তিষ্কের উপকরণ কেবল কাদা আর মাটি। সমাজ সংস্কারকেরা বলিতেছেন, ইহারা এখনও বাল্যকালে বিবাহ করে, অথচ বলে আমাদিগকে রাজনৈতিকের অধিকার দাও, আমাদের টেক্স বাড়াইও না, আমাদিগকে বিনা দোষে জুতা মারিও না। কাজের লোকেরা বলেন, ইহারা কেবল কবিতা লেখে ও উপন্যাস লেখে, দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য ইহাদের চেষ্টা নাই যাহারা কাজের লোক নহেন, তাঁহারা বলেন, ইহাদের ধনতৃষ্ণা অত্যন্ত

বাড়িয়াছে, কালেজের বাহির হইয়াই ইহারা সরস্বতীকে বিসর্জ্জন দেয় ও অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফলতঃ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বজগত ভারত-উদ্ধারের জন্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, এখন এক রকম্ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত অকর্ম্মণ্য, জরদ্গব মনুষ্য সম্প্রদায় আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালী যাহা এ পর্য্যন্ত এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা আর কোন সুফল প্রসব করিতে পারিবে না; তাহা এক রকম নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। বড় বড় রাজপুরুষ তাঁহাদের উচ্চ আসন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রূকুটী-ভঙ্গী করিতেছেন। ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি ও শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি নিয়ত হলাহল উদ্গার করিতেছেন। সার চার্লস ইলিয়ট বলিলেন, ইহারা মিল ও বার্ক পড়িয়া রাজনীতির ঝঙ্কার দিতে শিখিয়াছে মাত্র; টাইমস্ পত্র বলিলেন, ইহারা ইতিহাস পড়িয়া কেবল রাজদ্রোহ শিক্ষা করিতেছে। ঈগল্ পক্ষী তাঁহার চঞ্চুপুট ব্যাদান করিয়া নেটিব্ দাঁড়কাকগুলাকে জানবাজার ষ্ট্রীটের অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের কচকচি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। পার্লামেণ্টে আমাদের কালা নাইট্ ভবনাগরী বলিলেন, এখন কিছু দিনের জন্য উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিয়া ইহাদিগকে জুতা সেলাই করিতে শিখাইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা উপায় হইতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন কতকটা ধরার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আবশ্যকতা নিতান্ত প্রমাণ সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষ হইয়া দুই একটা মিষ্ট কথা বলিতেছেন, তাঁহারা বস্তুতঃই আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌বোকেশন উপলক্ষে আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি

ও আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী সার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল আমাদের এই দুর্দ্দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে মিষ্ট কথা কহিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা-প্রণালীর যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা এক রকম সর্ব্ববাদী-সম্মত হইয়া গিয়াছে, একটা যে নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই বন্দোবস্তটা কিরূপ হইবে, তাহাই এখন বিচারের এবং বিতণ্ডার স্থল। 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'। মহাজনের পন্থাই এই সঙ্কটের স্থলে একমাত্র পন্থা কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে মহাজন একজন নহেন, বহুজন; কাজেই পন্থার নির্দ্দেশও কঠিন সমস্যা। ব্যাধি একটা, কিন্তু চিকিৎসক অনেক; ঔষধের সংখ্যার সীমা নাই। এবং প্রত্যেক ঔষধই যেখানে অব্যর্থ, সেখানে পীড়িতের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও শোচনীয়। নমুনাস্বরূপ দুই একটা ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে পারি।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময়ে প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ যে, ইহা অত্যন্ত লিটারারি; ইহাতে বৈজ্ঞানিকতার অত্যন্ত অভাব। ভারতবাসী পিতৃপিতামহ ক্রমে লিটারারি; আচার্য্য ম্যাক্‌সমূলর বলিয়াছেন, ভারতবাসী একেবারে ফিলসফার হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন, ভারতবাসী প্রত্যেকেই এক একজন শুকদেব। শুকদেবের সংখ্যা-বাহুল্য পারমার্থিক হিসাবে যতই প্রার্থনীয় হউক না, ব্যবহারিক হিসাবে ততটা আশাপ্রদ নহে। কেননা আমাদের ভারতবর্ষে দশ বৎসর অন্তর এক একটা প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া জঠরজ্বালাকে কিছুদিনের জন্য অত্যন্ত তীব্র করিয়া ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দৃঢ়ীভূত করিয়া দেয়। এমন কি, যে সকল সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসিগণ মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যেন-তেন সংসার যাত্রা

নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের সেই মাধুকরী বৃত্তিতেও বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আর একটা বৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য করে, যাহার ফলে তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ সংসার কারাগার হইতেও সংকীর্ণতর অন্যবিধ কারাগারে আশ্রয় লইতে হয়। যে বৈজ্ঞানিকতা ভারতবাসীর এই ফিলসফি-প্রবণতা ও কাব্য-প্রবণতা ও বৈরাগ্য-প্রবণতা কতকটা দমন করিয়া তাহাকে বৈষয়িক প্রবৃত্তি দিতে পারে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে নাকি সেই বৈজ্ঞানিকতার একান্ত অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে ছাত্রগণ বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রাণপণে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষকগণের প্রযুক্ত যাবতীয় ব্রহ্মাস্ত্রকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মজ্জাতে ও ধাতুতে বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তি জন্মায় না।

আমাদের বিদ্যালয় সংযুক্ত ল্যাবোরেটারিগুলিতে যে সকল ছাত্র অতি মনোযোগ সহকারে ব্যাটারি ও থার্ম্মোমিটর লইয়া নাড়াচাড়া করে, পাঁচ বৎসর পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বৈঠকখানার আলমারিগুলি পুরাতন ল-রিপোর্টের সারিতে সুশোভিত হইয়াছে, এবং চাপকানের উপর চাদর ও মস্তকে শামলা পরিধান করিয়া তাঁহারা নবীন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছেন।

চল্লিশ বৎসর হইল আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলি এদেশের উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ দেশের লোকের বিজ্ঞানের প্রতি আনুরক্তি জন্মিল না। মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনব্যাপী উদ্যম এখন কেবল সাংবাৎসরিক নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নূতন উপাধি প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন হইতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নামের পশ্চাতে নয়নাভিরাম অভিনব উপাধি সংযোগের অবসর পাইবে। কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থা

বিজ্ঞানের প্রতি আমুরক্তি আমাদের ছাত্রসম্প্রদায় মধ্যে কতদূর বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে অনেকের মনে গভীর সংশয় রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় নূতন নূতন উপাধির প্রলোভন ধরিতে পারেন, এবং বড় বড় কেতাবের তালিকা দ্বারা তাঁহাদের ক্যালেণ্ডারের পাতা সুশোভিত করিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নাই। বিজ্ঞান শিখিতে যে যন্ত্র তন্ত্র কারখানা আবশ্যক তাহা বিশ্ববিত্যালয় যোগাইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ। লর্ড কেলভিনের ন্যায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি কালেজে ফিজিকাল ল্যাবোরেটারি স্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই প্রেসিডেন্সি কালেজেই যে কিছু সামান্য উপকরণ আছে, তাহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক খেলিবার অবসর পাইলে খেলিতে না পারে এমন নহে। এই প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতেই দুইজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিদের নাম ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় ছড়াইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত মফস্বলের কালেজগুলির ও আমাদের দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত কালেজগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, সেখানে বিজ্ঞান শিখাইবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। এইরূপ মশলা লইয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর ফল যে স্বভাবসঙ্গত হইবে, তাহার আশা একরূপ নাই বলিলেই চলে। উনানে আগুন ধরাইবার জন্য বাতাস দিতে ও ফুঁ দিতে হয়, কিন্তু বাতাস দিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্ধন যোগান আবশ্যক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-গণ্ডদ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া

প্রাণপণে ফুৎকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত ইন্ধনের যেরূপ ঐকান্তিক অভাব, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু দেশের মধ্যে বিজ্ঞানাগ্নি সন্দীপিত হইবার আশা সুদূরপরাহত।

বিজ্ঞান শিক্ষার সহিত নিকট সম্পর্ক বিশিষ্ট আর একরকম শিক্ষা আছে, তাহাকে টেক্‌নিকাল শিক্ষা বা হাতে-কলমে শিক্ষা বলে অনেকের মুখে আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই টেক্‌নিকাল শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলেই দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। হাতে-কলমে শিক্ষা যে জাতীয় উন্নতির নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই শিক্ষার জন্য যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি বক্তৃতা করেন ও হা হুতাশ করেন তাঁহারা এপর্য্যন্ত টেক্‌নিকাল শিক্ষার প্রণালীটা কিরূপ হইবে, তাহার একটা পরিষ্কার উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। অনেকের মতে ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভাকে দেশলাইয়ের বা সাবানের কারখানাতে পরিণত করিলেই আমাদের টেক্‌নিকাল শিক্ষার একরকম বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। বঙ্গদেশের অদৃষ্টে নানাবিধ বিধিবিড়ম্বনা ঘটিয়াছে; বিজ্ঞান সভার অদৃষ্টেও এইরূপ শোচনীয় পরিণাম আছে কিনা জানি না; তবে আশা করি, সেই পরিণতি যেন বিলম্বিত নয়।

হাতে-কলমে শিক্ষা আমাদের দেশে কখনও ছিল না; এবং কখনও নাই, এমন নহে। মনুষ্য যেদিন তাহার আদিম বর্ব্বর অবস্থায় পাথর ভাঙ্গিয়া অস্ত্রনির্ম্মাণ অভ্যাস করিয়াছিল, সেই দিনই হাতে-কলমে শিক্ষার প্রথম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মনুষ্য সমাজমাত্রেই শিল্পোৎপন্ন বিবিধ সামগ্রীর আবশ্যক, এবং সেই শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের কৌশল এক

শ্রেণীর মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের দরিদ্রসমাজের আবশ্যক মত শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের ব্যবস্থা এত কাল আমাদের সমাজের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল। চাষার ছেলে ছেলেবেলা হইতে চাষ শিখিত, ছুতারের ছেলে ছেলেবেলা হইতেই ছুতারের কাজ শিখিত। জাতি-ভেদে ব্যবসায়ভেদের ব্যবস্থা থাকায় অতি অল্প ব্যয়ে দরিদ্র শিল্পির পক্ষে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ঘরের ভাত খাইয়া পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে আপনার পিতা পিতামহের নিকট বা আত্মীয় স্বজনের নিকট শিল্প-কৌশল অভ্যাস করার যে সুন্দর বন্দোবস্ত এত-কাল যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও আছে, তাহাতে সমাজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই এতকাল সম্পাদিত হইয়াছে। এবং এই শিক্ষাপ্রণালীর অনুসারে সে সকল শিল্পীসম্প্রদায় এদেশে জন্মিয়াছে, তাহাদের কারুকার্য্য অনেক বিষয়ে এখনও বৈদেশিকগণেরও বিস্ময়োৎ-পাদক হইয়া আছে। এতকাল পর্য্যন্ত আমরাই শিল্পসামগ্রী বিদেশে যোগাইতাম, ইউরোপের লোকে এ দেশের শিল্পদ্রব্য লইয়া যাইবার জন্যই এদেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ষ্টীম এঞ্জিনের প্রতাপে এখন পুরাতন বন্দোবস্ত সমস্তই উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন ইউরোপের লোকেই সমস্ত পৃথিবীকে শিল্পের সামগ্রী যোগাইতেছে। ইউরোপের কল কারখানার সহিত আমাদের সনাতন প্রণালী এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সেই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে যে প্রণালীতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান হয়, এখন এদেশেও সেই প্রণালীতে শিক্ষাদান আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা আমাদের দেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান নাই। দেশের মধ্যে কলকারখানা

নাই, দেশের লোক অনভিজ্ঞতা বশতঃ নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। মূলধনের একান্ত অভাব; যাঁহাদের ধন আছে তাঁহারা ত বিশ্বাস ও সাহসের অভাবে সেই ধনের ব্যবসায়ে নিয়োগে কুণ্ঠিত বৈদেশিক রাজা দেশীয়দের সাহায্য করিতে একবারে পরাঙ্মুখ। এরূপ স্থলে হাতে-কলমে শিক্ষার সুবিধামত বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। হাতে-কলমে শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই; এবং দেশের ত্রিশকোটি অধিবাসীর ষষ্ঠকোটি খানা হাতও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল কলমের অভাবে শিক্ষাটা ঘটিয়া উঠিতেছে না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সংস্কার ও সংশোধন আবশ্যক, তাহা রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষ হইতেই একরকম স্বীকৃত হইয়াছে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ সার সৈয়দ আহাম্মদের স্মৃতিস্থাপনা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার স্থাপিত আলিগড় কালেজকে স্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতী আনিবেসান্ত কাশীধামে হিন্দুর জাতীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার জন্য হিন্দুসমাজকে আহ্বান করিয়াছেন। বাঙ্গালার জমীদারগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় ভূস্বামিগণের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতির উৎকর্ষ ও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ বিধানের কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া, কলিকাতা সহরে ছাত্রদিগের জন্য হায়ার ট্রেনিংক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিভাগের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাঙ্গালীর ক্ষীণপ্রাণ শিশুগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বহ ভূতের বোঝা বহিবার অকারণ পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া নিম্ন শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। পশ্চিম ভারতবর্ষে যে সমাজ হইতে আমরা দাদাভাইকে পাইয়াছি, সেই সমা-

জের অপর এক স্বদেশ বৎসল মহাত্মা উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারের জন্য বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে প্রস্তুত হইয়া আমাদের ধনিগণের সম্মুখে মহাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

• এতদিন আমরা যে প্রাচ্য শিক্ষাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ কাল তাহার প্রতি অনেকের সুদৃষ্টি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কেবলই যে ক্ষীর সমুদ্রের ও দধি সমুদ্রের কথা নাই, সেখানে যাস্ক ও পাণিনি ও আর্য্যভট্ট ও ভাস্কারাচার্য্যের মত মনস্বীগণও লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; তাহা কেহ কেহ যেন স্মরণ করিতেছেন। ফলে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের প্রতিও একালের ইংরাজী শিক্ষিতগণের শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার আবশ্যকতা অনেকের মনে স্থান লাভ করিয়াছে। স্থান বিশেষে এই চেষ্টা নিতান্ত অদ্ভুত ফলের উৎপাদন করিয়াছে। আমাদের মত ফিলজফিকাল জাতি স্বভাবতঃই হাস্যরসের আস্বাদনে বঞ্চিত; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইংরাজী বিদ্যা গলাধঃকরণের সহকারে গীতা ও চাণক্য শ্লোকের চাটনির ব্যবস্থা হইয়া যে নিতান্ত য়্যাংগ্লো বেদিক খেচুরান্নভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত অরসিকেরও রস প্রবৃত্তি না হইয়া যায় না। যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের বা জাতীয় আচারের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঈদৃশ কৌতুকের অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া রসগ্রাহী লোকের হাস্য সংবরণ কঠিন হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি। বস্তুতঃ যে শিক্ষা-প্রণালী জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক; এবং যাহা অস্বাভাবিক, তাহা হইতে স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। যুগান্তর হইতে যে জাতীয় স্বভাব বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া আসিয়াছে,

তাহার সহিত একেবারে সকল সম্পর্ক রহিত করিলে, কেবল শিক্ষা প্রণালী কেন, কোন প্রণালীই অভিব্যক্ত হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ এই সরল স্থূল কথাটা বুঝিতে পারেন নাই। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে আদান প্রদান না থাকিলে সমগ্র শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না, আমাদের শিক্ষা-সমাজের শরীরে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান আছে; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সেই সম্বন্ধ, সেই আদান-প্রদান, সেই সমবেদনা বর্ত্তমান নাই; তাই উহা বর্দ্ধিত পুষ্ট ও শ্রীযুক্ত হইতে পারিতেছে না। বিলাত হইতে যে শিক্ষাপ্রণালী সশরীরে আমাদের দেশে আমদানি করা হইয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় ভাবের সহিত মিশিতে পারে নাই; সেই অস্বাভাবিক প্রয়াসে যে অস্বাভাবিক ফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে নীতি শিক্ষার ও ধর্ম্ম শিক্ষার আদর নাই বলিয়াই সচরাচর একটা আক্ষেপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমানেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উপদেশ দেন, নীতি পুস্তকের সংখ্যা পাঠ্য মধ্যে বাড়াইয়া দিলেই ছাত্রগনকে দুর্নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও একবার হুজুগে পড়িয়া নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে অন্ততঃ এত পাতা নীতিকথা থাকা চাই। কিন্তু গ্রন্থপাঠ করিয়া সন্নীতির উৎকর্ষ বিধানে যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভেলা বাহিয়া সাগরসন্তরণে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থ পাঠদ্বারা ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর নাম উল্লেখ করিলে আজিকার দিনে আমার অনেক বন্ধু হয়ত লগুড় উত্তোলন করিবেন, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে চাহি যে, নীতি শিক্ষারও একটা কিণ্ডারগার্টেন

প্রণালী আছে। কেবল বস্তুতত্ত্ব শিখাইবার জন্যই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে ফল পাওয়া যায়, এমন নহে; শিক্ষামাত্রেই এই প্রণালী ফলোপধায়ক, এমন কি, বলিতে চাহি যে, শিক্ষামাত্রেরই বোধ হয় এই একমাত্র প্রণালী। যিনি ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিতে চাহেন, তিনি দশ বৎসর কাল বেন সাহেবের ও মরিস সাহেবের accidence অভ্যাস করিলেও ইংরাজী রচনায় নৈপুণ্যলাভ করিতে পারিবেন না; তাঁহাকে বাছিয়া বাছিয়া ভাল রচনা প্রচুর পরিমাণে পড়িতে হইবে, এবং প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিতে হইবে। হাইড্রোজেন বায়ু স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন এইরূপ সারা বৎসর ধরিয়া মুখস্থ করিলেও ছাত্রদের হাইড্রোজেন কেবল একটা নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পদার্থ, এইরূপই একটা জ্ঞান জন্মিবে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেনের স্বরূপ-জানিতে হইলে বোতল বোতল গ্যাস স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অগ্নি প্রয়োগে জ্বালাইতে হইবে।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী এই চোখে দেখিয়া হাতে লইয়া নাড়িয়া ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া দেখাবারই নামান্তর মাত্র। নীতি শিক্ষারও কিণ্ডার-গার্টেন আছে; শিক্ষকের কাছে কেবল নীতির সম্বন্ধে লেক্‌চার শুনিলে চলিবে না; শিক্ষককে নীতি সম্বন্ধে ডিমনষ্ট্রেশন দিতে হইবে। তাঁহাকে আপন গৃহস্বরূপ ও সমাজস্বরূপ ল্যাবরেটরিতে দাঁড়াইয়া সন্নীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ছাত্রেরা স্বচক্ষে সেই দৃষ্টান্ত দেখিবে ও তাহার ফলোভোগ করিবে; শিক্ষক স্বয়ং ভাল কাজ করিয়া তজ্জাত আনন্দ উপভোগ করিবেন ও ছাত্রদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া তাহা-দগকে তাহার আনন্দ উপভোগ করাইবেন। শিক্ষক স্বয়ং মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরে থাকিবেন, ও আপনার ছাত্রগণকে মিথ্যাচার ও অসদাচার হইতে দূরে রাখিবেন। পরন্তু সহানুভূতির ও স্নেহের

ও প্রীতির বন্ধনে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া বেত্রের শাসন ও জরিমানার শাসন ও percentageএর শাসন অপেক্ষা এই বন্ধন যে কত অধিক ফলোদায়ক, তাহ ছাত্রদিগকে আত্ম-জীবনে অনুভব করিবার শক্তি দিবে। শিক্ষার দ্বারা যদি নীতির উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়, তাহা এইরূপ শিক্ষার ফলে; কেবল পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নৈতিক উপদেশ কণ্ঠস্থ করিবার ফলে নহে।

নীতিশিক্ষার এই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মনে করিতে গেলেই আমাদের প্রাচীনকালের পুরাতন শিক্ষা-প্রণালী মনে আসে। সে এককাল ছিল; তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে দোকানদারী সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল না; তখন বেতনের পরিবর্ত্তে বিদ্যাবিক্রয় নিতান্ত হেয় প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে অন্তবিধ বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; এক পক্ষে স্নেহ ও প্রীতি, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। উপনয়ন সংস্কারের পর ধৃতব্রত মানব যখন ব্রহ্মচারীর ইউনিফর্ম্ম পরিয়া দেবতাগণের ও আত্মীয়জনের আশীর্ব্বচন মস্তকে লইয়া পিতৃভবন হইতে গুরুগৃহে উপস্থিত হইত, তখন সেই কুটীরবাসী গম্ভীরমূর্ত্তি অপরিচিত পুরুষ সেই নবীন আগন্তুককে স্নেহপূর্ণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সম্ভাষণ করিয়া লইতেন; গুরুগৃহ তখন তাহার পিতৃগৃহে পরিণত হইত। শিক্ষাদাতা তখন জন্মদাতার স্থান পরিগ্রহ করিতেন, গুরু-পত্নী তখন জননীর স্থান গ্রহণ করিতেন, গুরুপুত্রগণ বয়স্তের স্থান ও ভ্রাতার স্থান গ্রহণ করিত। গুরুগৃহে বাসকালে যে সকল জ্ঞানোপদেশ প্রদত্ত হইত, তখন যে সকল শাস্ত্র অধ্যাপনা হইত, তাহার সহিত আধুনিক শিক্ষার ও আধুনিক শাস্ত্রের তুলনার প্রয়োজন নাই; যখন সেই পুরাকালের ভারতভূমির বেদধ্বনিমুখরিত ঋষিপরিষৎ, সেই মৃগ-শিশুকুলের বিচরণভূমি, সেই হোমধেনু সমূহের বিহারস্থলী, সেই ঋষিকন্যা

সেবিত লতাবিতান, সেই নিবারকণাকীর্ণ উটজাঙ্গন, সেই শুক-মুখভ্রষ্ট ইঙ্গুদিফল চিহ্নিত শ্যামল শষ্যক্ষেত্র, সমিৎকুশ ফলাহরণ প্রত্যাগত ঋষি-শিষ্যমণ্ডলী যখন মানসনেত্রে প্রতিভাত হয়, তখন সেকালের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত একালের বিদ্যাবিপণিসমূহে শিক্ষাবিক্রয় প্রথার তুলনা করিয়া দীর্ঘশ্বাস আপন হইতেই বহির্গত হয়।

বর্ত্তমান অধ্যাপনা প্রণালীকে আমি যে বিদ্যাবিক্রয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক। বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদান যে একেবারে অবৈধ ব্যাপার তাহা আমি বলিতে চাহি না। অধ্যাপকেরও জীবনধারণ আবশ্যক, এবং অধ্যাপনাই যাঁহার একমাত্র জীবিকা, তাঁহাকে সেই উপলক্ষেই জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিক চতুষ্পাঠী মধ্যে ছাত্রের নিকট বেতন গ্রহণের প্রথা বর্ত্তমান নাই; কিন্তু চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরাও দেশের ধনীসম্প্রদায় কর্ত্তৃক এক হিসাবে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। দেশে যখন হিন্দুরাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, তখন তাঁহারা রাজার ব্যয়েই প্রতিপালিত হইতেন। একালে আর অধ্যাপকের জন্য ভূমিদানের তাম্র শাসন ক্ষোদিত হয় না; কিন্তু তথাপি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের সামান্য অভাব পিতৃ-পিতামহ হইতে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি হইতে ও ধনীসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ হইতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ বন্দোবস্তে যে একেবারে দোষ নাই, তাহাও আমি বলিতে চাহি না। ধনীর অনুগ্রহের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে অনেকটা আত্ম-মর্য্যাদার হ্রাস হয়; এবং ক্রমশঃ চাটুবৃত্তি শিক্ষা অভ্যস্ত হইয়া আসে। আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেও এমন উদাহরণ বিরল নহে, তাঁহারা সামান্য অর্থের জন্য অসার অকর্ম্মণ্য জমীদার সন্তানকেও "রাজন্ তব যশোভাতি দধিবৎ" বলিয়া চাটুকীর্ত্তনে কুণ্ঠিত হয়েন না। চতুষ্পাঠীর প্রণালীকে আমরা

প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর শেষ অবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারি, যখন অধ্যাপকের পালন ও উচ্চ-শিক্ষাপ্রদান রাজার কর্ত্তব্য ও সাধারণের কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ষ্টেটের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। একালেও সাধারণ শিক্ষার ভার ষ্টেটের লওয়া উচিত কিনা, তাহা লইয়া মধ্যে মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। নিম্নশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ভার যে ষ্টেটের লওয়া উচিৎ, সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। আমাদের দেশে ও ইংরাজের দেশে নিম্নশিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করেন না। উচ্চ-শিক্ষার ভারগ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বড় রাজী নহেন। সেই ভারটার অংশ নিজের পক্ষে লাঘব করিয়া দেশের লোকের উপর ফেলিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যাকুল। বিলাতেও প্রাচীনকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনীসম্প্রদায়ের প্রদত্ত অর্থ হইতে পালিত হইয়া থাকে, এ সকলের উপর রাজার তেমন কর্ত্তৃত্ব নাই। জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে রাজা উচ্চ-শিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টও কুণ্ঠিত; দেশের ধনীসম্প্রদায়েরও তেমন অবস্থা নহে যে, বর্ত্তমান প্রণালীর উচ্চশিক্ষার গুরুভার তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বহন করেন। কাজেই শিক্ষার্থিগণের উপরেই ভারটা একেবারে চাপিয়া পড়িতেছে। শিক্ষার্থিগণের প্রদত্ত বেতনে শিক্ষাপ্রদান এদেশে প্রায় নিয়ম হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দরিদ্র দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থীর ক্ষমতা যেরূপ শিক্ষার ও অধ্যাপনার অবস্থাও তদনুযায়ী হইয়া পড়িতেছে। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের সঙ্গে একত্র বাস করেন; উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের বিনিময়ের সহিত ভাববিনিময় ও শ্রদ্ধা-ভক্তির বিনিময়ও ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেকাংশে আমাদের চতুষ্পাঠীর তুল্য। এদেশে উক্ত প্রণালী আমরা বিলাত হইতে আনাইয়াছি; কিন্তু তজ্জন্য যে

ব্যয়ের প্রয়োজন তাহার ভার লইতে কেহই প্রস্তুত নহে। গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-শিক্ষার খরচ দিতে কুণ্ঠিত, ধনীসম্প্রদায় অক্ষমতার ওজর করেন; ছাত্রসম্প্রদায়ের ক্ষমতার একান্ত অভাব। আমরা প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছি; বৈদেশিক প্রণালীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। আমাদের অবস্থা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এই অস্বভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। ফলও ঠিক তদনুরূপ হইতেছে।

আমাদের মত দরিদ্রের পক্ষে ঐশ্বর্য্যশালীর অনুকরণ চেষ্টা বস্তুতঃই অস্বাভাবিক। হয়ত এই দারিদ্র্যই আমাদের সকল ব্যাধির মূল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, আমরা দরিদ্র। রাজপুরুষেরাও বলেন আমাদের চারি আনা লোক প্রত্যহ অর্দ্ধাশনে যাপন করে। অথবা তাঁহাদের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই সেদিন মাত্র ভারতের কোটি প্রজার অন্নসংস্থানের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া 'দেহি দেহি' শব্দে পৃথিবীর লোকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। বিগত দুর্ভিক্ষের সমালোচনায় নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট সাক্ষরিত হইতে না হইতেই পশ্চিম ভারতে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। আবার বৃটিশ সিংহের চতুরঙ্গিনী সেনা দুর্ভিক্ষ দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সাজ সাজ শব্দে আহূত হইয়াছে। ইহার উপর আর কথা নাই। অমাদের দারিদ্র্যব্যাধির উপশম করিতে পারিলে হয়ত অন্যান্য উপসর্গ আপনা হইতে দূর হইতে পারিবে। সুতরাং এই দারিদ্র্যের কথাটা আমাদের বিশেষরূপে আলোচ্য বটে; কিন্তু আলোচনা করিতে গেলেই আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কেননা, দারিদ্র্যের কথা আনিতে গেলেই "পলিটিকাল ইকনমি" নামে একটা বিকট-শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়, এবং আমাদের কাতরভাবে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আপনাদের অনুগৃহীত এই দীন প্রবন্ধ-

পাঠক উক্ত শাস্ত্রের প্রতি কস্মিন্‌কালে অনুরাগ স্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং আমার আশা নাই যে, আমি ইহার সম্যক্‌ আলোচনায় সমর্থ হইব। দারিদ্র্যের কথা আনিতে গেলেই আমাদের আয় ব্যয়ের কথা, টাকা আনা গণ্ডার ভীষণ ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ আসিয়া পড়ে, এবং পাটি-গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অভাবে আবার ঐ লোম হর্ষণ অনুষ্ঠানে হাত দিতে স্বতঃই শঙ্কা হয়। পাঠশালায় পড়িবার সময় সঙ্কলন, ব্যবকলন, সভুর মহুস্মান প্রভৃতি শব্দপরম্পরা কেবল রাত্রি যোগে দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করিত। আমার এরূপ ক্ষমতা নাই যে হিসাব করিয়া আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা যথাযথ উত্তর দিব। তবে পরের মুখে দুই চারি কথা যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারই সার সঙ্কলন পূর্ব্বক আপনাদিগের উপর উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা দরিদ্র সে বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই কিন্তু সেই দারিদ্র বাড়িতেছে কিনা, এই প্রশ্নের দুইরকম উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। এক উত্তর সরকারি অন্য উত্তর বেসরকারি। অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রকৃতির ঘটনার তথ্যনির্ণয়ে ও সরকারি ও বেসরকারি দুইরকম সিদ্ধান্ত সচরাচর প্রচলিত আছে। দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না? বেসরকারি উত্তর—দুর্ভিক্ষের অর্দ্ধেক লোক মরিয়া গেল; সরকারি উত্তর দুর্ভিক্ষ কোথায়? সহরে প্লেগ আসিয়াছে কি না? সরকার যখন বলেন প্লেগে বিস্তর লোক মরিতেছে, সাধারণের তখন স্থির সিদ্ধান্ত, সমস্তই কবি কল্পনা। দরিদ্র সম্বন্ধে সরকারি উত্তর দেশ দরিদ্র, কিন্তু ইংরাজী শাসনের কল্যাণে উত্তরের ধনবৃদ্ধি হইয়া দারিদ্র দূরিভূত হইতেছে; বেসরকারি উত্তর ইংরাজ শাসনে আমরা অত্যন্ত সুখে আছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছুদিন পরে দেশে আর কানা কড়িটি ও থাকিবে না। এ রহস্য মন্দ নহে, কিন্তু রহস্যের সমালোচনায়

কৌতুক ও শিক্ষা আছে। উভয় পক্ষে বহুদিন হইতে বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে, উভয় পক্ষের তূণীর হইতে ক্ষুরধার যুক্তির বাণ সমূহ সর্ব্বদা প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, কিন্তু সমরে জয় পরাজয়ের অদ্যাবধি মীমাংসা হইল না।

বেসরকারি পক্ষ বলেন, তোমরা হোম চার্জ্জ বলিয়া যে টাকাটা বৎসর বৎসর আপন দেশে লইয়া যাইতেছ, তাহা আমাদের নিছক লোকসান; ইংরাজ সৈনিক, ইংরাজ রাজপুরুষ যে টাকা এদেশ হইতে লইয়া যায়, তাহার এক কড়াও আর এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। দেশীয়ের হাতে শাসন কার্য্য ও শান্তি রক্ষার ভার দিলে দেশের টাকা দেশে থাকিত।

সরকারি পক্ষ বলেন, ঠিক্। কিন্তু এত কাল ত তোমরা দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলে, কিন্তু শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই। বাহিরের শত্রু আসিয়া মাঝে মাঝে তোমাদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। অভ্যন্তরে দস্যু-তস্কর-বর্গী-পিণ্ডারীর অনুগ্রহে কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না, আমরা তোমাদিগকে শান্তি দিয়াছি। বহিঃশত্রুর ভয় নাই; ভিতরে নির্ব্বিবাদ শান্তি, সকলে এখন মনের সুখে পরিশ্রমের ফলভোগ করিবার অবসর পাইয়াছে। সহস্রগুণ দিবার জন্য সূর্য্যদেব রসগ্রহণ করেন; আমরাও পরি-শ্রমের বেতন স্বরূপ একগুণ গ্রহণ করি; তোমরা আমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া সহস্রগুণ লাভ করিয়া থাক। তোমরা শান্তির অবসর পাইয়া পরিশ্রমের দ্বারা ধনের উৎপাদন করিতে পারিতেছ, ধনের সৃষ্টি করিতে অবসর পাই-য়াছ। তোমরা সহস্রগুণ ধন উৎপাদন করিবে, আমাদিগকে একগুণ বেতন স্বরূপ দিবে না কেন? আমরা কি পেটে না পাইয়া তোমাদের প্রহরীর কাজ করিব ও তোমাদের ঘরাও বিবাদের ব্যবস্থা করিব?

আমরা নিরুত্তর হইয়া বলি, রাজপুরুষেরা, রাজকর্ম্মচারীরা তেমন অধিক লয়েন না বটে, কিন্তু এই ইংরাজ ব্যবসায়ীরা দেশের অনেক টাকা লইয়া যায়।

ও পক্ষ হাসিয়া বলেন, অরে মূর্খ, নীলকর ও চাকরের শুভাগমনের পূর্ব্বে এদেশের মাটীতে নীলের ও চায়ের চাষ হইতে পারে, তাহা কয়জন লোকে জানিত? ইংরাজ ব্যবসায়ীর আগমনের পূর্ব্বে এদেশের লোক রাণী-গঞ্জের মাটি খুঁড়িয়া কয় জন কয়লা তুলিত? আসামের জনশূন্য অরণ্যে হস্তী ভিন্ন তোমাদের মত হস্তিমূর্খ কতগুলি প্রতিপালিত হইত? ইংরাজ ব্যবসায়ী ও ইংরাজ কুঠিয়াল আসিয়া এদেশের ছাই মুঠোকে কড়ি মুঠোর, এদেশের ধূলি মুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিয়াছে; লৌহকে স্পর্শমণিসংযোগে কাঞ্চনে পরিণত করিয়াছে। যখন ইংরাজের জাহাজ এদেশে আসে নাই, তখন চীনাম্যানের জন্য কত কোটি টাকার আফিম এদেশের জমি হইতে উৎপন্ন হইত! ভারতবর্ষের যে শস্য সম্পত্তির, রত্নসম্পত্তির কখনও অস্তিত্ব ছিল না, ইংরাজ আসিয়া সেই সম্পত্তির আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার আবি-ষ্কৃত স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির কতক ভাগ, সিংহের প্রাপ্য ভাগ, সে গ্রহণ করিবে ইহাতে অন্যায় কি? কিন্তু তোমাদিগকেও ত সে একেবারে ফাঁকি দেয় না। কত লক্ষ লক্ষ কৃষক, কত লক্ষ লক্ষ কুলি মজুর ইংরাজ কুঠিয়ালের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখ কি?

ইহার উত্তর নাই। আমরা তখন অন্য পথে ঘুরিয়া উত্তর দিই,—কিন্তু তোমাদের দেশের শিল্পীর দৌরাত্ম্যে আমাদের দেশীয় শিল্প লোপ পাইতে চলিল, শিল্পিকুল নিরন্ন হইয়া পড়িল, তাহার কি?

প্রতিপক্ষ বলেন, তোমাদের এ আবদার অসহ্য। এই অবাধ বাণিজ্যের ও স্বাধীন ব্যবসায়ের দিনে এ সকল আবদার শোভা পায় না। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। তোমাদের শিল্পিগণ প্রতি-যোগিতায় হঠে কেন? তাহারা আমাদের মত কল কারখানা খুলিয়া আমাদের মত বুদ্ধি খাটাইয়া আমাদিগকে পরাস্ত করুক, তাহাতে কোন বাধা নাই। তাহারা সেই মান্ধাতার আমলের সনাতন মার্গ ত্যাগ করিবে না আমরা

তাহার কি করিব? তোমরা অগ্রসর হইবে না বলিয়া আমরা ত আর পশ্চাতে ফিরিতে পারি না। আমরা স্বাধীন ব্যবসা চাহি; কাহাকেও বাধা দিতে চাহি না, যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি পন্থা দেখিয়া লউক।

অকস্মাৎ একটা উত্তর দিবার অবকাশ পাইয়া আমরা অমনি বলিয়া উঠি—ঐত ঐ অবাধ বাণিজ্যই লোকদের সর্ব্বনাশের মূল। আমাদের নিরন্ন দেশের খাদ্য সামগ্রী, আমাদের ধান গম, তোমরা অবাধ বাণিজ্যের নামে লইয়া যাইতেছ; পূর্ব্বে পাল তোলা জাহাজের আমলে যাহা দশ বৎসরে লইয়া যাইতে, এখন রেল আর ষ্টীমারের আমলে তাহা দশ দিনে লইয়া যাইতেছ, ও তাহার বিনিময়ে কত গুলা কাট আর লোহা আর মাটি দিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে। এখন তোমাদের অবধি বাণিজ্যের কল্যাণে টাকায় আট মণ চালের কথা আমাদের উপন্যাস হইতে চলিয়াছে; বাক্সে রৌপ্যমুদ্রা ও হাল আইন মতে স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চিত থাকিলেও আমাদের অন্নাভাবে প্রাণবিয়োগ ঘটিবে।

প্রতিপক্ষ মহাশয় তখন দশনপ্রভায় শ্মশ্রুগহন মুখমণ্ডলের ধ্বান্তরাশি বিদূরিত করিয়া বলিতে থাকেন,—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—টাকায় আট মণ চাল যেন তোমাদের পক্ষে উপন্যাসই থাকে। টাকায় আট মণ চাল, কি ভীষণ কথা! এই কৃষি প্রধান দেশে অধিকাংশ লোক কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এমন এককাল ছিল, যখন সে তাহার সংবৎসরের পরিশ্রমের ফল শস্য, যাহা দস্যুর হস্ত হইতে ও দস্যু হইতেও ভয়ঙ্কর জমিদার ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আপনার ও আপনার পরিজনবর্গের দেহরক্ষার জন্য সঞ্চিত করিতে সমর্থ হইত, তাহার বিনিময়ে সে কি পাইত? না, আট মণের বিনিময়ে একখণ্ড রজত মুদ্রা। এইরূপ বিনিময় ব্যাপারের পর তাহার অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজন নির্ব্বাহ একরূপ অসাধ্য সাধন; হয়ত তাহার শীতনিবারণ ও লজ্জানিবারণও

ঘটিত না। হয়ত ক্রেতার অভাবে তাহার ক্ষেতের ফসল মূষিকের উদরে যাইত, বা ক্ষেতে পচিত; তাহার রাজকরের সংস্থানও ঘটিয়া উঠিত না। আমাদের অনুগ্রহে ও স্বাধীন বাণিজ্যের অনুগ্রহে সে আর তাহার পরিশ্রম-লব্ধ জীবনোপায় শস্যসম্পত্তি মূষিকের ও তস্করের ও নায়েব গোমস্তার উদর পূরণের জন্য গোলা বাঁধিয়া রাখে না; এখন নিজে উদর পুরিয়া খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার বিনিময়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী, হয়ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলাসোপকরণ পর্য্যন্ত, সামান্য মূল্যে আমাদের নিকট গ্রহণ করে, ও জীবনে আরাম ও স্বাস্থ্য উপভোগ করিবার অবসর পায়। একালে চাষার ছেলে ছাতা মাথায় দেয়, জামা গায়ে দেয়, জুতা পরে; চাষার গৃহিণী সোণায় রূপায় আপনার শ্যাম তনু অলঙ্কৃত করে; কৃষক গৃহস্থ এখন পোষ্ট অফিস হইতে কুইনাইন খরিদ করে, এবং হয়ত শৌণ্ডিকালয়ে ও এক আধবার লব্ধপ্রবেশ হইয়া দিনান্তের পরিশ্রমজাত অবসাদ দূর করিবার অবকাশ পায়। সে কালের ধনী লোকে আইনি-আকবরীর ব্যবস্থা মত বাদশাহী পোলাও চারি আনা খরচে প্রস্তুত করিত; কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, সে কালের কৃষকের ভাগ্যেও সামান্য ভিন্ন অন্য সামগ্রী জুটিত। দেশের মধ্যে পলান্নভোজী কয়জন? আর শাকান্নভোজীই বা কয়জন? পলান্ন ভোজনের খরচটা এখন হয়ত বাড়িয়াছে, কিন্তু শাকান্ন ভোজী আরাম কমিয়াছে মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তোমাদের দেশে যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে তাহার জন্য অবাধ বাণিজ্যকে দায়ী করিও না। প্রত্যুত দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতবর্ষের ল্যাটিচুড বা অক্ষাংশ যতটা দায়ী, আমরা ততটা দায়ী নহি। দুর্ভিক্ষ সে কালেও ছিল; হয়ত আরও বেশী বেশী ছিল। কিন্তু প্রজার দুঃখকাহিনী তখনকার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিবার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সকলে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, আমরা কিছু জোর করিয়া প্রজার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই না। সে আপনার উদর পূরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই চোরের জন্য ও আগুনের জন্য না রাখিয়া ইচ্ছাসুখে বিক্রয় করে। স্বাধীন বাণিজ্য স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন। কৃষকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহাদের ভুক্তাবশেষ প্রদান করিয়া তাহার বিনিময়ে বিলাস সামগ্রী গ্রহণ করে। তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত ঐ সকল বিলাসদ্রব্যই কি প্রমাণ করিতেছে না যে, তাহাদের অবস্থা দিন দিন ফিরিতেছে? তবে তাহারা যে যথোচিত উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না, সে নানা কারণে। তাহারা তোমাদেরই স্বজাতীয়, সুতরাং গণ্ড মূর্খ, অদূরদর্শী, যন্তবিষ্য, কুসংস্কারাপন্ন। তাহারা জাতি মানে, পেটে না খাইয়া মরিবে, অথচ বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিবে না; ব্রাহ্মণের চতুরতায় ভুলিয়া তাহাকে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে, বিধবা পিসী মাসী সম্প্রদায়কে অকারণে খাইতে দিবে, অথচ তাহাদের বিবাহ দিয়া একটা গতি করিয়া দিবে না; স্বয়ং ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ করিবে, এবং তৎপূর্ব্বেই সন্তানোৎপাদন করিয়া ঐহিক পিণ্ডের যোগাড় না থাকিতেও পারত্রিক পিণ্ডলাভের জন্য লালায়িত হইবে। এই জাতি যদি দরিদ্র না হয় তবে হইবে কে?

এই সকল যুক্তিবর্ষণের পর আমাদিগকে কাজেই নিরুত্তর হইতে হয়। বিশেষতঃ যখন যুক্তির অন্তঃকরণে পিনাল কোডের একটা নূতন ধারা আকস্মিক আপতনের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। আমাদের পক্ষে নিরুত্তর হওয়াই শ্রেয়স্কর। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খট্‌কা থাকিয়া যায়;—সবই ঠিক, কিন্তু তবু যেন কোথায় কি একটা গোল থাকিয়া গেল। বর্ত্তমান কালে আমাদের আয় বাড়িয়াছে সত্য কথা; আয়ের বিবিধ নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু আয়ের সঙ্গে কি ব্যয়ও বাড়ে নাই? এবং ব্যয়ের অঙ্ক যাহা বাড়িয়াছে তাহা কি ঠিক আমাদের ইচ্ছাক্রমেই

বাড়িয়াছে; এই ব্যয়বৃদ্ধি বিষয়ে কি আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? এক একটা ছেলে মানুষ করিতেই এখন খরচ পড়ে কত? সেকালে ছেলেগুলা ভূমিষ্ঠ হইয়া 'উঙা উঙা' শব্দ করিত; একালের ছেলেগুলা ভূমি স্পর্শ করিবামাত্র 'ডাক্তার আন, ডাক্তার আন' বলিয়া কাঁদিতে থাকে। ডাক্তার বাবু আসিয়া অনেককে ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়া ভাবিষ্যতের খরচ কমাইয়া দেন, সুতরাং তাঁহার ভিজিটের টাকাটা নিতান্ত লোকসান মনে করা অন্যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা ছেলে ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়া পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল, অমনি তাহার স্কুলের খরচ যোগাইতে হইবে। ছাত্রবৃত্তি জ্যামিতি ও পরিমিতি ও ভূবিদ্যা ও পদার্থ-বিদ্যা ও ব্যাকরণ ও অর্থ ব্যবহার ও নীতিকথা ও তত্ত্বকথা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক শাস্ত্রগ্রন্থ ভীষণ ভার দুর্ব্বল শিশুর কণ্ঠরোধ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহস্থের ভাবী ব্যয়ের সংক্ষেপ সাধনের আশা দেয় বটে; কিন্তু আপাততঃ ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের মূল্য যোগাইতে গৃহস্থের প্রাণ অস্থির হয়।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া চাষার ছেলে আর লাঙ্গল ধরিতে চাহে না, কিন্তু আদালতে পৈষ্কারত্ব গ্রহণ করিয়া নানা কৌশলে অর্থোপার্জ্জনে ব্যুৎপত্তি লাভ করে, ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু ভদ্র গৃহস্থের ছেলেকে ইংরাজী পড়াইতে হয়। এন্‌ট্রান্স পাশ করিলে দূরদেশে কলেজে পাঠাইতে হয়। সেখানে কলেজের বেতন ও পুস্তকাদির হিসাবে যে খরচ পড়ে, থিয়েটারের পয়সা যোগাইতে তার তিনগুণ পড়িয়া যায়। এত প্রয়াসের ফলে যাঁহারা উপাধি ভূষিত হইয়া বাহির হয়েন, তাঁহাদের চাপরাশের ও সামলার মূল্যও সহজে আদায় হয় না। বিবাহ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের আশা থাকিলেও অন্ধ বিধাতা সকলকে কেবল পুত্ররত্নে সৌভাগ্যশালী করেন না।

এইরূপ সর্ব্বত্র। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই ব্যয়ের অঙ্ক অত্যন্ত

বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী সভ্যতা যেখানে যে পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণেই ব্যয়বাহুল্য হইয়াছে। আমাদের আয় বাড়িয়া থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যয়ও সেই অনুপাতে বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থার তেমন সুবিধা হইল কোথায়? অন্ততঃ আয় ব্যয়ের হিসাব করিতে গিয়া কোন্‌টা কত বাড়িয়াছে, তাহা না জানিলে আমাদের অবস্থা কিরূপ, তাহার নির্ণয় হইবে কিরূপে? সরকারি ও বেসরকারি উভয় পক্ষ কেবল আয়ের অঙ্ক বা কেবল ব্যয়ের অঙ্ক লইয়া আলোচনা করেন, উভয় দিক খতাইয়া দেখিলে এতদিন একটা মীমাংসা বোধ করি স্থির হইয়া যাইত। অথচ মীমাংসা এতকাল হইল না। ওয়েষ্টারবর্ণ, দাদাভাই নৌরজী ভারতবর্ষ দেউলিয়া হইল বলিয়া ক্রমাগত ষ্টেট্ সেক্রেটারীর কর্ণ-জ্বালার উৎপাদন করিতেছেন ষ্টেট্ সেক্রেটারী ক্রমাগত জবাব পাঠাইতেছেন—আমরা তোমাদিগকে ক্রমেই উত্তর দিক্ পানের দরজার নিকট লইয়া যাইতেছি। আমাদের পক্ষে এরূপ স্থলে তুষ্ণীম্ভাবই বিধি।

যাঁহারা আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি ও বিলাসিতা বৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের অবস্থার স্বচ্ছলতা অনুমান করেন, তাঁহাদের সেই অনুমানের যাথার্থ্যে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। অবশ্য অবস্থা ভাল না হইলে বিলাসের দিকে, খরচের দিকে, অনাবশ্যক অপব্যয়ের দিকে মানুষের মন যায় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম; এবং সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিলাসের উপকরণ আহরণ করে, তাহার অবস্থার স্বচ্ছলতা স্বভাবতঃই অনুমেয়। ইহা স্বভাবেরই নিয়ম; মানুষ কিছু পেটে না খাইয়া বাবুয়ানার ভরং পরে না। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের কি কোথাও ব্যভিচার নাই! বুদ্ধি-দোষে, সঙ্গ-দোষে কর্ম্ম-বিপাকে, প্রকৃতির তাড়ণায় মানুষ কি কখনও এই স্বাভাবিক নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না! কুবের পুত্রও আপনার অস্বাভাবিক প্রকৃতির তাড়নায় পৈতৃক ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া ভিক্ষা-বৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য হয়। ব্যক্তিপক্ষে

যাহা ঘটিতে পারে, ব্যক্তি সমষ্টি বা সমাজ পক্ষে তাহা ঘটা কি একেবারে অসম্ভব! সমাজ-চক্র কি বর্ত্তমান কালে ঠিক্ স্বাভাবিক নিয়মেই চালিত হইতেছে! আমাদের সমাজে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বাণিজ্য প্রভৃতি শ্রবণ নিনাদী শব্দ-সমূহ কি ঠিক্ অভিধান প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়! ইহা ভাবিবার বিষয় ও আলোচনার বিষয়।

আমরা বর্ত্তমান কালে যে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতেছি, সেই অবস্থা কি মনুষ্যসমাজের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে? আমাদের প্রভু জাতি মহামহিম মহৈশ্বর্য্যশালী, মহাজ্ঞান, মহানুভব, মহাশয়। কিন্তু আমরা তাঁহাদের তুলনায় সর্ব্বাংশেই ক্ষুদ্র! এবং মহত্ত্বের সান্নিধ্য ক্ষুদ্রের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রত্বকে কি আরও ক্ষুদ্র করিয়া দেয় না? আমরা পাশ্চাত্যে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাইয়াছি বলিয়া ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের সেই চিন্তা কি আমাদেরই চিন্তা? আমরা প্রাদেশিক শাসন কার্য্যে প্রভুশক্তি হইতে কতকটা ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি; কিন্তু গত দুই সপ্তাহ কালের কাউন্সিল গৃহের যাঁহারা সংবাদ রাখেন তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, সেই শাসন কি প্রকৃতই আমাদেরই আয়ত্ত?

আমরা বিলাতের লোকের সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য চালাইয়া থাকি; কিন্তু সেই বাণিজ্য কি সর্ব্বোতোভাবেই স্বাধীন?

আমি রাজনীতির সম্পর্ক একেবারে বর্জ্জন করিয়া নিতান্ত একাডেমিক্ অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রবলের সাহায্যে যে দুর্ব্বল মুগ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? সূর্য্য লোকের সন্নিধানে খদ্যোতের স্বাভাবিক দীপ্তি কতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়? মাতৃ ক্রোড়শায়ী স্তন্যপায়ী শিশুর কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে বটে, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্যের দৌড় কতটুকু? আমাদের সময়টী ঘটোঘ্নী গবর্ণমেণ্ট জননী আমাদিগকে যে স্তন্য পিযূষদানে অহরহ তৃপ্ত রাখিয়াছেন, এবং

ঘুম পাড়ানীয়ার গান অবিরত কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া আরামের পালঙ্কে আমাদের ঘুম পাড়াইতেছেন, আমাদের পিযূষপানের সুখ নিদ্রার ও স্বপ্ন দর্শনের স্বাতন্ত্রের দৌড় কতটুকু?

আমাদের অবস্থা কতকটা হট্‌হাউসের যত্ন পালিত চারার মত। আমরা যথাসময়ে জল পাই, আলো পাই, শীতাতপ উপভোগ করি, আমাদের কীটের ভয় নাই, বড় বড় মহীরুহ যখন প্রভঞ্জনের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভূমিশায়ী হয়, আমরা তখন গ্লাসকেশের ভিতর হইতে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া থাকি; কিন্তু হায়! দৈববিধানে আমাদের প্রভুর যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ শিথিল হয়, যদি আমাদের মালী মহাশয় একদিন আমাদের জল যোগাইতে ও সার যোগাইতে ভুলিয়া যান, তবে সংসারের নিষ্ঠুর জীবন দ্বন্দ্বে আমাদের উদ্ভিদিক জীবনের পরমায়ু কতটুকু হইয়া দাঁড়ায়?

আমাদের এই হট্‌হাউস পালিত জীবনে স্বাভাবিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অভিধানিক অর্থে নহে। অন্য সম্বন্ধে যে কারণে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, আমাদের সমাজে সে কারণে সে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস হইতে যে সকল সমাজতত্ত্বের সূত্র সঙ্কলন করিয়াছ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা প্রয়োগ করিতে যাইও না।

আমি বলিতে চাহি যে, এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের সমাজ শরীরের সকল ব্যাধির নিদান, এখন ইহাই একমাত্র ব্যাধি; অন্য সকলই তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র।

অরণ্যে রোদন।

এই উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে যদি অরণ্যের সহিত উপমিত করি, তাহা হইলে সভ্যমণ্ডলীর প্রতি এবং সভার আহ্বানকর্ত্তা চৈতন্য লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয় সত্য, কিন্তু আমাদের এই রোদন যে নিতান্তই অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্দেহ করিবেন না। তবে এই নিষ্ফল পরিশ্রমে কাজ কি, বলিয়া কেহ যদি প্রবন্ধপাঠককে এইখানেই নিরস্ত হইতে বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, বিনা রোদনে এই বাঙ্গালা জীবন অতিবাহন করা যাইবে কিরূপে? আমাদের এই সমগ্র শিক্ষিতসমাজ যদি আজ সহসা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন যে, কিছুতেই আমরা আর কাঁদিব না, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনে আর কর্ত্তব্য কি অবশিষ্ট থাকে, খুঁজিয়া মেলা দুর্ঘট হইয়া উঠে। নিতান্তই অন্য কর্ম্মের অভাবে আমরা এত দিন ধরিয়া বাল্যকালে মাষ্টার মহাশয়ের বেত্রগৌরবের ও যৌবনে আপিসের কর্ত্তার উপানৎগৌরবের উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলাম; কেন করিতেছিলাম, তাহা নিজেও ঠিক জানিতাম না, অন্যে জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দিতে পারিতাম না; আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের এত দিনের সেই প্রিবিলেজটা, সেই অধিকারটা, কাড়িয়া লইতে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও যদি একবার রোদন না করি, তাহা হইলে রোদনক্ষমতাই বা বিধাতা আমাদিগকে দিয়াছেন কিসের জন্য? এইরূপে উদ্দেশ্য সমর্থনের পর কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

* ১৫ই আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহোদয়ের সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে পঠিত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার লইয়া যে কোলাহল সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, সেই কোলাহলের অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় জন্তুটা কিরূপ, বুঝিবার একবার চেষ্টা করা উচিত। কেহ বলেন, উহা মাংসাশী, উহা কেবল বালকবৃন্দের রক্ত খায় ও হাড় চিবায়; কেহ বা বলেন, না, উহা উদ্ভিজ্জাশী ও তৃণভোজী, উহার বাঁটে দুধ পাওয়া যায়, উহার শিঙে ভেঁপু হয়, ও উহার হাড়ে আত্মারাম সরকারের প্রেতপুরুষ চমকিত হয়। প্রাণিতত্ত্বে বিদ্যা না থাকিলেও আমরা যখন উহার দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছি, উহার হাড়ে ভেলকি বাজি দেখাইয়া আসিতেছি, এবং এই মুহূর্ত্তেই যখন তারস্বরে ভেঁপু বাজাইতে দাঁড়াইয়াছি, তখন উহার সহিত আমাদের পরিচয় কিছু না আছে, এমন নহে। এবং সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু সেই শিক্ষাটাই বা কিরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ থিওরি প্রচলিত আছে। এক সম্প্রদায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য লিবারাল এজুকেশন দেওয়া। এই লিবারাল এজুকেশন শব্দটা খুব জমকাল শুনায়; দূর হইতে উহা সূর্য্যকর-মণ্ডিত আকাশচারী একখণ্ড মেঘের মত খুব জাঁকাল মূর্ত্তি গ্রহণ করে; কিন্তু কাছে ধরিতে গেলেই উহা কুয়াসার মত ধরা দেয় না। একটু চাপিয়া ধরিলে লিবারাল এজুকেশনের অর্থ দাঁড়ায়—সকল শাস্ত্রেই জ্ঞানলাভ, এবং সকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের নামান্তর সকল শাস্ত্রেই অপরিপক্বতা ও পল্লব-গ্রাহিতা। সকল শাস্ত্রে বলিলে বোধ করি ভুল হয়; যে সকল পণ্ডিতেরা কোন গূঢ় কারণে গণিত শাস্ত্রকেও বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ করি ঐ দুই শাস্ত্রকে লিবারাল এজুকেশনের বিষয় করিতে চাহেন না। ভাষা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস

প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই লিবারাল এজুকেশনের বিষয় হইতে পারে; গণিত বিজ্ঞানও যে না পারে তাহা নহে; তবে ঐ দুই বিদ্যা কতকটা টেকনিকাল গোছের; বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার স্থান না থাকিলেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু কি প্রাচীন কি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, সকল শাস্ত্রেই কিছু কিছু জ্ঞানদান এবং টেকনিকাল শাস্ত্রকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া লিবারাল বিদ্যাদানই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা বোধ হয় না। বরং বোধ হয়, কোন একটা বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইউরোপের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ন্যায়শাস্ত্র, থিয়লজি, আইন, গণিত শাস্ত্র, এমন কি সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি টেক্‌নিকাল শাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মাইবার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন টেক্‌নিকাল শাস্ত্রের আলোচনার জন্য ও অধ্যাপনার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একালের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন প্রভৃতি টেক্‌নিকাল শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির স্বতন্ত্র ফ্যাকল্‌টির যোগ হইতেছে। আর বিজ্ঞানের কথা,—বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপনাই একালের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেন সর্ব্বপ্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন চতুষ্পাঠীগুলিকে যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থানভুক্ত মনে করি, সেখানেও দেখিবে, কোথাও সাহিত্য, কোথাও ন্যায়শাস্ত্র, কোথাও বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কাজেই লিবারাল শিক্ষাদান অপেক্ষা টেক্‌নিকাল শিক্ষাদানই, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টা অপেক্ষা একটা কোন শাস্ত্রে গভীরতর পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এবং এক একবার বোধ হয়, তাহা হওয়াই উচিত। একটা দেশের দশটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতেই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিলে

কোনটারই ব্যবস্থা সুচারুরূপে ঘটে না; এক একটা বিশেষ শাস্ত্র অধ্যাপনার ভার এক এক বিশ্ববিদ্যালয় লইলে সকল শাস্ত্রেরই সম্যক্ চর্চ্চার সুবিধা হয়; এক জায়গায় না হইলে অন্য জায়গায় হয়।

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের গায়ে মোটা হরপে খোদা আছে "Advancement of Learning" অর্থাৎ বিদ্যার উন্নতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উন্নতিসাধনে কতটা সফল হইয়াছে, তাহা অনেকেই সন্দেহ করেন; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিদ্যার উন্নতিসাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছে। একালে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যেরূপ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা আছে, সেরূপ আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই; আর সর্ব্বত্রই লোকে শিক্ষা বিসয়ে জার্ম্মাণির অনুকরণের জন্যই লালায়িত। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল অধ্যাপনা বা জ্ঞানপ্রচার গৌণ উদ্দেশ্য; এবং জ্ঞানের উন্নতিই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতগণ নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে, নূতন নূতন সত্যের উদ্ঘাটনে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। শিক্ষার্থীরাও অধ্যাপকগণের নিকট সেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা শিখিতেছে, কালে তাহারাও সেই কার্য্যে ব্রতী হইবে। গবেষণা এখন অধ্যাপনার স্থান গ্রহণ করিতেছে। সেকালের অধ্যাপকেরা পুরাণ কথা শিখাইয়াই তৃপ্ত থাকিতেন; একালে আর পুরাতনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না; এখন নূতনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। অকসফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সত্যানুসন্ধানের বন্দোবস্তে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পায়ের নিকট বসিতে পারে না।

একটা অতি পুরাতন থিওরি আছে যে, মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষার মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, মনুষ্যের সমুদয় বৃত্তিগুলির সর্ব্বোতভাবে সামঞ্জস্যবিধান দ্বারা উহাদের

সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অধ্যাপক হক্‌স্‌লীও এক জায়গায় এইরূপই বলিয়াছেন। অকস্‌ফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে শাস্ত্রাধ্যাপনার ও শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীড়া কৌতুক ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা দেহের স্ফূর্ত্তি ও বিবিধ সামাজিকতাবর্দ্ধক অনুষ্ঠানের দ্বারা মানসিক স্ফূর্ত্তিসাধনের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজেরা কথায় কথায় তাঁহাদের স্পর্দ্ধিত জাতীয় জীবনের সহিত অক্‌স্‌ফোর্ডের সম্বন্ধের বর্ণনা করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপরে যাহাকে লিবারাল এড্‌জুকেশন বলিয়াছি, সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধনই বোধ করি উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য, এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না। আজকাল শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ specialization এর একটা ধুয়া উঠিয়াছে কিন্তু একটা বিষয়ে,সে বিষয়টা যতই গুরু হউক না,একটা বিষয়ে আবদ্ধ থাকিলে সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়,তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতা ব্যক্তিগত বলবৃদ্ধির পক্ষে যতই অনুকূল হউক না কেন, সমস্ত জাতির সাধারণ শিক্ষায়, উহা জাতীয় বলবৃদ্ধির বা মনুষ্যবৃদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না। কাজেই লিবারাল এড্‌জুকেশনের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অপর পক্ষ যে ইহা অস্বীকার করেন, তাহা নহে; তাঁহারা বলেন, ঐরূপ উন্নত অর্থে লিবারাল শিক্ষা বড় ভাল কথা; এমন কি আর একটু নীচে যাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানুষ হইতে হইলে সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, উহাও অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু ইঁহারা বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক এইরূপ শিক্ষার স্থান নহে। সকল শাস্ত্রে কিঞ্চিত অভিজ্ঞতা, যাহা সভ্যদেশে মনুষ্যমাত্রেরই আবশ্যক, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন পর্য্যায়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখান হইতেই আনা উচিত। আর ঐ যে খুব লম্বা কথাটা—সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধন,—তাহা কোন বিদ্যামন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে ঘটিতে পারে না। সেই

স্ফূর্ত্তিসাধনের জন্য বিদ্যামন্দিরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যসমাজের সুবৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; বিদ্যামন্দিরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র সমাজের তাহার অনুকরণ বা অভিনয় হইতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বশিক্ষার স্থান অন্যত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা সকল মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়েন নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তির শক্তি বিভিন্ন দিকে। সেই প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি বুঝিয়া সেই সেই ব্যক্তিগত শক্তি-বৰ্দ্ধনের চেষ্টা করিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা। সকলকে এক ভাবে গড়িতে গেলে কোনটার গঠনই মজবুত হয় না; প্রত্যেকের কাঠামোর বিশিষ্ট দিকে নজর দিয়া বিশিষ্টভাবে গড়িবার চেষ্টা করিলে, তাহার বল-বিধানে অধিকতর সফলতা ঘটিতে পারে। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র অতি ভীষণ; এখানে কেহ কাহাকেও খাতির করে না; এখানে দয়া নাই, মমতা নাই; এখানে সকলেই আপনাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সম্মুখসমরের উপযোগী বলসঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক। যে ব্যক্তি যে পথে গেলে শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহাকে সেই পথে যাইতে স্বাধীনতা দিলে তবেই সে যথাযথ শক্তিসঞ্চয়ের অবসর পাইবে; নতুবা একটা কাল্পনিক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আদর্শ খাড়া করিয়া অন্ধ, খঞ্জ, মূক বধির সকলকেই নিজ নিজ স্বাভাবিক বিকৃতি ও হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া সেই আদর্শের গঠন দিতে গেলে, অনর্থক পরিশ্রম ভিন্ন বিশেষ ফল হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকশিক্ষার্থীর পক্ষে সেই শক্তি-সঞ্চয়ের স্থান। শিক্ষার্থী যখন নাবালক থাকে, যখন সে নিজের মতিগতি প্রকৃতি কোন্ দিকে, তাহা নিজেই জানে না, তখনই নিম্নতর বিদ্যালয়ে তাহার যথাসম্ভব লিবারাল শিক্ষার বিধান কর, এবং পরে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন আপনাকে চিনিতে পারে, তখন তাহাকে আপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট পথে স্বাধীনভাবে চলিতে দাও; সকলকে জোর করিয়া

এক রাস্তায় চলিতে বাধা করিও না; তাহা হইলেই প্রত্যেকের পক্ষে মঙ্গল হইবে ও সমাজের পক্ষেও মঙ্গল হইবে।

উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদের গণ্ডগোলে আর সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। ফলে, উভয় পক্ষের উক্তিতে কিছু না কিছু সত্য আছে। মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে তাহার একদেশের গঠন দ্বারা তাহার বলবিধান, অতি উত্তম কথা; এবং মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে পূর্ণতা প্রদান আরও উত্তম কথা। কিন্তু যে উদ্দেশ্যটা যত উত্তম, সেই উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ সাধন করা তত কঠিন। ইংরাজেরা বলিতে পারেন, আমাদের অক্‌সফোর্ড আমাদের সামাজিকত্বে আমাদের মনুষ্যত্বে পূর্ণতা প্রদান করিয়া আমাদের জাতীয় শক্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারই বলে আমরা ভূমণ্ডলকে তোলপাড় করিতেছি, তাহারই বলে আমাদের পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য, আমাদের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য * * হইতে পারে; তোমরা বড় তোমাদের মুখে সকল কথাই শোভা পায়। আবার জার্ম্মাণি বলিতে পারেন আমাদের সহস্র বিদ্যামন্দিরে আজ শত বৎসর ধরিয়া যে ব্যক্তিগত বিশিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারই ফলে দেখ আজিকার জার্ম্মাণ সাহিত্য, জার্ম্মাণ বিজ্ঞান, জার্ম্মাণ দর্শন, জার্ম্মাণ পাণ্ডিত্য, জার্ম্মাণ শিল্প, জার্ম্মাণ সঙ্গীত এবং সকলের উপর সেই উদ্ধত, স্পর্দ্ধিত, জার্ম্মাণ জাতীয়তা, যাহার ফলে-সাড়ানক্ষেত্র, যাহার ফলে "mailed fist", যাহার ফলে "make no prisoners," যাহার ফলে অন্য জাতির চক্ষুঃশূল "made in Germany !" আমরাও বলি, সত্য কথা; তোমরাও বড়, তোমাদের মুখেও সকল কথাই শোভা পায়। সফলতা দেখিয়া বিচার করিতে গেলে হয় ত জার্ম্মাণ শিক্ষা-নীতিকেই প্রাধান্য দিতে একবার ইচ্ছা হয়; জার্ম্মাণের জীবনগঠনে জার্ম্মাণ শিক্ষানীতির প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং যখন দেখা যায়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই জার্ম্মাণি কি ছিল, কি হইয়াছে, তখন ঐ শিক্ষা-

নীতির প্রতি পক্ষপাত আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আর ইংরাজ যখন অক্‌সফোর্ডের গল্প করেন, তখন ইংরাজের বর্ত্তমান অবস্থা কতটা ইংরাজের শিক্ষানীতির ফল, আর কতটাই বা ইংরাজের বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীক অভিব্যক্তির ফল, আর কতটাই বা তাহার নিবাস ভূমি ক্ষুদ্র দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের ফল, তাহার সম্যক্ মীমাংসা দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজকাল একটা নূতন কথা শুনা যাইতেছে; কিছুদিন পূর্ব্বে এ কথাটা তেমন স্পষ্টভাবে শুনা যাইত না। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত থিওরি প্রচলিত আছে। একটার ইংরাজী নাম individualism ব্যক্তিতন্ত্রতা, আর একটার নাম socialism সমাজতন্ত্রতা। এক দল বলেন, ব্যক্তির জন্যই সমাজ; আর এক দল উল্টাইয়া বলেন, সমাজের জন্যই ব্যক্তি। ব্যক্তির উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, ও সমাজের উন্নতি না হইলে ব্যক্তির উন্নতি হয় না; কাজেই একের স্বার্থে অন্যের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত। সত্য কথা; কিন্তু সত্য হইলে কি হয়। এক দল বলেন, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে দাও; সমাজের যে ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তির অনুকূল, তাহাই বজায় রাখ; তবে কি না, সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই; সেই জন্য সমাজ রাখিবার জন্য যতটুকু দরকার, সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ততটুকু সঙ্কোচন কর। এই মতের এক জন প্রসিদ্ধ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সর। অন্য পক্ষ বলেন, যখন সমাজের কুশলের উপরই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, তখন সমাজের মঙ্গলার্থ ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তজ্জন্য ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সমাজের অধীন রাখিতে হইবে; তবে যেটুকু স্বাধীনতা দিলে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, সেইটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে পার। আজকালকার অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত পণ্ডিত এই মতের পোষণ করেন।

বেশী দিনের কথা নহে, যখন রেলওয়ে ও ষ্টীমার সহসা ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া ধরাপৃষ্ঠের আয়তন সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং টেলিগ্রাফের তার বায়ুপথে উড্ডীন ও জলপথে নিমগ্ন হইয়া কালেরও সংক্ষেপসাধন করিয়া ফেলিল, তখন বড় বড় তত্ত্বজ্ঞ মহানন্দে নৃত্য করিয়া বলিলেন, এইবার মানবজাতিসমূহ চিরন্তন হিংসাবিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে ও পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে জড়াজড়ি করিবে। অধিক দিন গত হয় নাই, কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের এই ঘনিষ্টতাবন্ধনের ফল অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির সহিত জাতির প্রেমালিঙ্গনের পাশটা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; বিশেষতঃ, সভ্যজাতি যখন অসভ্যজাতিকে প্রেমপাশে বাঁধিয়া ফেলে, সে দড়ি ছেঁড়ে কাহার সাধ্য ! * * * এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্য জাতির প্রেমালিঙ্গন শিবাজী ও আফজল খাঁয়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রেমালিঙ্গনকে স্মরণ করায়। হার্বার্ট স্পেন্সর আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, অচিরে সভ্য জগতে সামরিক যুগের অশান্তির অবসান ঘটিয়া বাণিজ্য যুগের চিরশান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই মহামনা বৃদ্ধ দার্শনিক আজ পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; এবং তিনি দুঃখ ও নৈরাশ্যের আর্দ্রনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, বাণিজ্যকে উপলক্ষমাত্র করিয়া মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি, সমাজ সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ছুরিকা আস্ফালন করিতেছে। যাহাদের সহিত বন্ধুত্বের আশা ছিল, তাহারা দারুণ শত্রুতে পরিণত হইয়াছে ; এবং বিশাল বসুন্ধরা প্রত্যেকের পক্ষে এক বিশাল শত্রুপুরীতে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক রাষ্ট্র আপনার প্রতিবেশী হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা বিনিদ্রভাবে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং কিসে শত্রুর ক্ষয় ও আপনার জয় হয়, তাহাই উহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যক্তিতন্ত্রের অবনতি ও সমাজতন্ত্রের অথবা রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিব্যক্তি। রাষ্ট্র কিরূপে

বড় হইবে, রাষ্ট্র কিরূপে বলিষ্ঠ হইবে, রাষ্ট্রের কিরূপে গৌরব বাড়িবে, রাজনীতিবিৎ হইতে সাহিত্যসেবী পর্য্যন্ত সকলেরই তাহাই প্রধান চিন্তার কারণ হইয়াছে। ব্যক্তির জীবন কিসের জন্য? রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রকে বাড়াইবার জন্য। রাষ্ট্রের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে ব্যক্তিকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিংশ শতাব্দী এই রাষ্ট্রতন্ত্রকে বক্ষে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

কোন্ শিক্ষানীতি উৎকৃষ্ট, এখন কি আর খুলিয়া বলা আবশ্যক? উহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষানীতি, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষণে সম্যক্‌রূপে সমর্থ করে। সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যে শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বলাধান করিয়া, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া, তাহাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের দাসত্বের জন্য উপযোগী করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার প্রতিবেশীর জন্য যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে; রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সর্ব্বদা শিক্ষিত সৈনিকরূপে আপন রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। সেই সকল পুরাতন কথা এখন আর শোনা যায় না, অথবা এখন তাহা নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির সমগ্র বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে হইবে;—উত্তম কথা; কেন না, তাহার সমগ্র বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে উহা রাষ্ট্রের ইষ্টসাধনেই আবশ্যক হইবে। শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিশিষ্টভাবে আপন আপন পথে অভিব্যক্ত করিতে হইবে;—অতি উত্তম কথা; কেন না, ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইলেই ত রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান বা উচ্চশিক্ষাদান; কিন্তু সংসারের ভীষণ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ বা আত্মপ্রতিষ্ঠার্থ শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ করিয়া

রাষ্ট্রের হিতসাধনই সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ; তবে রাষ্ট্রের হিতেই যখন তাহার হিত, রাষ্ট্র নষ্ট হইলে তাহার ব্যক্তিত্বও যখন ধ্বংস পাইবে, তখন গৌণভাবে এই শিক্ষা দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রবিৎ, রাজনীতিবিৎ ও একালের শিক্ষানীতিবিৎ, সকলেই শিক্ষার এই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি নিম্ন বিদ্যালয়, কি লাবরেটরি, কি লাইব্রেরি, কি কারখানা, সর্ব্বত্র, এই শিক্ষার উৎকর্ষবিধানের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জার্ম্মাণিতে এই শিক্ষানীতি সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জার্ম্মাণিতেই এই শিক্ষানীতি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী গঠিত সংস্কৃত ও পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য দেশ ও অন্যান্য জাতি এই জাতির অনুসরণের জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে মাত্র। অনেকটা সফলও যে না হইয়াছে, তাহা নহে ; চক্ষুর সম্মুখে উদাহরণ জাপান।

বস্তুতই আজ আমি অরণ্যে রোদনে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমাকেও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এতক্ষণ শিক্ষানীতি সম্বন্ধে এত বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা পরমসহিষ্ণু শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিলাম, আমার রোদনের ও চীৎকারের এই অংশের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কেন না, আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রসঙ্গে ইহার মধ্যে কোন শিক্ষানীতিরই প্রয়োগের অবসর মাত্র নাই। আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র সম্প্রতি বর্ত্তমান, অধ্যাপক সীলি সেই শ্রেণীর রাষ্ট্রকে inorganic state, অঙ্গহীন বা ছিন্নাঙ্গ সুতরাং জীবনহীন রাষ্ট্র, সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আলোচনার অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাত করিয়াছেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি বৈদেশিকের হস্তে ; যেখান হইতে শক্তির পরিচালনা হয়, তাহার সহিত সমগ্র সমাজের কোন জীবন্ত সম্বন্ধ নাই, কোন চেতনার সম্পর্ক নাই সমাজশরীর তাহার মস্তিষ্ক হইতে এতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, একের

উপর আঘাত অন্যকে স্পর্শ করে না, একে বেদনা পাইলে অন্যত্র তাহার সমবেদনার সঞ্চার হয় না। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত যখন রাষ্ট্রভুক্ত জনসঙ্ঘের কোন সম্পর্ক নাই, তখন ইউরোপের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির প্রয়োগেরও এখানে কোন্ অবসর দেখি না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে ও হিতসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। মৃত্তিকা রস যোগাইয়া ও সার যোগাইয়া গাছকে পোষণ করে সত্য কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্তিকা গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে গণ্য হয় না; সেইরূপ, আমরাও কর দিয়া ও অন্ন যোগাইয়া রাষ্ট্রের পোষণ করিতেছি, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা রাষ্ট্রের অঙ্গমধ্যে গণিত নহি; আমরা রাষ্ট্ররূপী বৃক্ষের শাখা পল্লব ফল ফুল কিছুরই মধ্যে নহি, আমরা তলস্থ উর্ব্বরা ভূমিমাত্র; তাহার উপর ভর দিয়া বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার রস শোষণ করিতেছে, এবং তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ছায়া দিতেছে, এবং প্রতিবেশী গাছ আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। আমাদের এই অধম নির্জীব অস্তিত্ব যে কখনও রাষ্ট্রীয় হিতসাধনে ও স্বার্থের রক্ষণে নিযুক্ত হইবে, রাষ্ট্র তাহা আশা করে না, বা অপেক্ষা করে না। আমাদের যাহা রাষ্ট্র, তাহা আমাদের হইতে স্বাধীন, তাহা আমাদের মুখাপেক্ষা করে না, তাহা আমাদের বলে বলীয়ান্ নহে, তাহা আপন বলে বলীয়ান্—অমিততেজে বলীয়ান্। * * *

সুতরাং ইউরোপের প্রচণ্ড রাষ্ট্রীক শিক্ষানীতির আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতে পারে, এরূপ মনে করা বাতুলতামাত্র। তবে আমাদের মহামহিম মহাবল মহানুভাব রাষ্ট্র আমাদিগকে যে নির্জ্জীব মানবজীবনধারণের অধিকার দিয়াছেন, সেই মানবজীবনের যথাসম্ভব স্ফূর্ত্তির জন্য আমাদেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এবং আমাদেরও একটা শিক্ষানীতি আছে। তাহার সহিত পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষানীতিসমূহের তুলনায় আলোচনায় কোনই প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রের উন্নতি, রাষ্ট্রের বলবিধান, রাষ্ট্রের

হিতসাধন প্রভৃতি ত দূরের কথা; শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল থিওরির উল্লেখ করিয়াছি, সে সকলেরও এ দেশে যথাযথ অর্থে প্রয়োগ সম্ভবে না। লিবারাল এডুকেশনের উচ্চতম অর্থ বলিয়াছি—সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্যসাধনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফুর্ত্তিসাধন; কিন্তু যে জাতির সমস্ত শুভাশুভ পরহস্তগত, * * তাহাদিগের উদ্দেশে অত দীর্ঘ সুললিত বাক্য প্রয়োগ করিলে নিতান্তই উপহাস করা হয়। আবার টেক্‌নিকাল এডুকেশন অর্থাৎ বিশিষ্ট ঐকদেশিক শিক্ষা ব্যক্তিগত শক্তির উন্মেষণের পক্ষে উপযোগী; এ সকল বাক্যও তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা নিষ্ফল। যাহাদের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উপায় নাই; যাহাদের রুচি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই রুচির পরিতৃপ্তির উপায় নাই; যাহাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রয়োগের স্থান বা অবকাশ নাই; তাহাদের পক্ষে এই শিক্ষানীতির কথা তোলাও অনাবশ্যক। ঐ সকল লম্বা লম্বা কথা, ঐ সকল দীর্ঘ সমাস, ঐ সকল সুললিত বিশেষণবটা, ঐ সকল পাণ্ডিত্য-পূর্ণ থিওরি ত্যাগ করিয়া আমাদের দুর্বল হীন inorganic জীবনের উপযোগী শিক্ষানীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

ফলেও দাঁড়াইয়াছে তাহাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে আইনের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, সেই আইনের preamble মধ্যে আমাদের শিক্ষা-নীতির উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। "It has been determined to establish a University at Calcutta for the purpose of ascertaining by examination the persons who have acquired proficiency in different branches of Litera ture, Science and Art and of rewarding them by academical degrees as evidence of their respective attainments." এই ইংরাজীর বাঙ্গালা অনুবাদ আবশ্যক নহে; কিন্তু ইহার মধ্যেও দুই

চারিটা সুদীর্ঘ ও সুললিত বিশেষণ যখন রহিয়াছে, তখন ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা আবশ্যক।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, অন্যান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকার্য্য ও পরীক্ষাকার্য্য উভয়ই স্বহস্তে গ্রহণ করেন। লণ্ডনে একটা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভার না লইয়া কেবল পরীক্ষার ভার লইতেন। সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইল। ছাত্রেরা যেখানে হউক, বনে জঙ্গলে হাটে মাঠে ঘাটে শিক্ষা পাইয়া আসিবে; বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দেখিবেন, তাহাদের কোন্ শাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে এক একটা ছাপ দিয়া, এক একটা উপাধি দিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিবেন। লোকে যেন বুঝিতে পারে এই এই ব্যক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছে, আর অন্য ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায় নাই। শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ, দুই কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন; শিক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষকে মানুষ করা; আর পরীক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষ মানুষ হইয়াছে কি না দেখা, অমানুষের মধ্য হইতে মানুষ বাছিয়া লওয়া। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে এমন কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে অমানুষ হইতে নিঃসন্দেহে মানুষ ছাঁকিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বৃহৎ ছাঁকনি বা চালুনি যন্ত্র মনে করিতে পারি। চালুনিতে হাজার কতক মানুষ অমানুষ ফেলিয়া দেওয়া হয়; চালুনিতে নাড়া দিলে তাহার ছিদ্র দিয়া মানুষগুলা বাহির হইয়া আসে; অমানুষগুলা তফাৎ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, চালুনি যেমনি হউক, উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। যখনই নাড়া দেওয়া যায়, তখনই মানুষের গা লাগিয়া কতকগুলি অমানুষও বাহির হইয়া আসে; আর অদৃষ্ট দোষে অতি উৎকৃষ্ট মানুষও সময় সময় আটকাইয়া যায়। কাজেই একবার নাড়া দিলে চলে না, দুই তিনবার নাড়া দিয়া শস্য হইতে তুষকে পৃথক

করিতে হয়। কিন্তু শস্যের শস্যত্ব উৎপাদনের জন্য চালুনি যন্ত্র দায়ী নহে। সে কেবল আপনাকে নাড়া দিয়াই খালাস। শস্য যেখান হইতে আসুক, তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায় না।

যে এজুকেশন ডেস্প্যাচের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, the Universities were to be established *not so much to be in themselves places of instruction, as to test the values of the education obtained elsewhere*; অর্থাৎ কি না, শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে দায়ী থাকিবেন না; মূর্খে যেন ফাঁকি দিয়া পণ্ডিত নামে উত্তরাইয়া আসিতে না পারে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার জন্যই দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের উপর Advancement of Learning যতই চক্‌চক্ করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে Advancement of Learning এর কোনই উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাটে মাঠে ঘাটে লোকে শিক্ষা পাইয়া আসিবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে বাজাইয়া লইবেন মাত্র; যেন মেকি চালান না হয়। হাট মাঠ ঘাট হইতে যদি কেহ শিক্ষা পাইয়া বাদন সহ্য করিতে না আসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তাহাতে কিছু যায় আসে না। কেহ আসে, ভালই; তাহাকে বাজাইয়া লইব; কেহ না আসে, আরও ভাল, বাজানর পরিশ্রম রহিল না। তবে নিতান্তই হাট মাঠ ঘাট যে যেখান হইতে আসিবে, সকলকেই বাজাইতে হইলে পরিশ্রমের বড় আধিক্য হয়; তজ্জন্য নিয়ম হইল যে সকল ঘাটের ও সকল হাটের পরীক্ষার্থীকে আমরা বাজাইব না; আমাদের জানা শুনা চিহ্নিত হাট মাঠ ঘাট হইতে যাহারা আসিবে, তাহাদিগকে খুব জোরে বাজাইব। উহার উদ্দেশ্য কেবল পরিশ্রম বাঁচান।

*

ফলে দাঁড়াইল এই, এ দেশে কয়েকটি ছাঁকনি যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইল, তাহাদের খুব জাঁকাল নাম দেওয়া হইল, বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্তু কার্য্যতঃ হইল বিশ্বপরীক্ষালয়। যে হেতু কোন যন্ত্র হইতে এক ক্রান্তি বিদ্যার উদ্গমের কোন ব্যবস্থা থাকিল না। লোকে অন্য স্থান হইতে বিদ্যা পাইয়া আসিবে, চালুনিতে নাড়া দিয়া দেখা যাইবে, কাহার বিদ্যা কত মোটা। ও যাহাদের বিদ্যা বেশ মোটা সোটা, তাহাদিগকে তপ্ত মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ও বলা হইবে, যাও বৎস, এই বিশাল সংসারক্ষেত্রে তৃণ শষ্পের অভাব নাই, চিহ্নিত পুচ্ছ লইয়া সুখে চরিয়া খাও; "and ever in your life and conversation show yourself worthy of the same." এইখানে বলা আবশ্যক যে, যে সকল পরীক্ষার্থী এই চিহ্ন লইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেন ও হইয়া থাকেন, এই চরিয়া খাইবার অধিকারপ্রাপ্তি ভিন্ন তাঁহাদের মনের মধ্যে অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র ছিল না ও নাই। আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তখনও এক প্রকার দেশী বিদ্যা প্রচলিত ছিল, এবং ভট্টাচার্য্যের টোলে ঐ বিদ্যা প্রদত্ত হইত; সে বিদ্যার অন্য কোন মূল্য থাক আর নাই থাক, উহার সহিত রজতকাঞ্চনের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। যে মূঢ়েরা সেই বিদ্যা-উপার্জ্জনে জীবন অতিবাহিত করিত, তাহাদিগকে ঘরের কড়ি খরচ করিতে হইত না, এবং যাহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিত, তাহারাও বিদ্যার বিনিময়ে পরের কড়ি আদায় করিবার সুবিধা পাইত না। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যা দেশে প্রচলিত হইবামাত্র লোকে দেখিতে পাইল যে, ইংরাজেরা সমুদ্র পার হইতে নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী আনিয়াছেন, তার মধ্যে এও একটা অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী। অতি সহজে এ একটা পেট ভরিবার উপায়। এই বিদ্যার উপার্জ্জনে প্রথমত কিঞ্চিৎ কড়ি

খরচ করিতে হয় বটে ; কিন্তু তার পর ইহা বেচিয়া, বা ইহার বিনিময়ে, বা ইহার নামে, যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। অর্থোপার্জ্জনের যত পন্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এইটাই সব চেয়ে সহজ পন্থা হইল। ইহাতে অধিক মূলধনের দরকার হয় না, ইহাতে অধিক ব্যবসায়বুদ্ধি আবশ্যক হয় না, এবং সব চেয়ে সুবিধা—ইহাতে দেউলিয়া হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কাজেই এই নিরন্ন দেশের ক্ষুধাতুর লোকেরা দলে দলে এই বিলাতী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইবার জন্য ঝুঁকিতে লাগিল ; এবং দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চালুনির ভিতর প্রবেশ করিয়া মুহুর্মুহুঃ চালুনির ঝাঁকেড় সহ্য করিতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে ভাইস চ্যান্সেলার বিদ্যার মহিমা ও শিক্ষার গরিমা সম্বন্ধে যতই তত্ত্বকথা উপদেশ দিন না কেন, এ দেশের শিক্ষার্থীর মধ্যে পৌনে ষোল আনার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইবার একমাত্র উদ্দেশ্য কোনরূপে জীবিকার সংস্থান। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, ইহা লুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা সাহিত্য চাহে না, দর্শন চাহে না, তাহারা চাহে কেবল উদরান্ন। পৃথিবী গোলই হউক, আর ত্রিকোণই হউক, পৃথিবী স্থিরই থাকুক, আর বন বন্ করিয়াই ঘুরুক, চন্দ্র মৃৎপিণ্ড হউন বা সুধাভাণ্ড হউন, ম্যাকবেথের রচনাকর্ত্তা সেকস্পীয়র হউন আর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি হউন, পলাশী যুদ্ধের বিজেতা ক্লাইবই হউন, আর চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদকই হইন, তাহাদের তাহাতে কিছুই যায় আসে না ; তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, যাহাই গলাধঃকরণ করিতে বলিবে, তাহারা তাহাই করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। এবং তাহারা যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে পূর্ণ বৈরাগ্যের সহিত দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যের বিবিধ মিষ্টান্ন, তিক্তান্ন, পলান্ন, খেচরান্ন

উদরস্থ করে, তাহাতে তাহাদের অধ্যবসায়ের, তাহাদের সহিষ্ণুতার, তাহাদের অনাসক্তির, তাহাদের বৈরাগ্যের, তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এবং আমরা তাহাদিগকে কিছুতেই দোষ দিতে পারি না। এই নিরন্ন দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থী দর্শন বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য বুঝে না, কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে জানে না, "বিদ্যার জন্য বিদ্যার গৌরব" করিতে জানে না, ইত্যাদি দীর্ঘচ্ছন্দ কথা বলিয়া যাঁহারা বিদ্রূপ করেন ও টিটকারি দেন, তাঁহারা নিতান্তই হৃদয়হীন। তাহারা যে উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে না, তজ্জন্য তাহাদিগকে উপহাস করা নিতান্ত অমানুষের কাজ। এবং যখন দেখিতে পাই যে, আমাদের অধিকাংশ দরিদ্র শিক্ষার্থী পরের নিকট ধারকরা জীর্ণ গাউনে কথঞ্চিৎ শরীর আবৃত রাখিয়া ভাইস চ্যান্সেলারের হস্ত হইতে কম্পিতহস্তে সাধের ডিপ্লোমাখানি গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উৎফুল্ল হয়, কিন্তু তাহার পর সেনেটহাউসের সোপানবলী অতিক্রম করিয়াই আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন আঁধার দেখে; যখন দেখিতে পায়, তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা, তাহাদের বিধবা পিসী মাসী, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত ভাই ভগিনী, বড় আগ্রহের সহিত বহুবৎসর ধরিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সেই আশা-পূরণের বিশেষ কোন ভরসা নাই; যখন দেখিতে পাই, শতের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সফলতা উপার্জ্জন করে, কিন্তু বাকী পঁচানব্বই জনকে অধম কেরাণীজীবন অথবা তদপেক্ষা হীনতর অন্য কোন বৃত্তি আশ্রয় করিয়া প্রত্যহ শত অপমান নীরবে সহ্য করিতে হয়, অপমানের অশ্রুধারা তাহাদের গণ্ডদেশ দিয়া বিগলিত হইতে পারে না, কিন্তু লোকলোচনের অন্তরালে তাহাদের অভ্যন্তরে ক্ষরিত হইয়া তাহাদের হৃদয়কে ক্লিন্ন করে, তাহাদের প্রাণকে জীর্ণ করে, তাহাদের অন্তরিন্দ্রিয়কে অবসন্ন করে; এবং সে এই অপমান নীরবে সহ্য করে, কেবল নিজের জন্য

নহে, পরের জন্য, পিতা মাতার জন্য, স্ত্রী পুত্রের জন্য, ভাই ভগিনীর জন্য, নিরাশ্রয় মাসী পিসীর জন্য, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, ধর্ম্মপালনে যদি জ্ঞানার্জ্জনের অপেক্ষা গৌরব থাকে, এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যদি মানব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে হে বিধাতঃ, হে দেবদেব, এই দরিদ্র জীবগণকে তুমি দয়া করিও।

গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন যে কেবল আমাদের দেশেই আছে, এমন নহে, এবং অন্নাভাব যে কেবল ভারতবর্ষীয় জনগণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, তাহা নহে। অন্য দেশেও জীবনসংগ্রাম অধিকাংশ নরনারীর পক্ষে অতি তুমুল ব্যাপার; এবং সেই জীবনসংগ্রাম হইতে সর্ব্বদেশে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকলের উৎপত্তি। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য অতি উৎকৃষ্ট বস্তু; উহারা মনুষ্যকে উন্নত করে, উচ্চ পর্য্যায়ে অধিরূঢ় করে, মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সাধন করে। কিন্তু জগতে মনুষ্যসংখ্যার তুলনায় অন্নের সমষ্টি যখন নিতান্ত অধিক নহে, এবং সেই অন্নের জন্য সংগ্রামেই জীবজগতের প্রতিষ্ঠা, তখন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ যে অন্নার্জ্জনের জন্য অবকাশহীন হইয়া নিযুক্ত থাকিবে, তাহা বিচিত্র কি? এ বিষয়ে পাশ্চাত্যে ও ভারতবর্ষীয়ে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু এক বিষয়ে প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে মনুষ্যের অন্নার্জ্জনের জন্য সহস্র পন্থা বিদ্যমান আছে। যে সকল দেশ ভাগ্যবলে ও ঐতিহাসিক নিয়মবলে আজকাল উন্নতির পদবীতে দণ্ডায়মান আছে, তাহাতে অন্নার্থীর অন্নাগমনের জন্য সহস্র পন্থা মুক্ত রহিয়াছে। সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য ভীষণ উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান আছে। দেশের মধ্যে সহস্র কারখানা, সহস্র টেক্‌নিকাল স্কুল, দেশের লোককে অন্নার্জ্জনের উপায় দেখাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার, সত্যের আবিষ্কার প্রভৃতি অতি উন্নত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যে স্পর্দ্ধা করেন, সেই জ্ঞানবিস্তারের মূলে, সেই সত্যা-

বিস্তারের মূলেও যে মানবের অন্নার্জ্জনস্পৃহা, মনুষ্যজীবনের চিরন্তন বুভুক্ষা বর্ত্তমান নাই, এমন নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহারা সকলেই যে পাণ্ডিত্যপ্রয়াসী, সকলেই যে সত্যান্বেষী, সকলেই যে বিদ্যার উপাসক, অন্নার্জ্জন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলিতে পারা যায় না। বিদ্যার সহিত অন্নের সম্বন্ধ থাকা বড়ই পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই ; এবং বিদ্যার সহিত অন্নের সম্পর্কের অভাব যদি কোন দেশে বর্ত্তমান ছিল বা থাকে, তাহা এই আমাদের অন্নহীন ভারতবর্ষেই ছিল. এবং এখনও বোধ করি ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীর ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে তাহা নাই। তবে সে দেশে যে কেবল অন্নার্থীমাত্র, তাহার জন্য অন্য উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে ; বিশ্ববিদ্যালয় তাহার একমাত্র দ্বার নহে। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ। আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি ভিতরে শান্তি রক্ষা করেন, বিচার দান করেন, দেশকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, এবং টেলিগ্রাফ ও রেলপথ খুলিয়া বৈদেশিক সামগ্রীর শুভাগমনের ও দেশীয় সামগ্রীর অন্তর্দ্ধানের উৎকৃষ্ট উপায় বিধান করেন। কিন্তু তদ্ভিন্ন দেশের লোককে অন্নার্জ্জনে সাহায্য করা আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্ত্তব্যমধ্যে গণিত হয় না। এ দেশে কল নাই, কারখানা নাই, টেক্‌নিকাল স্কুল নাই, শিল্প নাই বা যাহা ছিল, তাহাও যাইতে বসিয়াছে ; বাণিজ্য নাই, কেন না দেশীয় বণিকের পণ্যদ্রব্যবাহী পোতকে বিদেশে প্রেরণের জন্য যে সঙ্গীন বন্দুক কামানের প্রয়োজন, সেই সঙ্গীন বন্দুক কামান সরবরাহ করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। * * * এ দেশের ভূমিতে কেবল শস্য জন্মে, দেশের প্রায় সমস্ত লোকে সেই শস্য-উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং যে বৎসর শস্য জন্মে, সে বৎসর খাইতে পায়, যে বৎসর জন্মে না, সে বৎসর মরিবার অধিকার কেহ কাড়িয়া লয় না ; আমাদের রাষ্ট্রশক্তি সেই শস্যসম্পত্তির রাজভাগ গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রজার জীবনোপায়

সম্যক্ বর্ত্তমান থাকে কি না, তাহা যে মাননীয় মহোদয় * অদ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তাঁহার সদুত্তর পাইবেন, আমার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এ দেশের লোক যখন আবিষ্কার করিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলে অন্নার্জ্জনের কিছু সুবিধা হইতে পারে, তখন যে তাহারা সেই সুবিধার আশ্রয়-গ্রহণ করিবে, তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। যে সময়ে এ দেশে ইংরাজী বিদ্যার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে ইংরাজের রাজকার্য্য সুচারুভাবে পরিচালনের জন্য কুলি মজুর চাপরাসী হইতে মুন্সেফ ডেপুটি পর্য্যন্ত অনুগ্রহ আবশ্যক হইয়াছিল; তাঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে করিয়া কুলি মজুর মুন্সেফ ডেপুটি প্রভৃতি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় 'ইণ্ডিল মিণ্ডিলে' কিঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার উপায় নাই, এবং গবর্ণমেণ্ট যখন চিহ্নিতগণের জীবিকার সংস্থান করিতে লাগিলেন, তখন দেশের লোকেও যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 'ইণ্ডিল মিণ্ডিলে' অধিকারী হইতে লাগিল, তাহা বিচিত্র কি?

ফলে অন্য দেশে শিক্ষানীতি যাহাই হউক, আমাদের দেশে সে সকলের প্রয়োগের একান্ত অভাব। অন্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চ্চা করেন, সত্যাবিষ্কার করেন, মনুষ্যের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিকাশের চেষ্টা করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রের কর্ম্মঠ ভৃত্যে পরিণত করেন, মনুষ্যের সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি সাধন করেন। তাঁহারা যথার্থই শিক্ষা দেন, এবং এত যত্নেও যদি কেহ শিক্ষা না পায়, তাহাকে শিক্ষিতের চিহ্ন না দিয়া জীবিকার জন্য অন্য পন্থা আশ্রয় করিতে বলেন। আমাদের দেশে শিক্ষার সে সকল উদ্দেশ্য নাই। এ-দেশের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ঐরূপ বুঝিলে শিক্ষানীতিকে উপহাস করা

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই.।

হয়, এবং স্বয়ং প্রতারিত হইতে হয়। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাই দেন না। তাঁহারা কেবল পরীক্ষা করেন। যাহারা অন্যত্র শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবিকার্জ্জন, চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি-লাভও নহে, মনুষ্যত্বের বৃদ্ধিও নহে, পাণ্ডিত্যের অর্জ্জনও নহে। তবে মনুষ্য কোন দেশেই নিৰ্জ্জীব পদার্থ নহে; দুই এক জন মনুষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া সহসা পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করিয়া ফেলে, জীবিকার্জ্জনের জন্য তেমন লালায়িত হয় না; সে তাহার দোষ নহে, তাহার মনুষ্যত্বের দোষ। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষার্থীদিগের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাদিতে পরীক্ষা গ্রহণ করেন সত্য বটে, এবং কেহ কেহ অকস্মাৎ সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে পরিপক্কও হইয়া উঠে, সত্য কথা; কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সে উদ্দেশ্য নহে। অপিচ বিশ্ববিদ্যালয় যে উপায়ে পাণ্ডিত্য-পরীক্ষা করেন, সে উপায়ও পাণ্ডিত্যপরীক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। এ দেশের সকল শিক্ষার্থীরই যে এই হীন উদ্দেশ্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না; অন্যান্য সভ্যতর দেশেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা উচ্চ নহে। কিন্তু সে দেশে সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না; তাঁহাদের জীবিকার্জ্জনে শক্তি প্রদানের জন্য অন্য সহস্র শিক্ষাগার বর্ত্তমান আছে। আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়মাত্র অগতির গতি, একমাত্র উপায়। সত্য বটে, আজকাল গবর্মেণ্ট দেশের লোকের জন্য কৃষি-বিদ্যালয়, চিকিৎসা-বিদ্যালয়, পশু-চিকিৎসা-বিদ্যালয়, গুটিপোকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু তাহা দেশের কোটি সংখ্যায় গণিত লোকের পক্ষে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এ দেশে জীবনোপায়ের একমাত্র দ্বার বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জীবিকার্জ্জনই শিক্ষানীতির একমাত্র লক্ষ্য।

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা দেন না, বিদ্যার পরীক্ষা করেন, অন্য স্থান

হইতে বিদ্যা লইয়া আসিতে হয়। এবং এই বিদ্যা লইবার জন্য অনেক-গুলি স্থান দেশের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই সকল স্থানই প্রকৃতপক্ষে এ দেশের বিদ্যালয়; বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয় না বলিয়া পরীক্ষালয় বলাই উচিত। বিদ্যা দিবার জন্য যে সকল আলয় আছে, তাহার কতক সরকারী, কতক বেসরকারী। বিদ্যার্থীরা সেখানে পয়সা দিয়া বিদ্যা খরিদ করে। বিদ্যার মূল্য সরকারী আলয়ে বেশী, বেসরকারী আলয়ে কম। কোথাকার বিদ্যা ভাল, কোথাকার বিদ্যা মন্দ, তাহা নির্ব্বাচনের ভার শিক্ষার্থীর উপর। বিদ্যার্থীরা আপনাপন অবস্থা বুঝিয়া মোটের উপর যেথানে সস্তা পায়, সেইখানেই বিদ্যা খরিদ করে। বেসরকারী আলয়গুলির চেয়ে সরকারী আলয়গুলির চাকচিক্য অনেক বেশী; আর establishment খরচার তারতম্যে একই মাল বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন মূল্যে পাওয়া যায়। আর দেশী দোকানে শাদা রঙের আকর্ষণ নাই; এই কাল দেশে শাদার অস্তিত্ব অন্ততঃ æsthetic culture এর জন্যও আবশ্যক।

আমাদের গবর্মেণ্ট এ দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, নিম্ন শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা, উভয় শিক্ষার বিস্তারের দায়িত্ব স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। বেণ্টিক ও মেকলের সময় হইতে গবর্মেণ্ট এ দেশের লোককে উচ্চ শিক্ষা দিবার ভার হাঁকিয়া ডাকিয়া, দেশীয় প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীকে গালিগালাজ করিয়া, স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পরবর্ত্তী কালেও গবর্মেণ্ট কখনও আপনাকে এ দায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। সম্পূর্ণ মুক্তি বলিলাম, কেন না, ইদানীং ইংরাজ গবর্মেণ্টের উচ্চ শিক্ষা-বিষয়িণী নীতি একটু অন্যরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল; রাজপুরুষগণের কণ্ঠ হইতে উচ্চ শিক্ষার কথাগুলা বাহির হইবার সময়, এক আধটুকু আটকাইয়া যাইতেছিল।

ইদানীং রাজপুরুষেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গবর্মেণ্ট নিম্ন শিক্ষাবিস্তারের জন্যই মুখ্যতঃ দায়ী, উচ্চশিক্ষার জন্য তেমন দায়ী নহেন। এই কথা বলিবার সময় একটা থিওরির আশ্রয় লওয়া হইত। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতে পণ্ডিতদের মধ্যে একটা থিওরি উঠিয়াছিল, গবর্মেণ্ট প্রজার কাজে যত হাত না দেন, ততই ভাল। গবর্মেণ্টের প্রধান কার্য্য, বোধ হয়, একমাত্র কার্য্য, শান্তিরক্ষা। তদ্ভিন্ন প্রজার কিসে ভাল হইবে না হইবে, সে বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। প্রজা স্বাধীনভাবে আপনার কাজ আপনি করিবে। রাজা স্বয়ং প্রজার ভাল করিতে গেলে উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও ফল প্রায় উল্টা হইয়া পড়ে। এই নীতির নাম laissez faire নীতি। যেমন অন্য বিষয়ে, তেমনই শিক্ষা বিষয়েও; প্রজা আপনার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আপনি করিবে; রাজার তাহাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। এতদ্ভিন্ন আরও একটা কথা ছিল। গবর্মেণ্টের টাকা প্রজাসাধারণের টাকা; উহা সাধারণের শিক্ষার জন্য, mass education এর জন্য, খরচ করিতে পারা যায়। উচ্চশিক্ষা সাধারণের জন্য নহে, অল্প লোকের জন্য, উচ্চতর শ্রেণীর জন্য; সাধারণের অর্থ শ্রেণীবিশেষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিলে অবিচার হয়, অন্যায় হয়।

এই সকল কারণ দেখাইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের রাজপুরুষগণ উচ্চশিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হাত গুটাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। যত দিন দেশের লোকে উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝিত না, তত দিন রাজা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন; দেশের লোকে উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝিয়াছে, তাহারা উচ্চশিক্ষার উপায়বিধান নিজেই করিয়া লউক। গবর্মেণ্ট বড় বড় কালেজগুলি ক্রমশঃ উঠাইয়া দিয়া কেবল উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য দুই একটা বড় কালেজ রাখিয়া নিম্নশিক্ষার প্রচারে প্রবৃত্ত হউন।

কিন্তু থিওরিগুলার পরমায়ু অনেক সময় কম হয়। পাশ্চাত্য দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন; এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় এক একটা রাজার হালে বাড়িতে লাগিল; এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার ফলে দেশের উন্নতি বিষয়ে কোন থিয়োরিষ্ট সন্দেহ করিতে সাহস পাইলেন না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষণ হইতে লাগিল। সহসা জাপানের অভ্যুদয় হইল। জাপানের অভ্যুদয়ে অনেক ঐতিহাসিক থিওরি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। রাজা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া প্রজাকে উচ্চশিক্ষা দিতে লাগিলেন; প্রজার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলেন না; দেখিতে দেখিতে দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল। "অসভ্য জাপান" ইউরোপের সভ্যজাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। পৃথিবীর লোক স্তব্ধ হইল।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় আর সেই পুরাতন থিওরির দোহাই দেওয়া চলে না। ষ্টেটের চেষ্টায় জাতীয় উন্নতি ঘটে না, এ কথা বলিবার আর উপায় নাই। উচ্চশিক্ষাদান ষ্টেটের কর্ত্তব্য নহে, তাহা আর বলা চলে না। আমাদের গবর্মেণ্টও সে কথা পুরা সাহসে কখনও বলিতে পারেন নাই। বরং লর্ড কর্জ্জন ভারতবর্ষে আসিয়াই অন্যরূপ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং University man বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। লর্ড কর্জ্জনের আগমনে শিক্ষানীতি কাজেই একটু অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। যখন আমাদের পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর স্মরণচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হয়, তখন কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থ উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হউক; ভারতেশ্বরীর নামে ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হউক। তাহার উত্তরে শুনা যায়, ভারত গবর্মেণ্ট প্রজাগণকে উচ্চশিক্ষা

দিবার দায় হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন না; উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য গবর্মেণ্ট স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। সংগৃহীত অর্থে অন্যরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হউক। তারপর যখন লর্ড কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর স্বরূপ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, My one ambition is to make this University worthy of India—to set before it a high ideal and to render it capable of follwing the footsteps of its European prototypes. Indeed I should like to open up before it, vistas of future expansion and influence such as have not yet dawned upon its vision; তখন আর কাহারও মনে কোন সন্দেহের অবসর থাকিল না। লর্ড কর্জ্জনের আশ্বাসবাণী আমাদের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিল; আমরা মনে করিলাম, এইবার বুঝি আমাদের অদৃষ্ট ফিরিল, আমরা এত দিন পরে বুঝি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে স্থাপিত দেখিব। আশা করিলাম, দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে Teaching University প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেখানে বড় বড় মনস্বী অধ্যাপক আসিয়া জ্ঞান দান করিবেন, জ্ঞানের প্রচার করিবেন, জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন, এবং ভারতবাসীকে জ্ঞানার্জ্জনের পন্থা দেখাইবেন। শিক্ষাবিভাগের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের অন্ততঃ কিয়দংশ বুয়র যুদ্ধের সেনাপতিত্বগ্রহণে প্রেরিত হইবেন, এবং তাঁহাদের স্থানে, যাঁহারা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গৌরব, যাঁহারা জ্ঞান-বৃক্ষের তলে বসিয়া তাহার ছায়া উপভোগ করিয়াছেন, তাহার ফল আস্বাদ করিয়াছেন ও তাহার আহরণের উপায় জানিয়াছেন, এবং অপরকে সেই ফলের আস্বাদনে অধিকারী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত আছেন, সেইরূপ ধীমান প্রতিভাবান জ্ঞানান্বেষী মনস্বিগণ নূতন

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের যথোচিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। অধ্যাপক আপনার চরিত্র ও আপনার পাণ্ডিত্য ও আপনার সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা ছাত্রগণের প্রীতি ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথোপযুক্ত লাইব্রেরি, লাবরেটরি, মিউজিয়াম, উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া দিগ্‌দেশ হইতে শিক্ষার্থীদিগকে আকর্ষণ করিবে, এবং পুনরায় আমরা নগরে নগরে নালন্দা ও বিক্রমশিলার পুনরভ্যুদয় দেখিয়া জাতীয় জীবনে পুনরভ্যুদয়ের আশায় উৎফুল্ল হইব।

এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার উন্নতির যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনেকে বলেন. তাহাতে দেশে বিদ্যার তেমন উন্নতি ঘটে নাই। ঘটে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই ছিল না। ঘটিলেই বরং বিস্ময়ের কারণ জন্মিত। ঘোড়ার ডিমে শত বৎসর ধরিয়া তা দিলেও পংক্ষিরাজ বাহির হয় না। লর্ড কর্জ্জনের আশ্বাসবাণীর পরে আশা হইয়াছিল, এবার বুঝি বাস্তবিকই শিক্ষারথ টানিবার জন্য উচ্চৈঃশ্রবার আমদানি করা হইবে। তার পর লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশন পবনগতিতে অঙ্গ বঙ্গ দ্রাবিড় কেরল কাশী কোশল পরিক্রমণ করিয়া ফিরিলেন। কিন্তু হায়! এখন লোকে বলিতেছে, রাবণবংশের ধ্বংশ হইল কিন্তু সীতা-উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হইল না।

আমাদেরই দুরদৃষ্ট, সন্দেহ নাই; কেন না, কমিশনের মধ্যে যে সকল মনস্বী ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মাননীয় শ্রদ্ধাভাজন মহাশয় ব্যক্তি; এমন কি, ভারতবর্ষের বিশাল মুসলমানসমুদ্র মন্থন দ্বারা আবিষ্কৃত কৌস্তুভটিকেও আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য। ইঁহাদের মত লোকের চেষ্টায় যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয়, সে

আমাদের অদৃষ্টেরই দোষ। অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়; আমরা অভাগা, আমাদের অদৃষ্টগুণে মহাসাগরের জলটুকু সমস্ত শুকাইয়া গিয়া কেবল নুনটুকুমাত্র তৃষ্ণানিবারণের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। এখন ইউনিভার্সিটী কমিশনের উপদেশমধ্যে দুই চারিটির সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাউক।

ইউনিভার্সিটী কমিশন একবারে গোড়ায় হাত দিয়া সেনেটসভার সংস্করণে উপদেশ দিয়াছেন; বর্ত্তমানে সেনেটের যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহাদের অনেকেই কেবল সেনেটের অলঙ্কারমাত্র; কমিশন বলিতেছেন, তাঁহারা অলঙ্কারস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাবর্দ্ধন করুন; শিক্ষানীতিতে তাঁহাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সদস্যগণের মধ্যে এক শত জনকে লইয়া নূতন সেনেট গঠিত হউক; অন্যান্য সদস্যেরা কনভোকেশনের দিন academic costume পরিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করুন; দুষ্ট লোকে বলিতেছে, সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য সেই সকল সদস্যগণকে টানিয়া আনার প্রয়োজন কি? গবর্ণর হাউসের অধিবাসী-দিগকে ধরিয়া আনিয়া চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলে বোধ করি সভার শোভা আরও উজ্জ্বল হইত; এবং তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠববর্দ্ধনের জন্য রঙ্গিল গাউনেরও দরকার হইত না। এক শত জন সদস্য লইয়া যে নূতন সেনেট-সভা গঠিত হইবে, তাহার হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত প্রধান ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নূতন সিণ্ডিকেটে অর্পণ করিবার জন্য কমিশন উপদেশ দিয়াছেন। নূতন সিণ্ডিকেটের গঠন প্রণালী যেরূপ হইবে, ও সিণ্ডিকেটের হস্তে যেরূপ প্রভুশক্তি অর্পণ করা হইতেছে, তাহাতে সকলে আশঙ্কা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটা গবর্মেণ্টের ডিপার্ট-মেণ্টে পরিণত হইবে; উহার আর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কিছুই থাকিবে না। আমরা সেনেটের পুনর্গঠনে বা সিণ্ডিকেটের স্বাধীনতাসঙ্কোচে তত

আশঙ্কার কারণ দেখি না। কেন না, কমিশন নিরতিশয় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্তই খুঁটিনাটি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ঐ সকল দুশ্চিন্তার দায় হইতে একেবারে অব্যাহতি দিয়াছেন। কোন্ কালেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কোন্ কালেজ থাকিবে না, তাহা গবর্মেণ্ট স্বয়ং নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা কালেজের অবস্থা তদন্ত করিয়া খারিজ দাখিলের রিপোর্ট করিবেন; সিণ্ডিকেটকে তজ্জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে না। ছাত্রেরা কোন্ বয়সে পরীক্ষা দিবে, কি বিষয়ে পরীক্ষা দিবে, কত মার্ক পাইলে পাশ হইবে, এই সমস্তই কমিশন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং নূতন সিণ্ডিকেটের বা নূতন সেনেটের এই সকল চিন্তায় মাথা-ব্যথা জন্মাইবার কোন অবসর থাকিবে না। বরং নূতন সেনেট ও নূতন সিণ্ডিকেট জন্মগ্রহণ করিয়া কি কর্ম্ম লইয়া জীবনযাপন করিবেন, তাহাই অনেকের ভাবনার বিষয় হইয়াছে। সুতরাং সিণ্ডিকেটের ভাবী প্রভুত্বের আশঙ্কায় আজি হইতে আমাদের চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। তদ্ভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির উন্নতিবিধানের জন্য কমিশন নানাবিধ উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। যাহাতে বিদ্যালয়গুলিতে যন্ত্রাগার হয়, পুস্তকালয় হয়, ছাত্রাবাস হয়, ইত্যাদি বিবিধ উপদেশ দিয়া প্রাইভেট কালেজের অধ্যক্ষদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। তবে ঐ সকল উন্নতিসাধনের জন্য অর্থ কোথা হইতে আসিবে, তাহার কোন উপায়নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল ছাত্রপ্রদত্ত অর্থ হইতে আধুনিক প্রণালীর উচ্চশিক্ষা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এ কল্পনা এই আধুনিক ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র কার্য্যকর হইয়াছে কি না, জানি না। এ দেশের ধনিগণ উচ্চশিক্ষার জন্য যথোচিত ব্যয়বিধানে পরাঙ্মুখ বলিয়া গালি

খান ; কিন্তু ধনিগণকে গালি দিয়াও বিশেষ লাভ নাই। রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগকে যে ভাবে দোহন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট আর অধিক দুগ্ধের আশা করিলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর অন্য দেশে এক এক কার্ণেজি এক এক নিশ্বাসে যে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেন, আমাদের অধিকাংশ ধনীর পক্ষে তাহা নিশার স্বপন। কাজেই এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতির আশা দেখি না। উন্নতির আশা না থাকিলেও এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সরকারী কালেজগুলির উন্নতি সম্বন্ধে কমিশন কোন কথা বলেন নাই কেন? সরকারী কালেজের অবস্থা কি এতই উন্নত যে, সে সম্বন্ধে কোন উপদেশের প্রয়োজন নাই? বলা বাহুল্য, এ দেশে গবর্মেণ্ট কালেজগুলিই বেসরকারী কালেজের পক্ষে আদর্শ স্বরূপ। সরকারী আদর্শ উন্নত করিলে বেসরকারী আদর্শকেও বাধ্য হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, অথবা জীবন-সংগ্রামে নষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আমরা বলি, কমিশনের এই নীরবতার জন্যও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। গবর্মেণ্টকে সদুপদেশ দেওয়া তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন; বাহিরের লোককে তাঁহারা যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তৎপরে কমিশন ভারতবর্ষের দরিদ্র ছাত্রবর্গের উপর নিতান্তই দয়াপরবশ হইয়া একটা বিধি দিয়া ফেলিয়াছেন। দুরন্ত শয়তান আমাদের দরিদ্র ছাত্রগণকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পাইয়া, খল সর্পের মত, তাহাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের রসাস্বাদনে প্রলোভিত করিয়া সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সেই নিঃসহায়দিগের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে প্রেম করিতে দ্বিধা বোধ করিবে?

এই কয়েকটি নমুনা হইতেই কমিশনের রিপোর্টের ধরণটা বুঝা যাইবে।

অকারণে আর পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই। সংসারকার্য্যে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে হয়; কমিশন পুরাতনকে ভাঙ্গিবার অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছেন, নূতন গড়িবার তেমন উপায় করেন নাই। কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়া এই কারণেই আমাদের নৈরাশ্য জন্মে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্র জঞ্জালে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় দেখি না। কমিশন সম্মার্জ্জনী ও কুঠার হস্তে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং দুই হাতে সেই সম্মার্জ্জনীর ও কুঠারের প্রয়োগের দ্বারা জঞ্জাল ও জঙ্গল সাফ করিতে বসিয়াছেন। যে সকল কালেজের ভাল বাড়ী নাই, তাহা উঠাও; যাহাতে লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি নাই, তাহা উঠাও; যাহাতে হোষ্টেল নাই, ছাত্রদের ক্রীড়াস্থল নাই, মাষ্টারদের বসিবার ঘর নাই, সে সকল উঠাও। তার উপর যে সকল কালেজ সেকেণ্ড গ্রেড্ কালেজ, সে-গুলাকেও কজিকের খাতিরে একদম উঠাইয়া দাও। ভাল কথা; এইরূপ কুঠারচালনার পর যে সকল কালেজ থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় হইবে। তাহাদের অবস্থা বর্ত্তমান কালেজগুলির সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা উচ্চ হইবে, সন্দেহ নাই। আবার কমিশন বলিতেছেন, এ ্রান্সে ছাত্রদের বয়স বাড়াইয়া দাও; তাহাদের পরীক্ষা আরও শক্ত কর; তাহাদিগকে, ফেল হইলে, বারে বারে পরীক্ষা দিতে দিও না; সকলের উপর গরীবের ছেলেকে, বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে পড়িতে দিও না, এবং এণ্ট্রান্স পাশের পর চাকরীর প্রলোভন দিও না; তাহা হইলে অধিক ছাত্র পাশ করিতে পারিবে না; যাহারা পাশ করিবে, তাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষের মতন হইবে। ইহাও ঠিক কথা। এখন জিজ্ঞাস্য, তবে কি এইরূপেই আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমকক্ষ হইবে? এইরূপেই ভারতসন্তান অর্থান্বেষণে ও অন্নান্বেষণে বিমুখ হইয়া জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত

হইবে? এই উপায়ে কি জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি, জাতীয় বিদ্যার বৃদ্ধি ঘটিবে? একটা জাতির গায়ে বলসঞ্চারের দুইটা উপায় আছে। এক উপায়, যে সকল ব্যক্তি আশৈশব দুর্ব্বল, তাহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করাইয়া তাহাদের বলবর্দ্ধনের চেষ্টা। এইরূপে দুর্ব্বলের গায়ে কালক্রমে বলসঞ্চার হইতে পারে; ও বলিষ্ঠের বল আরও বাড়িতে পারে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর একটা উপায় আছে। যে শিশু দৌর্ব্বল্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই তাহাকে নুন খাওয়াইয়া বা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা। তাহা হইলে দুর্ব্বল মানুষগুলা, যাহাদের হাড়ে দোষ, তাহারা মূলেই নষ্ট হইবে ও সমাজ অচিরে বীরের সমাজে পরিণত হইবে। শুনা যায়, পুরাকালে স্পার্টানেরা আপনাদের জাতীয় শক্তিবর্দ্ধনের জন্য এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। এখনও যাহারা গরু ঘোড়ার breed তৈয়ার করে, তাহারাও এই ব্যবস্থার আশ্রয় লয়। ডারুইন ইহার নাম দিয়াছেন artificial selection। প্রকৃতির হাতে এই ব্যবস্থার নাম natural selection। কোন্ ব্যবস্থাটাতে বেশী ফল হয়, বলিতে পারি না; কিন্তু আমাদের কমিশন এই artificial selection এর ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। দু হাতে কুঠার ধরিয়া সজোরে প্রয়োগ কর; যে দুর্ব্বল, সে মারা যাউক; যে বাঁচিবার উপযুক্ত, সে বাঁচিয়া আসুক। কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলিকে বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে বলেন নাই; পরীক্ষা কার্য্যকেই আরও কঠিন করিয়া তুলিতে বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে যথোচিত অর্থসাহায্য করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে বলেন নাই; তৎপ্রতি শিক্ষাভার অর্পণের কথা অতি সন্তর্পণে তুলিয়াছেন; প্রতিভাবান্ অধ্যাপক সংগ্রহ করিবার কথা তুলেন নাই, শিক্ষক ছাঁকিয়া লইবার জন্য নূতন একটা পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন; দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে নগরাবদ্ধ বিশ্ব-

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তোলেন নাই; দেশীয় ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদি শাস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা দিতে সাহস না করিয়া প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গোড়ায় গলদ রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের কিন্তু আশা ছিল অন্যরূপ; বোধ হয়, লর্ড কর্জ্জনের ইচ্ছাও ছিল অন্যরূপ। লোকে বলিতেছে, কমিশন নিজের কথা বলেন নাই, তাঁহাদের হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে যে কথা বলাইয়াছেন, তাঁহারা সেই কথাই বলিয়াছেন। আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি না, এরূপ বিশ্বাসে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমরা এখনও আশা করিয়া বসিয়া আছি, লর্ড কর্জ্জন আপনার University man এই গর্ব্বের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন; তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকিবে; তাঁহার প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইয়া তাঁহার শাসনকালকে ও মহামহিম ভারতেশ্বরের মহাভিষেক বর্ষকে ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।*

আমরা এই কয় মাস ধরিয়া শুষ্ক হৃদয় লইয়া বারিবিন্দুর প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ইউনিভার্সিটী কমিশন বারিবর্ষণের পরিবর্ত্তে শিলাবৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন; আমাদের শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র করিবার জন্য এক ফোঁটা তরল জল দিলেন না। কেবল পরীক্ষা দ্বারা, কেবল বাছাই করিয়া, কেবল চালুনি নাড়িয়া ছাঁকনি ঝাড়িয়া একটা জাতির মধ্যে বিদ্যার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি ঘটান যায় না। একালের সরস্বতীর উপাসনায় যে সকল বহ্বাড়ম্বর, যে সকল উপকরণ সাজসরঞ্জাম আবশ্যক, সেই সকল না জোটাইলে সরস্বতী কখনই কৃপাদৃষ্টি করিবেন না। সেকালে সরস্বতী কুটীরবাসিনী ছিলেন, কিংবা পদ্মবনে পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া গোটাকতক পদ্মফুল উপহার পাইলেই তৃপ্ত হইতেন। একালের পাশ্চাত্য সরস্বতী তেমন নহেন, ইঁহার উপাসনার সরঞ্জাম জোটাইতে এক একটা রাজ্য দেউলিয়া হয়। আমার statistics সংগ্রহ করিবার অবসর নাই;

শ্রোতৃগণের ধৈর্য্যচ্যুতিরও আশঙ্কা আছে। আপনাদিগকে অনুরোধ করি, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকার এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় কত কোটি টাকার সম্পত্তি অধিকার করিয়া আছে, একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। যে অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজের আমরা এত গল্প শুনি, তাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ের নিকট লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকে। কিন্তু অক্‌সফোর্ড কেম্ব্রিজেরও সম্পত্তির সহিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পত্তির একবার তুলনা আবশ্যক।

যাহা হউক, সে সকল বড়লোকের বড় কথায় আমাদের দরকার কি? আমাদের টাকাও নাই, টাকা দিবার লোকও নাই। ইউনিভার্সিটী কমিশন, যেখানে টাকার কথা উঠিয়াছে, সেইখানেই চোখে সরিষার ফুল দেখিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টে পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। Teaching University কি পদার্থ, কমিশন না জানেন, এমন নহে; কিন্তু গবর্মেণ্টের কাছে তাহার ব্যয় চাহিতে কমিশন সাহস করেন নাই। কমিশন বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হইবে, কালে আপনার অধ্যাপক নিযুক্ত করিবে, পুস্তকালয় রাখিবে, যন্ত্রাগার বসাইবে, ইত্যাদি। তবে তাহার খরচ;— বিশ্ববিদ্যালয়ের ত তেমন অর্থসামর্থ্য নাই; গবর্মেণ্ট ত আর সে টাকা দিতে পারিবেন না; তবে দেশের রাজা মহারাজ আছেন, তাঁহাদিগকে উপাধি দিব, তাঁহাদিগকে ফেলো সাজাইয়া দিব; আর এই যে প্রাইভেট কালেজগুলি—উহাদের কাছেও কিছু পাওয়া উচিত। অক্‌সফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেটের খরচে চলে না; বাহিরের লোকের প্রচুর দানেই উহাদের জীবিকা; অন্তপক্ষে গবর্মেণ্ট উহাদের শিক্ষানীতিতেও হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি গবর্মেণ্টের অধীন; যে টুকু স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহাও বুঝি থাকে না; অথচ গবর্মেণ্ট

আশা করেন, বাহিরের বদান্যতায় বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হইবে। উত্তর কথা,—প্রাইভেট কালেজের মধ্যে যাঁহাদের জীবন বড়ই কঠিন, যাঁহারা বর্ত্তমান আঘাত হজম করিয়াও বাঁচিবেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করিয়া বেত্রাঘাত সহ্য করিতে থাকুন; আমাদের ধনিগণ উপাধি লাভের নূতন পন্থায় ধাবমান হইয়া জনগণের নেত্রোৎসব সম্পাদন করুন; এবং আমাদের গবর্মেণ্ট ঢাল-তলোয়ার-হীন নিধিরাম সর্দ্দারকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া উচ্চশিক্ষার লড়াই ফতে করুন। কিন্তু হে ভারতসন্তান, তোমাকে মিনতি করি, তুমি এই অবসরে শিখিয়া রাখ, পরান্নে শরীর পোষণ হয় না, দ্বারদেশে চীৎকার করিয়া গৃহস্থের কর্ণশূল উৎপাদনে বিশেষ কোন লাভ নাই; জানিয়া রাখ, সরস্বতী কুটীরবাসী দরিদ্র উপাসককে ঘৃণা করেন না। অতএব হে ভারতসন্তান, হে সৌম্য, হে প্রিয়দর্শন, পুনশ্চ বলিতেছি, দেবোপাসনার জন্য পুরোহিতের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক নহে; যে উপাসনাপ্রণালী জানে ও প্রণালীমত উপাসনা করে, দেবতা তাহারই প্রতি প্রসন্ন হন। ফাঁকি দিয়া মানুষ ভোলাইতে পারা যায়, কিন্তু দেবতা ভুলাইতে পারা যায় না; বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। দেখ, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাধনার নাম পরিশ্রম, সাধনার নাম অনুরাগ, সাধনার নাম শ্রদ্ধা, সাধনার নাম ভক্তি, সাধনার নাম ত্যাগ। তোমরা স্বাবলম্বন অভ্যাস দ্বারা শ্রমের সহিত, অনুরাগের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, ত্যাগের সহিত দেবতার উপাসনা কর; তোমাদের আয়াস নিষ্ফল হইবে না। নতুবা সমস্তই নিষ্ফল হইবে; আমাদের মত দরিদ্রের,—যাহাদের অবস্থা ঘোর অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধিতে গ্রস্ত, তাহাদের,—অর্থ নিষ্ফল, শ্রম নিষ্ফল, বিদ্যা নিষ্ফল, বুদ্ধি নিষ্ফল, জীবন নিষ্ফল এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ফল অদ্যকার মত অরণ্যে রোদন।

মহাকাব্যের লক্ষণ

" ইংরাজি এপিক্‌-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্যশব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্‌ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমত এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয় ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে ; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন সত্ত্বেও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা

আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিকসম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্ট্‌কে আমি এস্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সে-ই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থদুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সা[illegible] [illegible]হাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্য সমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে

যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশবৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্‌ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্‌-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে; কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্রশাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য

বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজি-দ্বীপে নির্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ্ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবন-টুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহ-বর্ম্মের অন্তরালে কারেন্‌সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি-হাজার বৎসরের, মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজরাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ্-ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে; তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ

স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি-হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্‌লায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক-একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণকলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত-সহস্র-বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরস-প্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন; সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্ববিৎ তাঁহার মানসচক্ষু অতীতকালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান, বসুন্ধরার ইতিহাসে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীমবাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু আলোড়িত হইল। সাগরবক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্ব্বসাগরের

বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণকলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুহিন-মণ্ডিত সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোরারাবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধূম্রবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামনী স্ফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল; অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডবনর্ত্তনের সহকারে অট্টহাস্তে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।*

কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু নিসর্গের ইতিবৃত্তে যেমন মহাকাল মাঝে মাঝে এইরূপ তাণ্ডবনর্ত্তনের উন্মত্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, মানব-সমাজের ইতিবৃত্তেও সেইরূপ সময়ে সময়ে তাঁহার অট্টহাস্যের নির্ঘোষ-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ঘটনা প্রাচীন ভারতসমাজের একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্যসমাজের একটা মহাবিপ্লবের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যহৃদয়ের ঈর্ষা, দ্বেষ, জিগীষা ও জিঘাংসা প্রভৃতি উৎকট দুর্দ্দম প্রবৃত্তিসমূহ কালে কালে কেন্দ্রাকৃষ্ট ও পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হইয়া যখন আপনার শক্তিতে আপনি বাহির হইতে চাহে, তখন উহা লেলিহান অগ্নিজিহ্বা ব্যাদান করিয়া সমাজমধ্যে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী জ্বালা প্রসারণ করে; ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রীতিপ্রেমের উৎস পর্য্যন্ত সেই ভীষণ উত্তাপে শুকাইয়া যায়; সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠদেশ বিপ্লবের ভূমিকম্পে মুহুর্ম্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত শক্তিরাশি সমাজের কলেবরকে বিদীর্ণ করিয়া, সহস্র খণ্ডে

* ভূতত্ত্ববিদের মধ্যে যাঁহারা লায়ালের শিষ্য, তাঁহাদের হিমালয়োৎপত্তির এই কাল্পনিক বর্ণনায় শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। প্রাদেশিক catastrophe লায়ালের মতের বিরোধী নহে।

চূর্ণ করিয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে; লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যরাশি ও রূপরাশি সেই তরল অনলপ্রবাহে ভস্মীভূত হইয়া যায়। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা মহাকালের অট্টহাস্তের প্রতিধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া স্তব্ধ হই ও মুহ্যমান হই। এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস—যাহা যুগযুগান্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; যাহা সাগরগর্ভকে মালক্ষেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্ষেত্রকে সাগরগর্ভে নিমগ্ন করে; যাহা পর্ব্বতচূড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত হয়, জীবকুল ধরাপৃষ্ঠে অস্থিকঙ্কাল রাখিয়া কালের কুক্ষিতে অন্তর্হিত হয়। ইহা সেই সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান, যাহা দলিত, পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের জন্য মহেশ্বরের মহৈশ্বর্য্যের অবতারণা আবশ্যক হয়; ভীত, বিস্মিত মানবচিত্ত তখন সেই ঐশ্বর্য্যের মহিমায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণোপান্তে আপনাকে লুণ্ঠিত করে।

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে বাস্তবিকই কোনদিন এইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিবেন। হয় ত কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানব সমাজের মহা-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের,—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভে সঞ্চিত যে শক্তির বলে হিমাচল ভূগর্ভ ভিন্ন করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিল, সে শক্তি এখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইয়াছে; এখন হিমাচলের সানুদেশ নিবিড় বনস্থলীতে শ্যামায়মান হইয়াছে; তাহার আয়ত বক্ষে এখন নিরিদ্ধ

জলদমালা বারিবর্ষণ করিয়া সেই শ্যামভূমির হরিৎকান্তি অব্যাহত রাখিয়াছে ; আর সেই জলদমালার বহু ঊর্দ্ধে ধবলগিরি ও গৌরীশঙ্করের শুভ্রোজ্জ্বল দেহ দূর হইতে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

যে সামাজিক বিপ্লবে, যে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে প্রাচীন ভারতসমাজে অশান্তির ঝটিকা বহিয়াছিল, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপারের স্মৃতি পর্য্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ঝটিকা শান্ত হইয়াছে; মহাসিন্ধুর কল্লোল স্তব্ধ হইয়াছে, বনানীর দাবাগ্নিগর্জ্জন নীরব হইয়াছে; এখন সেই মহাভারত হইতে সহস্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় জীবনে শাখাপল্লবের ও পত্রপুষ্পের উদ্গম করিয়া তাহাকে বিকসিত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছে; আর আমরা দূর হইতে ভীমার্জ্জুন, কর্ণ-দুর্য্যোধন, ভীষ্ম-দ্রোণ, অশ্বত্থামা-কৃতবর্ম্মার দৃঢ়গঠিত, উন্নতশীর্ষ, জ্যোতির্দীপ্ত কলেবরকে ধবলমুকুটধারী কিরণোজ্জ্বল ধবলগিরির ন্যায় ভারতসমাজক্ষেত্রের দূরস্থিত দিগ্বলয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি।

এই হিমালয়ঘটিত উপমাটা এতক্ষণ অনুগ্রহপরায়ণ পাঠকবর্গের নিতান্তই কর্ণশূল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটা কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। মহাভারতকে আদর্শ মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং হিমগিরির সহিত তাহার তুলনা করিতে গিয়া লেখক মহাকাব্যের একটা লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কার জগতের যাবতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের রোমহর্ষ উৎপাদন করিবে। তাহা জানিয়াও সেই আবিষ্কারটি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার দুঃসাহস আশ্রয় করিলাম; আশা করি, তাঁহাদের শুভ্রোজ্জ্বল দশনচ্ছটা লেখককে রণারম্ভেই পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করিবে না।

লেখকের মতে যে কাব্য পড়িতে হয় না, তাহারই নাম মহাকাব্য। না পড়িয়াই আমরা মহাকাব্যের কাব্যরসাস্বাদনে অনেকটা অধিকারী হইতে পারি। রামায়ণের চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকের ও মহাভারতের লক্ষশ্লোকের অধিকাংশই অপঠিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বোধ করি পাঠকসমাজের অধিকাংশই লজ্জিত হইবেন না। তথাপি এই পাঠকসমাজ উভয় মহাকাব্যের কাব্যরসের আস্বাদন জানেন না, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কখনই সম্মত হইবেন না। রামচরিত্র, ও কৃষ্ণচরিত্র, লক্ষণচরিত্র ও কর্ণচরিত্র, দশাননচরিত্র ও দুর্য্যোধনচরিত্র, ভরতচরিত্র ও ভীষ্মচরিত্র, মহাকাব্যের গহনবন ভেদ করিয়া এই সকল মহামানব-চরিত্রের স্পর্শলাভ আমাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আমরা দূর হইতে উহা নিরীক্ষণ করিয়াছি মাত্র; তথাপি দূর হইতেই তাহার মাহাত্ম্যে আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছি। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ রামচরিত ও সীতাচরিতের পুণ্যধারা সেই মাতৃস্তন্যের প্রবাহের মত তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই, স্নায়ুতন্ত্রীতে তাড়িতস্রোতের সঞ্চালন করে নাই, তাহার অস্থিতে, তাহার মজ্জায়, তাহার পেশীতে বল বিধান করে নাই, সেই হতভাগ্যের—সেই পিণ্ডীভূত জড়ের ভারত-সমাজে স্থান কোথায়? পঞ্চবিংশতি-কোটি হিন্দুসন্তানের অধিকাংশ অন্য কারণ না থাকিলেও, শুদ্ধ ভাষাজ্ঞানের অভাবে, সেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর মূল প্রস্রবণে গিয়া তৃষ্ণানিবারণে অশক্ত আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভাই, হনুমানের মত দাস, ভীষ্মের ন্যায় পিতামহ ও কর্ণের ন্যায় বৈরীর জাগ্রত-জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি কয়জনের মানসচক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান নাই? আমাদের বঙ্গদেশেরই অসংখ্য

নরনারী মাতৃমুখে লঙ্কাদহনের ও লক্ষ্মণভোজনের কথা শুনিয়াছে; কথকের মুখে, গায়কের মুখে মন্থরার লাঞ্ছনা ও অঙ্গদরাবণসংবাদের অতিরঞ্জনে আমোদিত হইয়াছে; যাত্রায়, গানে ভরতমিলন ও সীতা-নির্ব্বাসন অভিনীত হইতে দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ হস্তে অবকাশরঞ্জন করিয়াছে; এবং শেষের সেদিন রামনাম শুনিতে শুনিতে জগৎসংসারের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সেই আদিকবির অমৃতলেখনীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আপনি জ্ঞানী, আপনি পণ্ডিত, আপনি সমালোচক, আপনি সমজ্দার, আপনি সন্তরণ দিয়া সংস্কৃতসাহিত্যসমুদ্রের পার দেখিয়াছেন, আপনার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, ঐ পল্লীবাসিনী মূর্খ বৃদ্ধার অপেক্ষা আপনি নিঃসংশয়ে রামরসায়নে অধিকতর রসগ্রাহী হইয়াছেন, তাহা হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বস্তুতই আমার বিশ্বাস, মহাকাব্যের লক্ষণ এই যে, উহার আগা-গোড়া অক্ষরে অক্ষরে পড়িবার প্রয়োজন নাই। মূল হোমার পৃথিবীতে কয়জন লোক পড়িয়াছে? পণ্ডিতসমাজের মধ্যে কয়জন লোক হোমারের তর্জ্জমা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন? অধিকাংশের পক্ষে কেবল হোমারের গল্প শুনা আছে মাত্র। অথচ ট্রয়-নগরের প্রাকারসম্মুখে সমুদ্রবেলা পূর্ণ করিয়া আমরা আগামেম্নন্-পরিচালিত গ্রীক্ অক্ষৌহিণীর সন্নিবেশ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট তুলিকায় চিত্রিত দেখিতেছি। সেই বিস্তীর্ণ স্তব্ধ সেনাকুলিত রণাঙ্গনের উপর দিয়া একিলীস্, আজাক্স্ ও দায়োমীদের বিশালবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধর শালপ্রাংশু জীবন্ত মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছে; বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু ট্রয়-নগরের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভগ্ন হইল না; গ্রীক্ বীরগণের

শিবিরমধ্যে মানবহৃদয়ের সনাতন ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাগিল। সেই ধূম হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, গ্রীক্ বীরগণ ক্ষণেকের জন্য উদ্দেশ্যভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তার পর-অঙ্কের যবনিকা তুলিবামাত্র অকস্মাৎ পাত্রোক্লসের চিতাধূম প্রশমিত হইতে না হইতে একিলীসের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; রোষাগ্নিদীপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি হুঙ্কার করিয়া গর্জ্জন করিল; পরক্ষণেই দেখিতে পাই, মহাবীর হেক্টরের শবদেহ সেই ভীমকর্ম্মার রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া রুধিরধারায় রণক্ষেত্র শোণিতাক্ত করিতেছে ও মর্ত্তে নরগণের ও আকাশে দেবগণের মুগ্ধনেত্র বিস্ফারিত হইয়া সেই ক্রূর কর্ম্মের প্রতি নীরবে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ যদি এতক্ষণ বুঝিয়া থাকেন, কৃত্তিবাস পড়িলেই বাল্মীকি পড়ার কাজ হইবে, এবং যে সকল পাঁচালী-পয়ার শুনিয়া কাশীদাস ভারতকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই পাঁচালী পড়িলেই আর দ্বৈপায়ন-ঋষির শরণ লইতে হইবে না, তাহা হইলে লেখকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। বদরিকাশ্রমযাত্রী যাহারা হিমালয়ের চড়াইউত্রাই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসযাত্রী যিনি যোলহাজার ফুট উপরে উঠিয়া 'নীতি-পাস্' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি দার্জ্জিলিঙে কিংবা সিমলা-শৈলের আলোকমণ্ডিত রাজপথে যাঁহারা বিহার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের পাদদেশের সমতলবাসীর পক্ষে তাহা ইন্দ্রিয়মনের অগোচর, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, হিমালয়ের এক এক দেশে, এক এক অঙ্গে, তাহার কিন্নরীসেবিত গুহামধ্যে, তাহার সরলদ্রুমাচ্ছন্ন সানুদেশে, তাহার গৈরিকখচিত উপত্যকায়, তাহার মারুতপূর্ণরন্ধ্র আপাদিক্ত-রেণুরুক্তা কীচক-বনে, তাহার হিমশীকরবাহি-পবন-সেবিত গিরিনির্ঝর-

প্রান্তে চিত্তবিভ্রমকর অতুল্য শোভা আছে সত্য; কিন্তু সেই একদেশ-ব্যাপী শোভা, সেই প্রাদেশিক মূর্ত্তি, সমগ্র হিমাচলের প্রতি নিরীক্ষণের বড় অবকাশ দেয় না। হিমাচলের বিরাট্ মূর্ত্তির শোভা হৃদগত করিতে হইলে যেমন দূরে থাকিয়া তাহার তুঙ্গ শিখররাজির দিকে অবলোকন আবশ্যক, সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের বিশাল মহাকাব্যের মধ্যে অসংখ্য খণ্ডকাব্য নিবিষ্ট রহিয়াছে; অনেক বনজঙ্গল ভেদ করিয়া, অনেক প্রস্তরকঙ্কর অতিক্রম করিয়া, অনেক চড়াই-উত্‌রাই পার হইয়া, ক্লান্তশরীরে সেই সকল খণ্ডকাব্যের সৌন্দর্য্যদর্শনে অধিকারী হইতে পারিলে, দর্শকের মন আনন্দরসে অভিপ্লুত হয়, সন্দেহ নাই; সেই সকল খণ্ডকবিতার উপমাও অন্যত্র দুর্ল্লভ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমগ্র মহাকাব্যের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির বিষয়ে সেই খণ্ডকাব্যের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করে না। সমগ্র মহাকাব্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে, যেন মহাকাব্য হইতে কতকটা দূরে থাকাই সঙ্গত। সেই সকল খণ্ডকাব্যের খণ্ড সৌন্দর্য্যকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া মহাকাব্যের বিশালায়তনের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করাই সঙ্গত।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মূল মহাকাব্য পড়েন নাই, কিন্তু সকলেই দূর হইতে সেই মহাকাব্য দেখিয়াছেন; ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামার উন্নত চরিত্র হিমগিরির উন্নত শৃঙ্গের ন্যায় দূর হইতে সকলেরই নেত্রগত হইয়াছে। তথাপি আমরা মহাকাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় সমালোচকদের অবস্থা অন্যরূপ। রামায়ণ-মহাভারতের ইউরোপীয়গণের লিখিত সমালোচনা পড়িয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত দূর হইতে নয়ন ভরিয়া মহাকাব্যের কাব্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই; নিকটে গিয়াও সমগ্র মহাকাব্য অধ্যয়নের অবকাশ তাঁহাদের পক্ষে ঘটে না। বিশেষত পর্ব্বতে উঠিবার সময় তাহার বনজঙ্গল, তাহার

প্রস্তরকঙ্কর তাঁহাদিগকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেয়; তাঁহাদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় পরাস্ত হইয়া যায়। তবে যিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটা প্রদেশের, কোন একটা অঙ্গের শোভাদর্শনে সফল হন, তিনি সেই শোভা বর্ণনা করিয়াই আপনার কাজ শেষ হইল, মনে করেন। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য সৌন্দর্য্যগৌরবে গরিষ্ঠ, সন্দেহ নাই; ইউরোপীয় সমালোচকেরা ঐ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমরা জানি, ঐ সকল খণ্ডকাব্যের যতই সৌন্দর্য্য থাক্, মহাকাব্যের বিশাল সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা স্থান পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই সকল খণ্ডকাব্যের সমালোচনায় যেমন উদার হইয়া পড়ে, মূল মহাকাব্যের প্রশংসায় তেমন উদারভাব দেখাইতে পারে না।

যাহা পড়িতে হয় না, তাহাই মহাকাব্য; মহাকাব্যের এই লক্ষণ নির্দ্দেশের অর্থ বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। মহাকাব্য না পড়িলে চলিতেও পারে; কিন্তু যাহা মহাকাব্য নহে, তাহা না পড়িলে একেবারেই চলে না। কালিদাস খুব বড় কবি, হয় ত ব্যাস বাল্মীকি হইতেও বড় কবি; কিন্তু তিনি মহাকাব্য লেখেন নাই। কুমারসম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার গল্প শুনিলে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পড়িলে চলিবে না; তাহা হইলে মূল কুমারসম্ভব তন্নতন্ন করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত টীকাটিপ্পনীসহ পড়িতে হইবে। নহিলে কুমারসম্ভব পড়াই হইবে না। কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদাসের ধ্বনি, কালিদাসের নিকটে না গেলে শুনিতে পাইবে না; দূর হইতে তাহার কিছুই বুঝিবে না। কালিদাস শিল্পী; তিনি পাতরের উপর পাতর বসাইয়া সৌধনির্ম্মাণ করিয়াছেন, শাদা ধপ্‌ধপে মার্ব্বেলের ইঁটের উপর ইঁট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিক্য-রত্ন-প্রবালের লতাপাতা কাটিয়া তাহাকে

বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি তাজমহল গাঁথিয়াছেন, আল্‌হাম্‌ব্রা গাঁথিয়াছেন; সেই সকল কারুশিল্পের শোভা দেখিতে হইলে নিকটে যাইতে হইবে; সকলেও সে শোভা দেখিবে না; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে যাইতে হইবে। নতুবা দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না।

শেক্‌সপীয়র হয় ত আরও বড় কবি, তাঁহার স্থান হয় ত হোমারের ও অনেক উচ্চে, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই। গ্রীক্ কবির হেলনকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাঁহার গল্প শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু যে রূপের আগুনের ট্রয়-নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও অদ্যাপি ঝলসিয়া দিতেছে। কিন্তু শেক্‌পীয়রের নায়িকাগণের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে কেবল গল্প শুনিলে বা অনুবাদ পড়িলে চলিবে না। তাহাদিগকে নিকটে গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে হইবে; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া দেখিতে হইবে। শেক্‌সপীয়রের ভাষা, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার ধ্বনি হইতে দূরে থাকিয়া শেক্‌সপীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না। এক একবার মনে হয় বটে, শেক্‌সপীয়রের এক একখানা খণ্ডকাব্যের ভিতর হইতে যেন সাগরকল্লোলের অথবা ভূগর্ভতরঙ্গের মত শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন দাবদাহের গম্ভীর শব্দ দূর হইতে কাণে বাজিতেছে, কিন্তু নিকটে না গেলে সে শব্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শেক্‌সপীয়র হয় ত একালের মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নাই।

কৃত্রিম পদার্থের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বাভাবিক পদার্থের সৌন্দর্য্যের ঠিক তুলনা হয় না। কোন্ সৌন্দর্য্য বড়, তাহার তুলাদণ্ডে পরিমাপ চলে না। মনুষ্যপ্রতিভা সময়ে সময়ে যেন বিধাতার সৃষ্টিকেও পরাস্ত করে। সেই জন্য কৃত্রিমের পার্শ্বে স্বাভাবিককে দাঁড় করাইয়া কে ছোট কে বড় নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। কৃত্রিমে যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিকে থাকে

না; আবার স্বাভাবিকে যাহা থাকে, তাহা কৃত্রিমে থাকে না। উভয় বস্তু ভিন্ন পর্য্যায়ের। মহাকাব্য চতুরাননের বদন হইতে বিনির্গত হয় নাই, উহা মনুষ্যেরই রচনা, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাতে একটা স্বাভাবিকত্ব আছে, তাহা সেই মনুষ্যের রচিত অন্য উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর কাব্যে নাই। তাহাতে বনজঙ্গল, প্রস্তরকঙ্কর থাকিলেও তাহার একটা গৌরব আছে, তাহাকে দূর হইতে চেনা যায়; তাহার গন্ধ শুনিলে মন অভিভূত হয়; তাহাকে বুঝিতে হইলে সমজদার হইতে হয় না, শিক্ষানবিশী করিতে হয় না; চশ্‌মা পরিতে হয় না; স্বভাবদত্ত চক্ষু লইয়াই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই অলঙ্কারহীন, পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মনুষ্যের সভ্যতা, অন্তত বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম বস্তু। এই কৃত্রিমতার আমি নিন্দা করিতেছি না; হয় ত কৃত্রিমতাই মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ; হয় ত কৃত্রিমতা মনুষ্যত্ব হইতে অভিন্ন; অন্তত মানবিকতার সহিত পাশবিকতার যাহা পার্থক্য, তাহারই নাম কৃত্রিমতা। সুতরাং কৃত্রিমতার নিন্দা করিলে মনুষ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্মকেই নিন্দা করা হয়। এইজন্য কৃত্রিমতার নিন্দা করিতে চাহি না। কৃত্রিমতাই মনুষ্যের গৌরব বলিলেও বিস্মিত হইব না। কৃত্রিমতাতেই মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি, তাহাও বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতেই মানবপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা, তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তথাপি কৃত্রিম শিল্প কৃত্রিম। উহাতে চাকচিক্য আছে, গাঁথনি আছে, ওস্তাদি আছে, ও সকলের উপরে উহার চেষ্টাকৃত নির্ম্মাণ-কল্পনায়—উহার ডিজাইনে—মনুষ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের আভাস আছে; আর যাহা স্বাভাবিক, তাহাতে চাকচিক্য নাই, গাঁথনি নাই, তাহা অযত্নকৃত অযথাবিন্যস্ত ঝটিকাভগ্ন বারিধারাবর্ষিত বৃহৎ দ্রব্যের সমাবেশে গঠিত। মানুষের বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম। সেইজন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা, সেই স্বভাবিকতার অভাবে

বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যতায় মহকাব্যের উৎপত্তির প্রতিরোধ করে। আধুনিক সভ্যতা কবিত্বসৃষ্টির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্যসৃষ্টির বোধ হয় অন্তরায়। এখন কর্ম্মযন্ত্রে ভ্রমমাণ মনুষ্যকে তাহার নিরবকাশ জীবনের কথঞ্চিৎ-লব্ধ অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলিকে খণ্ডকাব্যের ও খণ্ডসৌন্দর্য্যের আলা ও বৈচিত্র্য দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়, বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার বিশাল সৌন্দর্য্যের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্যই বোধ হয়, সভ্য-সমাজে শেক্‌স্‌পীয়র জন্মিয়াছেন, কালিদাস জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জন্মেন নাই বা বাল্মীকি জন্মেন নাই। ইহাতে মনুষ্যজাতির ক্ষতি কি লাভ, তাহা গণনার অবসর লেখকের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সংসারের স্রোত উল্টাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও মহাকবির উৎপাদনে সমর্থ হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা; আবার যদি কালের স্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না।

আমিষ ভোজন

আমিষ ভোজনের কর্ত্তব্যতা লইয়া অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও যে মীমাংসা হইবে লেখকের এরূপ দুরাশা নাই।

তিন দিক্ হইতে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শরীর রক্ষার কথা, বিজ্ঞানের বিষয়; খরচের কথা অর্থ শাস্ত্রের বিষয়; তার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা।

বিজ্ঞানের কথাটা আগে শেষ করা যাক্। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে মনুষ্য-শরীরের উপাদান অনেকটা কয়লা, অনেকটা জল, খানিকটা ছাই। কাজেই খাদ্য সামগ্রীতে এই তিন পদার্থ থাকা দরকার। তিন উপাদানের মধ্যে কয়লাটা এক অর্থে প্রধান। শরীরের তাপ রক্ষার জন্য কয়লা পোড়াইতে হয়; কাজ কর্ম্ম করিতে হইলে কয়লা পোড়াইতে হয়; সেই জন্য শরীরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কয়লা পোড়ে। শরীর একটা এঞ্জিন সদৃশ। সেই এঞ্জিনটা গঠন করিতে খানিকটা কয়লা ও ছাই ও জলের প্রয়োজন। এই তিন সামগ্রী একত্রযোগে মনুষ্য-শরীর নির্ম্মাণে লাগে।

দুঃখের বিষয় আমরা কয়লা ও ছাই এই দুই পদার্থ হজম করিতে পারি না অন্য উপায়ে শরীর মধ্যে গ্রহণ করি। উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে কয়লা সংগ্রহ করে, মাটি হইতে ছাই ও জল সংগ্রহ করে। এই তিন পদার্থ মিশিয়া জটিল উদ্ভিদ-দেহ নির্ম্মিত হয়। প্রাণী আবার উদ্ভিদ্-দেহ আত্মসাৎ করিয়া ঐ তিন পদার্থকে আরও জটিলতর করিয়া মিশাইয়া ফেলে ও আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। সামান্য কয়লা, ছাই ও জলকে উদ্ভিজ্জে পরিণত করিতে বিশেষ প্রয়াস আব-

শুক, স্বয়ং সূর্য্যদেব ইহাতে সহায়। উদ্ভিদ্‌দেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করিতেও প্রয়াসের দরকার; কিন্তু প্রাণিদেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করিতে তত প্রয়াস লাগে না। প্রাণীরা দুই শ্রেণী। এক শ্রেণী নিরুপায় ও নির্ব্বোধ; ইহারা কায়ক্লেশে উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া উদ্ভিদ্‌দেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করে। আর এক শ্রেণী চালাক; ইহারা বিনা আয়াসে বা অনায়াসে অন্য প্রাণীর দেহকে আত্মসাৎ করিয়া নিজদেহে পরিণত করে। ফল কথা উদ্ভিজ্জ হইতে প্রাণিদেহ নির্ম্মাণে যতটা কষ্ট, এক প্রাণীর দেহ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া অন্য প্রাণীর দেহে পরিণতি পাইতে তত কষ্ট নাই। মোটের উপর মাংস হজম সহজ; উদ্ভিদ্ হজম করা কষ্টসাধ্য। উদ্ভিজ্জাশী মাটি হইতে খরচ করিয়া ইট তৈয়ার করিয়া ঘর বানান; মাংসাশী একেবারে তৈয়ারী ইট সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উপমাটা অবশ্যই অত্যন্ত মোটা গোছের হইল।

ফলে উদ্ভিজ্জ-খাদ্যের অনেকটা বর্জ্জন করিতে হয়; বাকীটাকেও প্রয়াস সহকারে রক্তমাংসাদিতে পরিণত করিতে হয়। প্রাণিজ খাদ্যে ততটা বর্জ্জনীয় অংশও নাই, পরিণতির প্রয়াসটাও কম। এ সকল শরীরবিজ্ঞান সম্মত স্থূল কথা; ইহা লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে এক রাশি উদ্ভিজ্জ ভোজনে যে ফল, অল্পমাত্র মাংস ভোজনেও সেই ফল। রাশি রাশি পদার্থ ভোজন করিতে হয় বলিয়াই প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জাশী জন্তুর পাকযন্ত্রও প্রকাণ্ড, সমস্ত শরীরের আয়তনও মোটের উপর প্রকাণ্ড। গোরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, হাতী প্রভৃতি উদাহরণ। প্রধান প্রধান মাংসাশী জীবের পাকযন্ত্রও ছোট শরীরও ছোট। সিংহ ব্যাঘ্রাদি উদাহরণ। এই হিসাবে আমিষ ভোজনে লাভ; উদ্ভিজ্জ ভোজনে লোকসান।

কোন কোন উদ্ভিদের কোন কোন অংশ প্রায় মাংসের মতই পুষ্টিকর হইতে পারে। ছোলা, মুগ, মসুরী, কলাই প্রভৃতি পদার্থ উদাহরণ। কৃষি দ্বারা এই সকল পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ কতক পাওয়া যায়। আবার রসায়নসম্মত উপায়ে সাধারণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে মাংসের মত বা মাংসের অপেক্ষাও পুষ্টিকর পদার্থ তৈয়ার করা না যাইতে পারে এমন নহে। কিন্তু কৃষিলব্ধ ও রাসায়নিক উপায়লব্ধ পুষ্টি-কর খাদ্য সম্প্রতি তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কাজেই সে উপদেশ নিষ্ফল।

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি? উদ্ভিদের মধ্যে ধান, গম, প্রভৃতি শস্য, ছোলা মুগ প্রভৃতি কলাই, ও নানাবিধ ফলমূল সম্প্রতি মনুষ্যের খাদ্য। এই সমস্ত দ্রব্য কৃষিলব্ধ। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় এ সকল দ্রব্য পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল না; মনুষ্য কৃষিবিদ্যাদ্বারা এ সকলের এক রকম সৃষ্টি করিয়াছে বলা যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জাশী ইতর জন্তু ঘাস পাতা খায়, তাহা মনুষ্যের পাকযন্ত্রের উপযোগী নহে। কাজেই মনুষ্যের আদিম কালে প্রাণিজ খাদ্যই প্রধান ছিল সন্দেহ নাই, একালেও অসভ্য ও বন্য মনুষ্য মৃগয়াজীবী। যাহাদের পশুপালন জীবিকা, তাহাদেরও প্রধান খাদ্য পশুমাংস। পশুহত্যায় সাহায্যের জন্যই আরণ্য বৃকের কুক্কুরত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ভোজনার্থই গোমোষাদি পশু গ্রাম্যত্ব লাভ করিয়াছে। ফলে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য প্রাণিমাংস। প্রাণিমাংস যেখানে কুলায় নাই, যেখানে ভূমি উর্ব্বরা ও প্রকৃতি অনুকূল, সেইখানে মনুষ্য বুদ্ধির জোরে কৃষি বিদ্যা সৃষ্টি করিয়া বিবিধ আরণ্য অখাদ্য উদ্ভিজ্জকে মনুষ্যোপযোগী খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে সমর্থ করিয়া লইয়াছে। তথাপি কৃষিজীবী সভ্যতম সমাজেও মনুষ্য অদ্যাপি বহুলপরিমাণে মাংসভোজী তাহার কারণ কি?

সভ্য সমাজে মনুষ্য সংখ্যা এত বেশী যে কৃষিজাত দ্রব্যে কুলায় না। সেই জন্য ঘাস পাতা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিজ্জ মানুষের অখাদ্য, তাহাকে পশুসাহায্যে পশুমাংসে পরিণত করিয়া মনুষ্য কাজে লাগায়। সভ্য সমাজে মানুষ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে, তথাপি কুলাইতেছে না; সভ্যতম সমাজেও বিস্তর লোক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে থাকে। তাহার মূল কারণ আহার সামগ্রীর অপ্রাচুর্য্য।

তিনটা কথা পাওয়া গেল। মাংস উদ্ভিজ্জের অপেক্ষা পুষ্টিকর; মাংস মনুষ্যের নির্দ্দিষ্ট খাদ্য; কৃষি জাত উদ্ভিজ্জ কোন সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ও প্রচুর নহে। সুতরাং মনুষ্যের প্রবৃত্তি মাংসের দিকে। মনুষ্য প্রাকৃত নিয়মে জীবনরক্ষার জন্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাংস ভোজনে বাধ্য।

এই কয়টি কথার প্রতিকূলে বিরোধ উত্থাপন ভ্রম। তথাপি কেহ কেহ বিবাদ তুলেন।

কেহ বলেন, অনেক নিরামিষাশী ব্যক্তিকে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী দেখা যায়। এটা কোন কাজের কথা নহে। মনুষ্যের দীর্ঘজীবিত্ব ও স্বাস্থ্য এত বিভিন্ন কারণে নিয়মিত হয়, যে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের উদাহরণ দ্বারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা চলে না।

কেহ দেখান, উদ্ভিজ্জাশী জীবজন্তু দীর্ঘজীবী; যেমন হাতী ঘোড়া ইত্যাদি। এ কথাটাও বিজ্ঞানসম্মত নহে। জীববিজ্ঞান অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেয়। আহার ও পরমায়ুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। উপরেই বলিয়াছি উদ্ভিদ্জীবী জীবের কলেবরও বৃহৎ হয়; বৃহৎ কলেবরের সহিত দীর্ঘ পরমায়ুরও একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা জীববিজ্ঞান স্বীকার করে। ইহার ব্যাখ্যা হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ফলে কোন জাতির পরমায়ুর পরিমাণ একেবারে নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে

আর খাদ্য নির্ব্বাচন দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। সংক্ষেপে এ তত্ত্ব বুঝান চলে না; ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে।

এই পর্য্যন্ত গেল বিজ্ঞানের কথা। অর্থশাস্ত্র কি বলে দেখা যাউক। জীবনরক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক ব্যাপার, উদরের জ্বালার মত জ্বালা নাই। স্বাভাবিক কারণে মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র, কারণ যত মানুষ আছে, তত খাদ্য নাই। মাংস যেখানে শস্তা, মনুষ্য সেখানে মাংসই খাইবে; ইহাতে আপত্তি নিরর্থক।

নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী পাঠক এতক্ষণ আমার উপর খড়্গ-হস্ত হইয়াছেন। কিন্তু মাভৈঃ। এখনও আশা আছে। এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আছে। আমিষ আহার ধর্ম্মসঙ্গত কি না এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। সচরাচর এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়।

মাংস ভোজনে স্বভাব হিংস্র হইয়া থাকে। মাংসভোজী পশু হিংস্র, ক্রূর, নিষ্ঠুর।

কথটা ঠিক নহে। মাংস খাইয়া খাইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র স্বভাব পাইয়াছে বলা সঙ্গত নহে। বয়স বাড়িলে ব্যাঘ্রের হিংস্রত্ব বাড়ে তাহার প্রমাণ নাই। পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বাড়িতেছে তাহাও নহে। হিংস্র না হইলে ব্যাঘ্রের চলে না সেই জন্য ব্যাঘ্র হিংস্র। নিরীহ স্বভাব ব্যাঘ্রের এ জগতে স্থান নাই। প্রকৃতি ঠাকুরাণী যেদিন খর নখর ও খরতর দন্ত দ্বারা ব্যাঘ্রাবয়বকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ও তাহার পাকযন্ত্রকে উদ্ভিজ্জপরিপাকে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেই ক্ষণেই তাহার স্বভাবকেও নিষ্ঠুর করিয়া দিয়াছেন। মাংসাশী জন্তুর হিংস্র স্বভাব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, মাংস ভোজনের আনুষঙ্গিক হইলেও মাংস ভোজনের ফল নহে। মাংস খাইলেই মাথা গরম ও রক্ত গরম হইবে এমন কোন প্রমাণ নাই তবে মাংস আহরণের সময়

মাথা গরম ও রক্ত গরম হওয়া আবশ্যক নতুবা মাংস সংগ্রহ চলে না।

মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই। মাংস খাইলেই যে প্রকৃতি ক্রূর হইবে তাহা নহে; তবে যাহাদের মাংস না হইলে চলে না, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রূর হইতে হয়। কেননা মাংস সংগ্রহ ব্যাপারটাই নিষ্ঠুর কাজ। মাংস একবার উদরগত হইলে আর যে ক্রূরতা বাড়াইবে তাহার কোন কথা নাই। যাহার মাংসই প্রধান খাদ্য, মাংস যাহাকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, তাহার ব্যবসায় নিষ্ঠুর না হইলে চলিবে না। মাংস ভোজনের ফলে মনুষ্য নিষ্ঠুর হয় না, উগ্র স্বভাব হয় না। শরীরবিজ্ঞান কিছুই বলে না। হয় কি না বিনা পরীক্ষায় প্রমাণেরও আশা নাই। সেরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কিনা জানি না।

হিন্দুর স্থায় কৃষিজীবী জাতি নিরীহ স্বভাব; কেননা হিন্দুর দেশে কৃষিলব্ধ খাদ্য এত জন্মিয়া থাকে, যে মাংস সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন নাই। * * * অনেকে বলেন শীতপ্রধান দেশে অধিক মাংস আবশ্যক। একথার মূল কি তাহা জানিনা। কথাটা বোধ হয় বিজ্ঞানসম্মত নহে। ইউরোপীয়ের মাংসাহারের সহিত তাহাদের দেশের শীতাধিক্যের মুখ্য সম্বন্ধ নাই। মাংস শীত নিবারণে সাহায্য করে না। উদ্ভিজ্জের অভাবে উহারা মাংস খায়; সেই মাংস সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রূর স্বভাব হইতে হইয়াছে। মাংস ভোজন করিয়া উহারা ক্রূর স্বভাব হয় নাই। সংগ্রহ ও ভোজন দুইটা পৃথক্ ব্যাপার। সংগ্রহকারী নিষ্ঠুর; ভোজনকারী নিষ্ঠুর না হইলেও পারে। তবে যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকেই অনেক সময় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, আবার স্বয়ং সংগ্রহ না করিতে পারিলে অপরের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়; স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া সংগ্রহ কার্য্যের অনুমোদন ও সাহায্য করিতে হয়। সুতরাং তিনি গৌণভাবে এই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ের জন্য দায়ী।

কথাটা দাঁড়াইল এই। মাংসভোজনে মানসিক বৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, তাহার সম্যক্ প্রমাণ নাই, তবে মাংস আহরণে নিষ্ঠুরতা আবশ্যক। এবং যিনি স্বয়ং মাংস আহরণ করেন না, অন্যের আহৃত মাংস ভোজন করেন, তিনিও গৌণভাবে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। নিষ্ঠুরতা যদি অধর্ম্ম হয় তিনি এই অধর্ম্মের অংশতঃ ভাগী তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা উপরে বলিয়াছি, মাংস ভোজনে শরীরের বৃদ্ধি আছে; স্বাস্থ্যের উন্নতি আছে; দেশকাল ভেদে মাংস নহিলে জীবন রক্ষাই চলে না। এমন আহার মাংসভোজনে অধর্ম্ম আছে কি না? উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' নতুবা মনুষ্য সমাজে এ বিষয়ে এত মতভেদ কেন?

ইউটিলিটি ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে; লোকহিতই ধর্ম্ম। কিন্তু কোন একটা কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত স্থির করিতে গিয়া যিনি ক্ষতিলাভ গণনার হিসাব করিতে বসেন, এই কার্য্যে লোকহিত হইবে কি না বিবিধ যুক্তি ও বিবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে অঙ্কপাত করিয়া গণনা করিতে বসেন তাঁহার মত নির্ব্বোধ দ্বিতীয় নাই। এরূপ গণনা অসম্ভব। এই বিচারে গণনার আশ্রয় না লইয়া আমাদের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কি বলে তাহার সন্ধান লওয়াই বিধেয়। ইংরাজিতে যাহাকে কমন্‌সেন্‌স্ বলে আমি তাহাকেই সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিতেছি। এ প্রবৃত্তিই যে আবার সকল লোকের পক্ষে একই রকম ও এই প্রণালীতেই যে সর্ব্বত্র খাঁটি উত্তর পাওয়া যাইবে, কোথাও ঠকিতে হইবে না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। চোরের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে আমার সাহস হয় না। তবে ধর্ম্ম নিরূপণের সময় মোটের উপর ইউটিলিটির হিসাব ও ক্ষতি লাভ গণনা অপেক্ষা ইহার উপর নির্ভরই শ্রেয়ঃ।

নিষ্ঠুরতা যতই আবশ্যক হউকনা কেন, সাধুলোকের সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিষ্ঠুরতার প্রতিকূল। নিষ্ঠুরতার দিকে সাধুলোকের অনুরাগ হইতে পারে না। অথবা নিষ্ঠুরতায় যার যত বিরাগ সে তেমনি সাধু। মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা সর্ব্বতোভাবে সাধু প্রকৃতির পক্ষে কষ্টকর; ইতর জীবের প্রতি দয়াও সংসম্মত। এমন কি শাদা চামড়ার মধ্যেও সময়ে সময়ে পশুপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

মানবপ্রেম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইউরোপের লোকেও পশুক্লেশ-নিবারিণী-সভা স্থাপন দ্বারা এবং পাস্তুর-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপ্রণালীর বিরোধাচরণ করিয়া পশুপ্রেমের পরিচয় দেন; কেহ কেহ বা আমিষাহার বর্জ্জনের ফ্যাশন তুলিয়া ইন্দ্রিয়সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখান। সুতরাং জীবহিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা যে সাধুজনের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পীড়া দেয় তাহাতে সংশয় নাই। ইউটিলিটির হিসাব ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে ধর্ম্মমীমাংসা যদি সুকর হয়, তবে জীবহিংসা অধর্ম্ম। মাংস ভোজনে জীবহিংসার প্রশ্রয় দেয়, সুতরাং জীবহিংসা অধর্ম্ম। জীবের মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হইতে পারে তথাপি জীবহত্যা অধর্ম্ম।

আমাদের হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে মত কি তাহা বিবেচ্য। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই মত এই দেশেই প্রচারিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টানের দেশে নহে। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের উচ্চতর স্তরে হিংসার প্রতি যতটা বিরাগ আছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও ততটা আছে কিনা জানি না। অন্ততঃ এদেশের বৃহৎ মানবসম্প্রদায় যে ভাবে জীবহিংসা ও আমিষাহার বর্জ্জন করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। অবশ্য

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত অহিংসাধর্ম্মের স্থানে স্থানে বিরোধ দেখা যায়। এই ঘটনাটার আর একটু বিচার আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বেদ। বেদ পশু হিংসার বিরোধী নহে। বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার ব্যবস্থা ছিল। ঋষিরা মাংসভোজী ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, একালে যে মাংস হিন্দুর পাতিত্য জনক, ঋষিদের নিকট তাহাও উপাদেয় ছিল। একালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনা বৈদিক যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। দেবোদ্দেশে পশুহত্যা এই সকল উপাসনাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একালে অনেক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় মাংস বর্জ্জন করিয়াছেন, অনেকে দেবোদ্দিষ্ট মাংস ভিন্ন অন্য মাংস খান না, তথাপি মাংস ভোজন হিন্দুর বর্জ্জনীয় এরূপ ব্যবহার নাই। পিতৃ-শ্রাদ্ধে মাংস ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত। আয়ুর্ব্বেদ ও বৈদিকশাস্ত্রে বিবিধ মাংসের গুণকীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা আছে। বলা বাহুল্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলে আয়ুর্ব্বেদ এরূপ বিধানে সাহসী হইতেন না। শাস্ত্রে স্পষ্ট নিষেধ নাই, স্থানবিশেষে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে; অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মাংস-ভোজনের বিরোধী; এস্থলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত অহিংসা-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে খট্‌কা উপস্থিত হয়।

এই খট্‌কা বহুদিন পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ততঃ মনুসংহিতা ও মহাভারত রচনার সময় শাস্ত্রের সহিত সহজ ধর্ম্মের এই বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অহিংসাধর্ম্ম বৌদ্ধগণের প্রবর্ত্তিত মনে করিবার সম্যক্ কারণ নাই। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাংসভোজন একেবারে নিষেধ করিয়া যান নাই। শ্রমণ সম্প্রদায় মধ্যে মাংসভোজন প্রথা ছিল। একালের বৈদেশিক বৌদ্ধেরা মাংসভোজনে কুণ্ঠিত নহেন। তবে করুণাসিন্ধু ভগবান শাক্যমুনি বৈদিকযজ্ঞে পশুহত্যার নিন্দা করিয়াছিলেন; এদেশে অহিংসা ধর্ম্মপ্রচলনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে চলিবে না।

মনুসংহিতাকার বড়ই গোলে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী; বৈদিক আচার অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা; অথচ তাঁহার মনে বলিতেছে জীবহত্যা কাজটা ভাল নহে। বৈদিক ব্যবহার লোপে তিনি সাহসী হয়েন নাই, যজ্ঞানুষ্ঠান ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যার তিনি নিন্দা করিয়াছেন; শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন "প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।'

এই মীমাংসা একালের লোকের পছন্দ হইবে না। একালের লোকে বলিবেন মনুসংহিতাকার ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশ সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয়েন নাই। এ কালের যুক্তি যে ধর্ম্মনির্ণয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রাহ্য নহে। সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা কমনসেন্স যাহা অনুমোদন করিবে তাহাই গ্রাহ্য। সমস্ত সমাজ সংস্কারকের মুখে এই এক কথা। হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয় না; কাজেই সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজের নিপাত কামনা করেন।

আমরা হিন্দু সমাজের ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এই বিবাদটার সমালোচনা করিব। বিষয়টা আলোচ্য; কেননা কেবল হিন্দু সমাজ কেন সকল সমাজেই শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির এই বিরোধ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বেদ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম শব্দটা ইচ্ছা পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছি। কেননা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে বেদ বিরোধী অনেক উপাদান প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বেদ। 'ধর্ম্ম' শব্দ ও 'বেদ' শব্দের একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। ধর্ম্ম বলিলে ঠিক্ রিলিজন বুঝায় না। রিলিজনের মুখ্য সম্বন্ধ ঈশ্বর, পরকাল, ও অতিপ্রাকৃতের সহিত। ধর্ম্মের সম্বন্ধ মনুষ্যের সমগ্র জীবনের সহিত। আমরা সম্পূর্ণ ঐহিক স্বার্থের জন্য আহার বিষয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা লই, রাজাকে নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়া থাকি;

সম্পত্তিতে সত্ব লইয়া প্রতিবাদীর সহিত মোকদ্দমা করি। এ সকল কার্য্য রিলিজনের অন্তর্গত নহে। কিন্তু ইহা খাঁটি ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই সকল কার্য্য যথাবিধানে সম্পাদন না করিলে অধর্ম্ম হয়। ডাক্তার ও উকীল ও ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মব্যবস্থাপক। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ ডাক্তারী ও আইন। অনেকে এজন্য বিস্মিত হন, অনেকে গালি দেন। আমরা বিস্ময়ের বা গালি দেওয়ার কারণ দেখি না। ব্যবহার সঙ্গত হইতেছে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম শব্দটা রিলিজন অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মনুষ্যের সমগ্র কর্ত্তব্য সমষ্টি।

বেদ শব্দে সঙ্কীর্ণ অর্থে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ বুঝায়। প্রশস্ত অর্থে বেদ শব্দ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইংরাজি প্রতিশব্দ tradition অনেকটা কাছাকাছি আসিতে পারে। আরও প্রশস্ত করিয়া মনুষ্যজাতির অথবা আর্য্যজাতির ধর্ম্মমার্গে ও কর্ম্মমার্গে সমগ্র অতীতকাল ধরিয়া উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার নাম বেদ। এই বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, অনাদি। ইহার আদি পাওয়া যায় না। অন্ততঃ মনুষ্যজাতির যেদিন আরম্ভ, এই অভিজ্ঞতার সেই দিন আরম্ভ। কিংবা ইহার আরম্ভ আরও পূর্ব্বে। ব্রাহ্মণের শাস্ত্র খুঁজিলে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনতত্ত্ব মিলিতে পারে, এরূপ আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর অন্য কোন মনুষ্য সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণের ইহাই প্রধান গৌরব। ব্রাহ্মণের মতে মনুষ্যের একদিনে সহসা সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞতাও এক দিনে জন্মে নাই। কোন্ তারিখে এই অভিজ্ঞতার বীজ বপন হইয়াছিল তাহার নির্ণয় নাই। হয়ত জগতের যে দিন আদি, এই অভিজ্ঞতার সেই দিন আরম্ভ। কাজেই বেদ অনাদি; ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা বা শ্রোতা;

স্বয়ং জগন্নিয়ন্তা ব্রহ্মাও বেদের স্রষ্টা নহেন। খ্রীষ্টানি হিসাবের সৃষ্টি ব্রাহ্মণ মানিতেন না। জগতের সৃষ্টি হয় নাই; বেদেরও সৃষ্টি হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয়।

মনুষ্য তাহার প্রাচীন বহুকালের উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলে কতকগুলি সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া সমাজ বাঁধিয়া বাস করে। এই সকল নিয়মের পরিচালনার ভার কতক রাজার উপর, কতক যাজকের উপর, কতক জনসাধারণের উপর। কিন্তু তাহারা নিয়ন্তা ও পরিচালক, কেহই স্রষ্টা নহেন। এই সকল নিয়ম প্রকৃতির অঙ্গীভূত; প্রাকৃতিক নিয়মে বিকাশ পাইয়াছে, বিকৃত হইতেছে, লয় পাইবে। কাজেই ব্রাহ্মণের চক্ষে এই সকল সামাজিক নিয়ম অর্থপূর্ণ ও মাহাত্ম্যে মণ্ডিত। সহস্র যুগের অতীত ইতিহাস এই সকল সামাজিক নিয়মের শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল নিয়মের সমষ্টি ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক মহাযন্ত্রে যে নিয়ম, যে শৃঙ্খলা, যে ব্যবস্থা আছে, মানব সমাজের অন্তর্গত নিয়ম সমষ্টি তাহার অন্তর্গত। ধর্ম্ম জগদ্বিধানের একটা ভাগ। মাধ্যাকর্ষণের উপর তোমার আমার হাত নাই; সামাজিক নিয়মের উপর আমাদের হাত নাই; ধর্ম্ম অনাদি ও সনাতন পুরাতন।

আচার অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনশীল, ধর্ম্মের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ধর্ম্ম পুরাতন। মাধ্যাকর্ষণে ব্যভিচার নাই, তথাপি পৃথিবী একত্র স্থির নাই। প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যভিচার নাই তথাপি ধরাপৃষ্ঠ যুগ ব্যাপিয়া বিবিধ বিকারে বিকৃত হইয়াছে। সামাজিক নিয়মের ব্যভিচার নাই, ধর্ম্ম সনাতন, তথাপি আচার অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনশীল, ধর্ম্মের মূর্ত্তি মনুষ্যের নিকট দেশকালভেদে বিভিন্ন। দেশকালভেদে নীতি, ইংরাজিতে যাহাকে মরালিটি বলে, তাহাও পরিবর্ত্তিত হয়; দেশকালভেদে আচারও পরিবর্ত্তিত হয়। মনুসন্তানের পুরাতন জ্ঞানসমষ্টিরূপী বেদ মধ্যে ধর্ম্ম নিহিত আছে; অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি

সহকারে ধর্ম্মের পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রাহ্মণ একাধারে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল। অতীতের প্রতি ভক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু সেই ভক্তি সমাজের গতি রুদ্ধ করে নাই। মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ সনাতন ধর্ম্মের মার্গে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে; বিনা রক্তপাতে বিনা কোলাহলে প্রাচীন আচার প্রাচীন অনুষ্ঠান ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যে ব্রাহ্মণকে উন্নতির বিরোধী বলে, সে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই; সে পৃথিবীর অন্যদেশের ইতিহাস পড়ে নাই; সে চক্ষু সত্বে অন্ধ।

কথাপ্রসঙ্গে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। মনুষ্য অভাবে প্রকৃতির নিয়োগে জীবনরক্ষার জন্য চিরকাল পশুমাংস ভোজন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে এক হিসাবে অধর্ম্ম নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকল মনুষ্যের মতই নির্ব্বিকার চিত্তে মাংস ভোজন করিতেন; কেননা তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধর্ম্ম। দেবতার প্রীতির জন্য পশুবলি হইত; পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ইতিহাস; একেশ্বরবাদী ইহুদীরাও জেহোবার মন্দিরে বিবিধ প্রাণী হত্যা করিত। এই কারণে বৈদিক যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা। শস্যপূর্ণ ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্য্য সন্তানের আর তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নাই; জীবের প্রতি দয়া-বৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণের নূতন ভাবের উদ্বোধন করিল। আশা করিতে পার মনুষ্য বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হইবে যেদিন নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হইবে না, সেদিন সমগ্র পৃথিবীতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মনুষ্যের সে অবস্থা হয় নাই। মনুষ্যকে জ্ঞানাভাবে ও শক্তির অভাবে অদ্যাপি প্রাচীন হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ মনুসংহিতাকার মনুষ্যের প্রাচীন ধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন

নাই। নূতন ধর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত দুর্ব্বল ক্ষুধার্ত্ত মানবকে এই পরম ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। অগত্যা মনুসংহিতকারের সহিতই বলিতে হয়।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

মাতৃ-মন্দির *

কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালিলে তাহার চিম্নির ভিতর হাওয়া জন্মে; আপন ঘরে আগুন দিয়া গ্রামের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইলে ছোট খাট একটা ঝটিকার উৎপত্তি হয়। কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক জটলা করিয়া দেশব্যাপী সাইক্লোন উৎপাদন করিতে পারে না।

বাঙ্গলা দেশ ব্যাপিয়া যে একটা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অতি বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং এই হাওয়া যে কেবল আমাদের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় জন্মে নাই তাহাও বলা বাহুল্য। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী ফুৎকার প্রয়োগে পটু, কিন্তু সাত কোটি বাঙ্গালী এক সঙ্গে ফুৎকার দিলেও বাঙ্গলা দেশে এমন একটা ঝটিকাবর্ত্তের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। ঝড় একটা বহিতেছে, তাহা স্বীকার্য্য; প্রত্যক্ষ প্রমাণেও যদি কেহ অস্বীকার করেন, তাঁহাকে আমরা ভারত সচিব সাধু মর্লির বক্তৃতা হইতে কোটেশন তুলিয়া মানাইতে পারিব, এরূপ ভরসা করি।

এই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া বাঙ্গালীর যত নগণ্য ধূলিকণা, বাঙ্গালার যেখানে যত তৃণাদপি লঘু পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা এখানে ওখানে সেখানে পুঞ্জীভূত হইতেছে, ও স্থানে অস্থানে স্তূপের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গলার

* ১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধনকল্পে রামেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন।

ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে আমরা দল বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার হাওয়ার গতি দল বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহারা কংগ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে জেলাসমিতিতে, পল্লীসমিতিতে দল পাকাইতেছেন; যাঁহারা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁহারা সামাজিক কন্‌ফারেন্সে মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা ধর্ম্ম মহামণ্ডলে সম্মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা শিল্পের উন্নতি চান তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; যাঁহারা শিক্ষার উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; আমরা সাহিত্যসেবীরাই কি চুপ করিয়া থাকিব? সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে আজ উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি দল বাঁধিতে চাহেন, আমরাই বা দল না বাঁধিব কেন? সকলেই যদি হাওয়ার অনুকূলে গা ঢালিয়া দেন, আমরাই বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই সাহিত্যসম্মিলনকে যদি কেহ গড্ডলিকা প্রবাহের মত পরের অনুকরণ জাত বলিয়া উপহাস করিতে চাহেন, তাহাতে আমরা কর্ণপাত করিব না।

করিব না, কেন না, যে হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা বিধাতার প্রেরিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। সাতকোটি বাঙ্গালী একযোগে ফুৎকার দিয়া কখনই ইহা জন্মাইতে পারিত না।

আমাদের বন্ধুগণ, যাঁহারা নানাস্থানে নানারূপ দল বাঁধিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন। কেহ লোক শিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ শিল্প শিক্ষার ভার লইয়াছেন, কেহ কাপড়ের কল চালাইতেছেন, কেহ দেশের অন্ন বাহিরে না যায়,

তাহার জন্য প্রাচীর গাঁথিবার কল্পনা করিতেছেন, কেহ সরকারের নিকট রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য ঘোঁট করিতেছেন, কেহ দল বাঁধিয়া সরকারের উপর গোসা করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা হাতের কাছে কর্ম্ম না পাইয়া স্বরাজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা দল বাঁধিয়া কি করিব? আমরা কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় পাইব। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে?

বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহিত অন্যান্য দলের একটু পার্থক্য আছে। কোন শরীরী জড়পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, অশরীরী ভাবপদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার। আমরা ভাবের হাটে বেচা কেনা, লেনা দেনা করিয়া থাকি। আমাদের নিকট যাহাদের মূল্য অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুঁইতে গেলে তাহা ধুঁয়ার মত ও বাষ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া আমরা বিচরণ করি না; আমরা পাখীর মত বায়ুমার্গে উড়িয়া বেড়াই। এই উড্ডয়ন কার্য্যে আমাদের কোন লাভ নাই; লাভের মধ্যে কেবল আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম এবং যা কিছু চেষ্টা, এবং বলা বাহুল্য এই পরিশ্রম স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত নহি। কেন না এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফল্য।

আমরা এই পাখীর দল যে আজ নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া এই ছায়ামণ্ডপতলে ঘটা করিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়াছি, আমাদের এই সভাভঙ্গ হইলে, তৎপরে আমরা কি করিব? আমাদিগকে আবার ত উড়িতে হইবে, আমরা কোন্ পথে কোন্ দিকে উড়িব? দেশের যে হাওয়া বহিয়াছে, সেই হাওয়ার গতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে উড়িতে হইবে। প্রবাহের অনুকূলে উড়িলেই সুবিধা; এবং সেই দিকে উড়িলেই আমাদের পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে। কেবল

দেখিতে হইবে, হাওয়ার গতিটা কোন্ দিকে? উহা সুপথে না বিপথে? উহার টান একটা আশ্রয়ের দিকে, না কোন অকূল পাথারে আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়া উহা আমাদের বিহঙ্গ জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিবে?

সকল দেশেই এক এক সময়ে এক একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ঝড় বহে। কোন দেশেই অন্তরীক্ষ চিরকাল প্রশান্ত থাকে না। চিরবসন্ত কোন দেশেই বিরাজ করে না। বৎসরে যেমন ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, মানব সমাজের ইতিহাসে তেমনি যুগের পরিবর্ত্তন ঘটে; এক এক যুগের হাওয়া এক এক দিকে। যুগের যাহা লক্ষণ—যাহাকে যুগধর্ম্ম বলা যায়, হাওয়ার গতি দেখিয়া তাহার নিরূপণ হয়।

আমাদের বাঙ্গলা দেশেও কতবার এইরূপ হাওয়া বহিয়াছে; কতবার কত যুগ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া দেশের লোকে বিক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। ভাবের পাথারে তখন তরঙ্গ উঠিয়াছে, কখনও বা পাথারের উপর তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাৎকালিক সাহিত্যিকেরা সেই হাওয়াতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; সেই তরঙ্গ ঠেলিয়া পাথারের মধ্যে তাঁহারা সাঁতার খেলিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের, বাঙ্গালী জাতির, ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডিদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্যস্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন; সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে, আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না।

বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন পণ্য দ্রব্য দেখাইবার আছে কি? ধনপতি সদাগরের ডিঙ্গায় চাপিয়া সিংহল যাত্রার সময়ে যাঁহারা সাত সাগরের জল খাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহিনী তুলিয়া আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপন্ন করিতে পারি; কিংবা প্রতাপাদিত্য দিল্লীপতির সহিত লড়াই করিবার পূর্ব্বে আপন পিতৃব্যের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এই প্রমাণে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিপন্ন করিতে পারি। কিন্তু তথাপি আমার সংশয় আছে, যে প্রাচীন বাঙ্গালীর এই বৈশ্যবৃত্তির বা বীরবৃত্তির উদাহরণ বড়বাজারে অধিক মূল্যে বিকাইবে না। জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবন-দ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্ত্তিকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না।

নাই বা হইলাম! তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙ্গলার পুরুষপরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা,—আকাঙ্ক্ষার কথা,—তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে

কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।

সে আজ দেড়হাজার বৎসরের কথা, যখন চীন পরিব্রাজক ফা হিয়াং সুহ্মরাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্তার বন্দর হইতে জাহাজ চড়িয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্য তখন জন্ম গ্রহণ করে নাই; তখনকার বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহিত, তাহাকে বাঙ্গলা ভাষা বলিব কি না, তাহা জানি না। বাঙ্গালী জাতি কিন্তু তখন গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পুণ্ড্র, চণ্ডাল ও কৈবর্ত্ত তখন বোধ করি বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া অবস্থিত ছিল। অনার্য্যের অধিবাস বঙ্গভূমিতে আর্য্যের উপনিবেশ, তাহার বহু পূর্ব্বে কোন্ পৌরাণিক যুগে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় কঠিন; রামায়ণে ও মহাভারতে, এমন কি ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে, তাহার স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে। নরকাসুরের বংশধর কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে অক্ষৌহিণী চালনা করিয়াছিলেন; পৌণ্ড্রক বাসুদেব যদুপতি বাসুদেবের স্পর্দ্ধা করিতেন; এই সকল নরপতির দেহ মধ্যে আর্য্য শোণিত প্রবাহিত ছিল কিনা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে আর্য্য সভ্যতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল। সে কোন্ পুরাতন কালের কথা! আমি যে কালের কথা বলিতেছি, তাহা সেকালের তুলনায় একাল। এই একালেই বা বাঙ্গলার অবস্থা কিরূপ ছিল ও বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ ছিল? ভাগীরথী তখনও শতশাখা বিস্তার করিয়া শতমুখে সাগর সঙ্গমে চলিতেন; গঙ্গাস্রোতের অন্তর মধ্যে দিগ্বিজয়ী রাজারা যে জয় স্তম্ভ নিখাত করিয়া যাইতেন, পর বৎসরের গঙ্গাস্রোতে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইত। সোণার বাঙ্গলার ধানের ক্ষেতে শালিধানের চারা এখনকার মতই উৎখাত হইয়া প্রতিরোপিত হইত ও হেমন্তাগমে কৃষক পত্নী রাত্রি জাগিয়া সোণার ফসল রক্ষা করিত, উজ্জয়িনীর মহা-

কবি তাহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। সে কালের রাজধানীতে ও নগর মধ্যে নাগরিকেরা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, দশকুমার চরিতের বর্ণনার সহিত একালের নাগরিক চরিত মিলাইলে বাঙ্গলাদেশে মানব চরিত্রের এই দেড়হাজার বৎসরে সবিশেষ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উত্তরবঙ্গের কামরূপ ও পুণ্ড্র রাজ্য ফা হিয়াংএর সময়েই প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও দুই শত বৎসর পরে যখন হুয়েং চ্যাং বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখনও উত্তরবঙ্গের সেই দুই রাজ্য সমৃদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। হুয়েং চ্যাংএর পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই পশ্চিম বঙ্গ, আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, গুপ্ত রাজাদের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষী। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেও তাহার এক ভগ্নাংশ পশ্চিমবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতেছিল হুয়েং চ্যাং স্বয়ং তাহার সাক্ষী। এই সভাস্থলের ক্রোশ দুই তিন ব্যবধান মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে রাঙ্গামাটির রক্তমৃত্তিকা মধ্যে হুয়েং চ্যাং বর্ণিত গঙ্গারামের ভগ্নাবশেষ হয়ত নিহিত রহিয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তখন আর্য্যাবর্ত্তের চক্রবর্ত্তী পদে আসীন আছেন। গৌড়েশ্বর গুপ্তরাজা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যা সাধন করিয়া সেই চক্রবর্ত্তী রাজার ক্রোধানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। গুপ্ত নরপতিরা বৈদিক প্রথার প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁহাদের রাজ্য কালে ব্রাহ্মণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। কিছু দিন পরেই দেখিতে পাই, বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গের রাজসভায় আহূত হইয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইতেছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের ভিত্তি-পত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

তার পরেই পাল রাজাদের অভ্যুদয়। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই একটা নূতন যুগ। তখন দেশ জুড়িয়া একটা নূতন হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরাতন তখন ভাঙ্গিতেছে, উহার ভগ্নাবশেষের আবর্জ্জনা সেই

যুগের হাওয়ায় দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জঞ্জালের মধ্য হইতে মাল মশলা সংগ্রহ করিয়া নূতনের গঠন চলিতেছে। এই যুগটা বস্তুতঃই অতি আজগুবি যুগ। চারি দিকেই তখন অদ্ভুত রসের বাহুল্য। পাল রাজারা সৌগত শাসন মানিতেন। ব্রাহ্মণ্য তাঁহাদের সময়ে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইতে পারিতেছে না। তখন ব্রাহ্মণ্যের সহিত বৌদ্ধ পন্থার দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা আছে। উভয়ের সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে আশ্রয় করিয়া ও উভয়কে বিকৃত করিয়া তান্ত্রিকতা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। নাথযোগীদের চেলারা তখন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী বুজরুকি দেখাইয়া বেড়াইতেছে। যোগীরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা মাটিতে পা ফেলিয়া চলেন না, তাঁহারা গাছে চড়িয়া আকাশ পথে দেশ ভ্রমণ করেন। বড় বড় বটের গাছ ও তালের গাছ তাঁহাদের এয়ারশিপের কাজ করে। তাঁহারা মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিবা-মাত্র মানুষ অবলীলা ক্রমে ভেড়া বনিয়া যায়। তখন হাড়িগুরুর আদেশে রাষ্ট্রপতি রাজ্য সম্পৎ ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ধর্ম্মঠাকুরের ডোম পুরোহিতের সম্মুখে ব্রাহ্মণ মাথা হেঁট করিয়া চলেন। চণ্ডী দেবী ব্যাধের নিকট পসার জাহির করিয়া পূজা লইবার জন্য ব্যস্ত, চ্যাংমুড়ি বিষহরি চাঁদ সদাগরের সর্ব্বনাশ করিয়া মহাদেবের উপর জয় লাভ করেন।

যে দেশে যে সময়ে ভবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী রাষ্ট্র শাসন করেন, সে দেশে সে সময়ে সকলই সম্ভবপর হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তখন উলূক বাহন ধর্ম্মঠাকুরের তোষামোদ করিতে প্রবৃত্ত হন। চণ্ডীর আদেশে হনুমান ধনপতি সদাগরের ডিঙ্গা ডুবাইবার আয়োজন করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, সীতাপতি যাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন, যাঁহার ব্রহ্মবলের নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রতেজ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, যিনি

ব্রহ্মার মানসপুত্র, তিনি আপনার প্রাচীন মহিমা ভুলিয়া গিয়া নূতন করিয়া সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মহাচীন দেশে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন; এবং সেই মহামুনির আদেশে মাতলামি ধরিয়া "উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে" এই উপদেশ মতে বীরভূম জেলায় রামপুর হাটের নিকট তারাপুর গ্রামে তারাপীঠের সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া অবশেষে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

বশিষ্ঠ ঋষির যখন এই অবস্থা, তখন তিনি যে ভাষায় সঙ্কলিত ঋক্ মন্ত্র দর্শন করিয়া মহর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবভাষা প্রাকৃত ভাষার নিকট অভিভূত হইয়া থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দের নির্ব্বাসনের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে নজীর সংগ্রহের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিক পন্থা প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদের নামকরণেই এই নজীর মিলিবে। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পাঁচ পুরুষ পরে যে বংশধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের নাম, 'আঁউ' আর 'গাউ' কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের পঞ্চম পুরুষগণের নাম 'হারু' আর 'নারু'; ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষ 'আবর' আর 'পাবর' আর 'সাবর'; সেকালের আদর্শ রাজার নাম লাউসেন, রাজমহিষীদের নাম 'উদুনা' আর 'পুদুনা'; শ্রেষ্ঠী বণিকের পত্নীদের নাম 'খুল্লনা' আর 'লহনা'। যাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আপনার পুত্রকন্যার নামকরণে এই খাঁটি বাঙ্গলা নামগুলির ব্যবহারের জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা অগ্রণী হউন; আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিব।

আজ হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে পালরাজারা বর্ত্তমান ছিলেন; এবং সে সময়ে দেশের মধ্যে যে হাওয়া বহিয়াছিল, তাহারই প্রবাহে বাঙ্গলা

সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ আমরা অনুমান করি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি শূন্য পুরাণ নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন; সেই গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় দেখিয়া আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রন্থ মধ্যে উহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করা যাইতে পারে।

এই মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ঐ গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাদিগকে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যে উহা এক নূতন জিনিষ,—কতকটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ গ্রন্থের বয়স কিরূপ নিরূপণ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্য তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের বিখ্যাত গ্রন্থকার তোড়র মলের সভায় কৃত্তিবাস, কাশিদাস ও কবিকঙ্কণকে এক-সঙ্গে উপস্থিত করিয়া সেই ধারণার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে অন্ততঃ আরও তিন শত বৎসর পিছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি। এবং এই শূন্য পুরাণই যে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ, তাহাই বা কিরূপে বলিব। মহীপাল ও যোগীপালের গীত আমাদিগকে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে অধুনাবিলুপ্ত হাকন্দ পুরাণ বাঙ্গলা দেশে এককালে ভাগবত পুরাণের অপেক্ষা বেশী আদর পাইত, তাহার নামেই বোধ হয়, উহা সংস্কৃত ভাষার বড় ধার ধারিত না। এই শূন্য পুরাণের কতকাল পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা

কিরূপে বলিব ? ফলে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাল রাজাদের সময়ে ডোম যখন পৌরোহিত্য করিত ও হাড়িতে যখন গুরুগিরি করিত, ব্রাহ্মণ্য যখন অবসন্ন ও ম্রিয়মান হইয়া মুখ লুকাইয়া ছিল, মহাদেব যখন কোচ পাড়ায় ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া কোচ বধূদের সহিত রহস্যালাপ করিতেন, এবং লাঙ্গল হাতে জমি চষিতে প্রবৃত্ত হইয়া মশার কামড়ে বিপন্ন হইতেন, ধর্ম্মের গাজনে ঢাকের বাদ্যে পল্লী সমাজ যখন উন্মত্ত হইয়া উঠিত, সেই অদ্ভুত রসের একত্র সমাবেশের সময়ে, বাঙ্গলার শস্যক্ষেত্রের উপর শ্রাবণের বারিধারার বেগ মাথালির উপরে বহন করিয়া, উৎখাত প্রতিরোপিত ধান্যের হরিদ্বর্ণ চারাগুলি জমিতে গুছাইবার অবকাশে, বাঙ্গলার কৃষকের কণ্ঠে গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদ, লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যে কীর্ত্তিকথা গীত হইত, তাহা হইতেই আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, আপাততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইতে পারি।

দক্ষিণ দেশ হইতে ওষধিনাথবংশীয় সেন রাজারা বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ করিয়া হাওয়ার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বঙ্গের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালের ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণকে সদাচার শিখাইবার জন্য তৎকালের রাজা রাজমন্ত্রী একযোগে দান-সাগর ও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব রচনা করিলেন, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কায়স্থকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিলেন, যে জন সঙ্ঘ শাস্ত্র শাসন অবহেলা করিয়া যোগীগুরু ও ডোমপুরোহিতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থান দিলেন। জয়দেবের মধুরকোমল-কান্ত-পদাবলী দেবভাষায় গ্রথিত হইয়া ভাবুক জনকে নূতন রসের আস্বাদন দিয়া নূতন পথের পথিক করিল। মুসলমান আসিয়া সেন রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন রাজারা যে নূতন বাতাস বহাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই রাষ্ট্র বিপ্লবেও নিবৃত্ত হয় নাই। দণ্ডধারী রাজা

যে সমাজ সংস্কার ও সমাজ শাসনের কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইলেও সমাজ সেই কার্য্য স্বয়ং চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা বন্ধনের পর বন্ধন আঁটিতে লাগিলেন; কুলীনদিগের মেল বন্ধনে ও রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্বে তাহার পরাকাষ্ঠা ঘটিল। রামায়ণ ও মহাভারতের পুরাণ কথা ক্রমশঃ মহীপালকে ও মাণিকচাঁদকে স্থানভ্রষ্ট করিতে লাগিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস যে সুধা-স্রোত বহাইলেন, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদেরা তাহাতে গৌড়ভূমি ভাসাইয়া দিলেন। এই কাহিনী সর্ব্বজন বিদিত, ইহার সবিস্তার বর্ণনা আবশ্যক।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর কয়েক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। ঠিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই সভাস্থলের অনতিদূরে বাঙ্গলার ইতিহাসের এক অঙ্কের অভিনয়ে যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে। স্বদেশী বা বিদেশী যে সকল অভিনেতা সেই যবনিকাপাতকালে অভিনয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের প্রেতাত্মা এখন কোথায় কি অবস্থায় বিদ্যমান আছেন তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু চিত্রগুপ্তের কোন্ খাতায় তাঁহাদের নাম লেখা আছে, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি। * * * যাহাই হউক, বিধাতা কি মনে করিয়া এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একটা নূতন হাওয়া তুলিয়াছেন; এবং সেই হাওয়ার বেগেই নীয়মান হইয়া আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যসেবীরা আজ এখানেউপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে।

যুগে যুগে যুগ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যিনি সম্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার সম্ভব প্রতীক্ষায় যাঁহারা বসিয়া আছেন, একালের যুগ ধর্ম্মের লক্ষণ

কি, তাহার আলোচনা না করিলে তাঁহাদের চলিবে না। সুখের বিষয় যে, বিধাতৃ-প্রেরণায় মানব সমাজে যখন যে হাওয়া বহে, তাহাতেই সেই যুগ ধর্ম্ম নিরূপিত করিয়া দেয়। আমরা সাহিত্যসেবীরা গর্ব্বের সহিত অনুভব করিতেছি, যে অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে যিনি সকলের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, বিধাতা তাঁহার মুখ দিয়াই একালের যুগ ধর্ম্মের স্বরূপ বাখ্যা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্যামা মায়ের পাগল ছেলে কবি রামপ্রসাদ তাঁহার পাগলী মায়ের চরণতলে আপনার মনপ্রাণ ষোল আনা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। এই আত্মনিবেদন উপলক্ষে তিনি যে গীত গাহিয়াছেন, তাহার ধ্বনি আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিন ধরিয়া মরমের তারে ঝঙ্কার দিবে। সেই ঘোররূপা মহারৌদ্রী গলরুধিরচর্চ্চিতা শ্যামাঙ্গিনী জননীর হস্তধৃত করাল খড়্গ রামপ্রসাদের হৃদয়ে কোনরূপ আতঙ্ক জন্মাইত না, তাঁহার রাঙ্গা পায়ের রক্ত জবার অভিমুখে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকিত, এবং তিনি সেই রক্ত জবায় দৃষ্টি রাখিয়া তন্ময় হইয়া নিরবধি আনন্দসুধা পান করিতেন। তাঁহার চোখে মায়ের যে মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা অন্যের চোখে হয় নাই।

সাধক ভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশ ভেদে ও কাল ভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। "বন্দেমাতরম্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী, মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদোপযোগী সাধনায় সময় পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীরা এই মূর্ত্তি দর্শনের জন্য বাঙ্গালীকে

প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রবাসযাত্রী মধুসূদন দত্ত "সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ," এই চিন্তায় যখন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন তিনি ক্ষণেকের জন্য এই "শ্যামা জন্মদার" প্রতি অশ্রুসিক্ত লোচনে চাহিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যখন এই জননীকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার ভেরী বাজাইতেন, তখন আমাদের হৃৎপিণ্ড যেমন স্পন্দিত হইত, তেমন আর তাঁহার অন্য কোন আহ্বানে ঘটিত না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে, এই পত্রিকায় "দশ মহাবিদ্যা" নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। তাঁহার সহচর ও সহবর্ত্তীরা একে একে অন্তর্হিত হইয়াছেন ও হইতেছেন; তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। আমরা সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত হইয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি। এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের জননীর স্বীকৃত মূর্ত্তি সকলের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে জননী আপন হাতে আপন মাথা কাটিয়া ছিন্নমস্তা সাজিয়াছেন; তাঁহার ছিন্ন কণ্ঠ হইতে সমুদ্গত শোণিতধারা ডাকিনী যোগিনীতে পান করিতেছে, কোন্ তারিখে কোন্ স্থানে জননী আপন হাতে আপন মাথা ছিন্ন করিয়া ছিলেন, তাহা প্রবন্ধ লেখক খুলিয়া বলেন নাই। মায়ের এখনকার মূর্ত্তি ধূমাবতী—বর্ষীয়সীরদেহ কঙ্কালসার, চক্ষু কোঠরগত, পরিধানে ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ কেশ, পায়ে ধূলি উড়িতেছে। ভাঙ্গা রথের মাথার উপর কাক ডাকিতেছে।

সেই বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র যখন যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জননীর মূর্ত্যন্তর দেখিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি মায়ের ষোড়শী মূর্ত্তি—মা যাহা ছিলেন, অথবা কমলা মূর্ত্তি—মা যাহা

হইবেন। এই মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তিবিহ্বল স্বরে ডাকিয়াছিলেন—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনের বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙা চরণের রক্ত জবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়—যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ"—ভগবতীর আদেশ—সে সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত থাকিতে

পারে। এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা অনেকেই অনেক উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছেন। কেহ বা সাহিত্যসম্মিলনকে বঙ্গের দুঃস্থ সাহিত্যসেবকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিবেন; কেহ বা ইহাকে সাহিত্যিকগণের স্বার্থরক্ষিণী সভায় পরিণত করিতে চাহিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্যের আবর্জ্জনা অপসারণের জন্য সম্মার্জ্জনী হাতে লইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে গ্রাম্য অপভাষা নির্ব্বাসনের জন্য কমিশন বসাইতে অনুরোধ করিবেন। এই সমুদয় উদ্দেশ্যের সহিতই আমার সহানুভূতি আছে। এ সকলই কাজের কথা ও পাকা কথা, তাহা আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যিনি যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে সর্ব্বদা সম্মুখে না রাখিলে চলিবে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও আমরা সকলে মিলিয়া একটা উচ্চ লক্ষ্য, একটা মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি।

বর্ত্তমানকালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে দল বাঁধিয়া সমবেত শক্তি প্রয়োগে কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে, তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমার অপেক্ষা স্পষ্টতর ভাষায় পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে সেই কর্ম্মের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" এই উদ্দীপনাময় কাতর আহ্বান, তাঁহার কণ্ঠ হইতে ইতঃপূর্ব্বে মুহুর্মুহুঃ নিঃসৃত হইয়াছে। "আমরা এসেছি আজ মায়ের ডাকে" বলিয়া তিনি যখন বীণার তারে আঘাত করিয়া-

ছেন, তখন আমাদের শিরায় শিরায় রক্তধারা বেগে বহিয়াছে। "আগে চল, আগে চল ভাই" বলিয়া তিনি যখন আমাদিগকে পুরোগমনে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অনেকেরই পঙ্গুচরণ লম্ফ প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছে; মরা গাঙ্গে বান দেখিয়া যখন তিনি জয় মা ব'লে তরী ভাসাইতে বলিয়াছেন; তখন তরী ভাসাইব কি, গঙ্গা গর্ভে ঝাঁপিয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে। তাঁহার এই নেতৃত্বে এই সাহিত্যসম্মিলন যদি আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সাহিত্যসম্মিলনের এই দুই দিনের পরিশ্রম নিতান্ত বিফল হইবে না।

কিন্তু আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চ্চনা করিব? আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্যপানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যেদিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের 'সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই। আমরা মাকে চিনিতে এপর্য্যন্ত সম্যক্ চেষ্টাই করি নাই। চিনিবার চেষ্টাই আমাদের বর্ত্তমান কালের অর্চ্চনা। এবং আমরা সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্যসম্মিলন সফল মনে করিব।

আহ্লাদের বিষয়, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদের বড় সম্ভাবনা নাই। এই সাহিত্যসম্মিলনে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবক কর্ত্তৃক যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, জননীর পরিচয় লাভই, সে সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রস্তাবগুলি আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত হইলেই, আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

একটি কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিয়া রাখিতে চাহি যে, আজি

কার সভায় যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সেই সকল প্রস্তাবের অনুযায়ী কাজ ইহার মধ্যেই কিছু কিছু আরব্ধ হইয়াছে। আপনারা বোধ হয় জানেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভা আজ চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত আছেন। অল্প অর্থবল এবং অল্পতর লোকবল লইয়া সাহিত্য পরিষদ্ যতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ গর্ব্বিত হইতে পারেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টায় সহস্রাধিক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কীটের ও অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বহুসংখ্যক গ্রন্থকারের নাম ও কীর্ত্তি সাহিত্য-পরিষৎ বিস্মৃতির কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃত্তিবাস কাশীদাসের মত বিখ্যাত কবিগণ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পনের বৎসর পূর্ব্বে লোকের সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না; সাহিত্য-পরিষৎ অনেকাংশে সেই অস্পষ্টতা দূর করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের হাতের লেখা পুঁথি আশ্রয় করিয়া তাঁহার চণ্ডীগ্রন্থ প্রকাশ করিতে পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব ও বাঙ্গলা ভাষা গঠন-প্রণালী সাহিত্য-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষদের কৃতকর্ম্মের ফর্দ্দ দিয়া তাহার পক্ষে ওকালতির জন্য আমি আজ আসি নাই, তবে সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের একটি আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পক্ষ হইতে জানাইতে চাহি। সেই আকাঙ্ক্ষাটি অন্যতর প্রস্তাবরূপে আপনাদের সম্মুখে যথাসময়ে উপস্থিত করা হইবে। প্রস্তাবটির গুরুত্ব বোধে আমি একটু ভূমিকা করিয়া রাখিব। সাহিত্য-পরিষদ্ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলাদেশকে ও বাঙ্গালী

জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব। সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব।

সেই মন্দিরের একপার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। বঙ্গের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপাকৃতি হইবে। সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফসল জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত দেখিতে পাইব। গ্রীক ও রোমান হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পর্য্যন্ত যে কোন বৈদেশিক আগন্তুক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সে স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংরেজ সরকার বাঙ্গলার ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ও সরকারী সাহায্য ব্যতীত যিনি যাহা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা সেই স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইবে।

মন্দিরের অন্তস্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব। চণ্ডিদাস যে বাশুলী দেবীর পূজক ছিলেন, কবিকঙ্কণ সপ্নাবেশে চণ্ডীদেবীর যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনার গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস যে ভিটায় বসিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাস যে কেশে পুকুরের নিকট বাস করিতেন, রামপ্রসাদ যে আসনে বসিয়া সাধনা করিতেন, এই সকলের ছায়াচিত্র বা তৈলচিত্র গৃহপ্রাচীর শোভিত করিবে। শ্রীচৈতন্যের হস্তাক্ষরের পার্শ্বে নিত্যানন্দের ছড়ি বিদ্যমান থাকিবে। রাম-মোহন রায়ের পার্শ্বে হেমচন্দ্রের পাষাণ মূর্ত্তি উপবিষ্ট থাকিবে। বিদ্যা-সাগরের পাদুকার নিকটে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী শোভা পাইবে।

আর একস্থলে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গালার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, সেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। পাষাণের উপর বা ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রতিলিপি সুরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানী-সমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইবে। বাঙ্গালার যে যে স্থান বিরাট রাজার নামের বা কর্ণসেনের নামের সহিত জড়িত আছে, চাঁদ সদাগরের বা বেহুলা ঠাকুরাণীর স্মৃতির সহিত মিশিয়া আছে, সেই সকল স্থানের চিত্র আমরা সেখানে বসিয়া দেখিতে পাইব। প্রাচীন দুর্গ, দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি দর্শনীয় যেখানে যে কিছু আছে, তাহার চিত্রও আমরা সেইখানে দেখিব। প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর ভাঙ্গা কলসী হইতে পলাশীর লড়াইয়ের গোলা পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখিব।

আর একস্থানে বাঙ্গালার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্ম্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও তার্কিক শিরোমণি হইতে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ও তারকনাথ তর্কবাগীশ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের বংশলতা ও জীবন চরিত সংগৃহীত হইবে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবে।

বাঙ্গালার বিখ্যাত জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে পারিব। বাঙ্গালার ফুল-ফল, লতা-পাতা, গাছ-পালা, জীবজন্তু শিল্প সম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই। এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি, ও এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্য সম্ভারকে আমি মাতৃ-প্রতিমা নাম দিতে পারি। সাহিত্য পরিষদের এই আশার কথা ও

আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বহু আশা বুকে বাঁধিয়া সাহিত্য সম্মিলনের সম্মুখে স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, আপনারা ইহার অনুমোদন করিবেন। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু "অল্পানামপিবস্তূনাং সংহতিঃ" যখন কার্য্যসাধিকা হয়, তখন আপনাদের শক্তি সমষ্টির পক্ষে এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য নাও হইতে পারে।

এই মন্দির গঠনে প্রভূত লোকবল ও প্রভূত ধনবল আবশ্যক। বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীরা লোকবল যোগাইতে পারেন; কিন্তু ধনবল তাঁহাদের নাই। ধনবলের জন্য আমাদিগকে বাঙ্গালার ধনীদিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে। আজকার দিনে যখন বাঙ্গালার ধনী দরিদ্র সকলেই মায়ের ডাকে সাড়া দিতেছেন, তখন, মায়ের কাজের জন্য ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া ধনীর দ্বারস্থ হইলে আমাদিগকে বিমুখ হইতে হইবে না, এই আশা করি। বঙ্গের ধনিগণ ধনের কিয়দংশ এইরূপে মাতৃপূজায় নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের ধনবত্তা সার্থক করুন, এই প্রার্থনা।

যাঁহার উদ্যোগে ও আহ্বানে আজ আমরা এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাশীমবাজার নগরে উপস্থিত হইয়াছি, বলা বাহুল্য, এই কার্য্যের সফলতার জন্য মুখ্যতঃ আমাদিগকে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তাঁহার নেতৃত্ব বিনা কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই প্রস্তাবে আমি তাঁহার অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের আতিথ্য লাভে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন আজ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অভ্যন্তরে দারুণ ব্যথার চিহ্ন প্রচ্ছন্ন ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। গত বৎসর আমরা আতিথ্যলাভের আনন্দ ভোগের জন্য আয়োজন করিতেছিলাম; নিষ্ঠুর বিধাতা অকস্মাৎ বজ্র হানিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দভোগে বঞ্চিত

করিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দারুণ শোক বঙ্গের সাহিত্য সেবকেরা বিনা বাক্যে অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার শোক হেতুও বর্ত্তমান ছিল। মহিমচন্দ্রের বিনয়-মণ্ডিত মুখশ্রীর সহিত আমার যেরূপ পরিচয় ঘটিয়াছিল, আপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, কিন্তু বঙ্গের এই দুর্দ্দিনে তাহার একটি উজ্জ্বলতম আশার প্রদীপ অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে, বঙ্গসমাজ যে তমোমলিন হইয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। সাহিত্যিক সমাজ তখন যে ব্যথা পাইয়াছিলেন, সেই ব্যথার চিহ্ন কথঞ্চিৎ আহ্লাদিত রাখিয়া আজ অতিথি রূপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য যিনি আপনার অরুন্তুদ মর্ম্মপীড়া মর্ম্মস্থলে সংগোপন করিয়া, বঙ্গের সারস্বত সমাজের অতিথি সৎকারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বোধ করি প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন না করিলে, আমাদের ধর্ম্মহানি হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে মহারাজের সহকারিতা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, আশা করি, আমাদের এই সময়ের অনুপযোগী ধৃষ্টতা মার্জ্জিত হইবে। হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে আগুন জ্বলিয়া থাকে, তাহার নির্ব্বাপণ মানুষের সাধ্য কিনা; তাহা জানি না, তবে পুণ্যকর্ম্মের জাহ্নবী বারি তাহাকে কতকটা শান্ত রাখিতে পারে। এই সারস্বত সম্মিলনের আহ্বানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মহারাজ যে পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শোকবহ্নির উপর শান্তি বারি নিক্ষেপ করিতে পারে। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুণ্যতম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। মহারাজের যদি ইহা অনুমোদিত হয় এবং তিনি যদি অগ্রণী হইয়া বঙ্গের জনগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন,

তাহা হইলে মহারাজের নিত্যানুষ্ঠিত সহস্র পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে এই পুণ্যতম কর্ম্ম তাঁহার অন্তরের বিয়োগ ব্যথার অপনোদনে সমর্থ হইবে, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি আপনাদিগকে সাহিত্য সম্মিলনের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকার প্রণীত

জিজ্ঞাসা

দার্শনিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ।

(তৃতীয় সংস্করণ)

সূচী,—সুখ না দুঃখ—সত্য—জগতের অস্তিত্ব সৌন্দর্য্যতত্ত্ব—সৃষ্টি—অতি প্রাকৃত—আত্মার অবিনাশিতা—কে বড় ?—মাধ্যাকর্ষণ—এক না দুই অমঙ্গলের উৎপত্তি—বর্ণতত্ত্ব—প্রতীত্য সমুৎপাদ পঞ্চভূত—উত্তাপের অপচয়—নিয়মের রাজত্ব সৌন্দর্য্য বুদ্ধি—মুক্তি—মায়াপুরী—বিজ্ঞানে পুতুল পূজা। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, ৪২০+১২ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

কর্ম্ম-কথা

সমাজ-ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী—

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী,—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি পূজা—ধর্ম্মের জন্ম—যজ্ঞ। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২১২ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।